পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

(ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
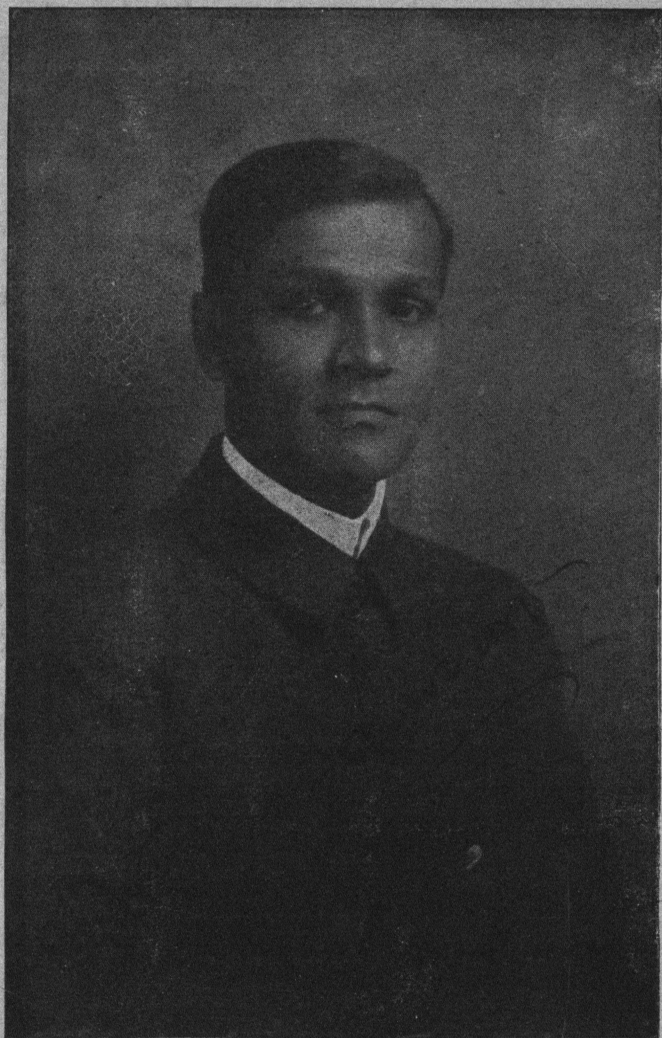
শ্রীবিনয়কুমার সরকার

প্রকাশক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী বি, এ
এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
১১নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

২।০

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না
বেঙ্গল প্রেস
২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনুবাদকের ভূমিকা

কার্ল্ মার্ক্‌স্ ও ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্

ধন-বিজ্ঞানে যুগান্তর

(১)

ভারতে যাঁহারা ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট জার্ম্মাণ্ লেখক ফ্রিড্‌রিশ (ফ্রেডরিক্) এঙ্গেল্‌সের রচনাবলী অজানা জিনিষ নয়। এঙ্গেল্‌স্-প্রণীত "বিলাতী মজুর-শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা" নামক গ্রন্থ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। জনগণের পারিবারিক আয়-ব্যয় এবং সমাজের অন্যান্য আর্থিক তথ্য বিষয়ে জগতের সর্ব্বত্র জ্ঞানলাভের যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, তাহার জন্য সুধীগণ এঙ্গেল্‌সের এই গ্রন্থের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। নরনারীর জীবনে সুখ-স্বচ্ছন্দতা মাপিবার বাস্তব যন্ত্র এঙ্গেল্‌সের প্রদর্শিত পথেই আজও সকল মহলে কায়েম করা হইতেছে।

জার্ম্মাণির সমাজ-চিন্তায় এঙ্গেল্‌সের ঠাঁই খুব উঁচু। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দর্শনে দুইজন জার্ম্মাণ্ ইহুদী ইয়োরোমেরিকায় নামজাদা হন। একজনের নাম কার্ল্ মার্ক্‌স্ (১৮১৮-১৮৮৩)। দার্শনিক হেগেলের আলোচনা-প্রণালীর বিরুদ্ধে কলম ধরিয়া ইনি ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে এক

নবযুগের সূত্রপাত করেন। অধিকন্তু খাঁটি ধন-বিজ্ঞান এবং সমাজ-তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বহু বিষয়ে ইঁহার রচনাবলী জার্ম্মাণ্ পণ্ডিত-মহলের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে।

মজুর এবং দরিদ্র লোকেরা ক্রমশঃ কার্ল্ মার্ক্‌স্‌কে যুগাবতার-স্থানে পূজা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই পূজা আজকাল কেবলমাত্র জার্ম্মাণিতেই আবদ্ধ নয়। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এসিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া,-নিউজীলণ্ড,—জগতের সকল দেশেই—"ওঁ কার্ল্ মার্ক্‌সায় নমঃ" বলিয়া মজুরেরা, মজুর-প্রতিনিধিরা এবং সমাজ-লেখকেরা কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে।

কার্ল্ মার্ক্‌সের সময়কার অপর জার্ম্মাণ্-ইহুদী সমাজ-দার্শনিকের নাম ফার্ডিনাণ্ড লাসাল্ (১৮২৫-১৮৬৪)। ১৯১৮ সালে গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া এবার্টের সভাপতিত্বে যে রাষ্ট্রীয় দল জার্ম্মাণিতে রাজত্ব করিতেছে সেই দলের আদি পুরুষই লাসাল্। জার্ম্মাণ্ জাতি লাসালকে "সোৎসিয়ালডেমোক্রাটিশে পার্টাই"র (বা সমাজ সাম্যের দলের) প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিতে সর্ব্বপ্রথম মজুর-পরিষৎ স্থাপিত হয়।

মজুর-সমাজকে আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল লাসালের জীবনের সাধনা। লাসাল্ প্রাচীন গ্রীক্-দর্শন এবং রোমাণ্ আইনকানুন বিষয়ক গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া সুধী-মহলে যশ পাইয়াছিলেন। সমসাময়িক খাজনা, মজুরি এবং অন্যান্য আর্থিক তথ্যের বিশ্লেষণেও তাঁহার দক্ষতা সেইরূপ যশই পাইয়াছে।

(২)

মার্কসের সঙ্গে লাসালের কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্রে কাজকর্মও চলিয়াছিল। লাসাল্ মাক্‌সকেই গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু-শিষ্যরূপ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ মার্কসে এবং এঙ্গেল্‌সেই বেশি মাত্রায় থাকিয়া উঠিয়াছিল। মার্ক্‌স্ এবং এঙ্গেল্‌স্ "হরিহরআত্মা" ছিলেন, এইরূপ বলিলেই ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ঠিক বুঝা যাইবে। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে এঙ্গেল্‌স ছিলেন খৃষ্টান, অর্থাৎ ইহুদী নন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেল্‌সের প্রথম দেখা হয়। মার্কসের বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর, এঙ্গেলস তাঁহার দুই বৎসরের ছোট। ইহারা দুইজনে মিলিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে "দুনিয়ার নিয্যাতিতদের নিকট" কমিউনিষ্টদের (ধন-সাম্য-পন্থীদের) ইস্তাহার প্রকাশিত করেন। মাক্‌স-প্রবর্ত্তিত একাধিক সংবাদপত্রে এঙ্গেল্‌স সর্ব্বদাই লেখকরূপে হাজির থাকিতেন। মার্কসের মৃত্যু পর্য্যন্ত পুরাপুরি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দুই জনের বন্ধুত্ব বজায় ছিল।

এই চল্লিশ বৎসরের ভিতর কার্ল্ মাক্‌সের নামে বহুসংখ্যক পুস্তিকা, বক্তৃতা, গ্রন্থ, সমালোচনা, তর্কবিতর্ক ইত্যাদি রচনা বাহির হইয়াছে। কিন্তু এইগুলির কোন্ কোন্‌টায় কতখানি লেখা এঙ্গেল্‌সের এবং কতখানি মার্ক্‌সের নিজের তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে গভীর গবেষণায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই তথ্য হইতেই জার্ম্মাণির উনবিংশ শতাব্দীতে এবং দুনিয়ার ধন-বিজ্ঞানে, সমাজ-তত্ত্বেও "দরিদ্র নারায়ণে"র পূজায় এঙ্গেল্‌সের কৃতিত্ব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।

কার্ল্ মার্ক্‌সের "ডাস্ কাপিটাল্" (বা পুঁজি) গ্রন্থে প্রচলিত ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার তীব্র সমালোচনা আছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাইবার পূর্ব্বেই মার্ক্‌সের মৃত্যু হইয়াছিল। সম্পাদনের ভার ছিল এঙ্গেল্‌সের হাতে। এঙ্গেল্‌সের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১৮৮৫ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। এই দুই খণ্ডে এঙ্গেল্‌সের স্বাধীন হাত প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যে গ্রন্থ মার্ক্‌স্-নীতির গীতাস্বরূপ তাহার অনেক স্থলেই এঙ্গেল্‌সের কলম কাজ করিয়াছে।

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ

(১)

যখনই আজকাল যেখানে মার্ক্‌সকে যুগাবতার বলা হইতেছে, সেখানে তখনই এঙ্গেল্‌সও পূজা পাইতেছেন। এই সূত্রে বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেল্‌স্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "ডার উরস্প্রুং ডার ফামিলিয়ে ডেস্ প্রিফাট্ আইগেণ্টুম্স্ উণ্ড্ ডেস্ ষ্টাটেস্" (পরিবার, নিজস্ব এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি) নামে। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে মার্ক্‌সের মৃত্যু হইয়াছে।

এঙ্গেল্‌স্ লিখিয়াছেনঃ—"এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমি প্রকারান্তরে একটা উইল-মাফিক্ কাজ করিতেছি। মর্গ্যানের অনুসন্ধানগুলাকে ধনবিজ্ঞানের তরফ্ হইতে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন একজন যে-সে লোক নন। তিনি স্বর্গগত মহাপুরুষ কার্ল্ মার্ক্‌স্। ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা

মার্কসের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা-প্রণালী। এই ব্যাখ্যা প্রণালী ফুটাইয়া তুলিতে আমিও অনেক কাল ধরিয়া তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রণালী দার্শনিক সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

"এক্ষণে মর্গ্যান্ আমেরিকার আদিমবাসীদিগের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া সেই প্রণালীই পুনরায় আবিষ্কার করিয়াছেন। "বার্ব্বার" সভ্যতার সঙ্গে "উৎকর্ষে"র যুগের তুলনায় মর্গ্যান্ প্রায় মার্কসের সিদ্ধান্তেই আসিয়া পৌছিয়াছেন। এই কারণেই মার্ক্স্ মর্গ্যানের তথ্যগুলা গ্রহণ করিয়া নিজ দর্শনকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

"আমার বন্ধুবর নিজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কাজ করিয়া আমি একটা যথাসাধ্য ঠাঁই পূরণের ব্যবস্থা করিলাম। তবে মার্ক্স্ মর্গ্যানের কথা লইয়া যেখানে যেখানে টিপ্পনী বা টীকা করিয়া গিয়াছেন সেগুলা পূরাপূরি ব্যবহার করিতে ছাড়ি নাই।"

"কাজেই বর্ত্তমান গ্রন্থও মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্স্ দুই জনেরই সন্তান এইরূপ ধরিয়া না লইলে গ্রন্থের জন্মকথা পরিষ্কার হইবে না।"

(২)

এঙ্গেল্স্ তাঁহার রচনাকে "পরিবার, নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামে প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থে প্রথম বিবৃত হইয়াছে পরিবার বা বিবাহ পদ্ধতি ও যৌন সম্বন্ধের ইতিহাস। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় গেন্স্ বা গোষ্ঠী-প্রথার সমাজ-শাসন।

তাহার জন্য। আমেরিকার "ইণ্ডিয়ান্" (এবং বিশেষরূপে ইরোকোয়া) জাতির প্রতিষ্ঠানগুলা আলোচনায় ঠাঁই পাইয়াছে।

এঙ্গেল্সের তৃতীয় কথা গোষ্ঠীর ভাঙন বা রাষ্ট্রের জন্ম। ইণ্ডিয়ান সমাজের লোকেরা গোষ্ঠী-কেন্দ্র ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদের সমাজে রাষ্ট্রের চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের জন্ম-কথা বুঝিয়া বাহির করিবার জন্য প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক্, রোমাণ্, কেল্টিক্ এবং জার্মাণ্ জাতির রীতিশাস্ত্র ও সংহিতাগুলা আলোচনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়গুলার তালিকা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই গ্রন্থের মুখ্য কথা নয়। মুখ্য কথা পরিবার, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র এই তিন জীবনকেন্দ্রের ইতিহাস। এই কারণে বাংলা ভাষায় এঙ্গেল্সের রচনা "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের জন্ম-কথা" নামে প্রচারিত হইল।

নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি গ্রন্থের মুখ্য কথা নয় বটে, কিন্তু এই বিষয়ই এঙ্গেল্সের প্রাণের কথা। সেই প্রাণের কথাটা গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের যেখানে সেখানে পাঠকের মন স্পর্শ করে। বস্তুতঃ ধনদৌলতের আকার-প্রকার মানব-জাতির শৈশব-কালে কখন্ কেন ও কিরূপ ভাবে বদ্লাইয়াছে তাহার আলোচনা করাই এঙ্গেল্সের উদ্দেশ্য ছিল। আর্থিক ইতিহাসের কোন্ স্তরে ব্যক্তিগত ধন-দৌলতের সৃষ্টি হইয়াছে, সে কথা এই গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে বিবৃত হইয়াছে।

খাঁটি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা হিসাবে যে সাহিত্য নজরে আসে, এই গ্রন্থকে সেই সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলিবে না। এই রচনা নৃতত্ত্ব-বিদ্যার মহলেই ঠাঁই পাইবার যোগ্য। নৃতত্ত্বের

তথ্যগুলোর উপরে আর্থিক ব্যাখ্যা চালাইলে যে-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা এঙ্গেল্স্ এখানে সেই তত্ত্বের প্রচারক। সমাজ-দর্শন, সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি বস্তু প্রাচীন মানবের জীবন-কথায় বা পুরাকাহিনীতে যতখানি পাওয়া যাইতে পারে, সেই দর্শন ও সেই ইতিহাসই বর্ত্তমান কেতাবের দান।

"নৃতত্ত্ব" বিদ্যা

নৃতত্ত্ব দুই শাখায় বিভক্ত :—শারীরিক ও সামাজিক। এক শাখার পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাপিয়া-জুপিয়া তুলনা করিয়া মানুষের উৎপত্তি, শ্রেণী-বিভাগ ইত্যাদির আলোচনা করিয়া থাকেন। এই বিদ্যাকে কম্পারেটিভ অ্যানাটমির (বা তুলনামূলক অস্থি-বিদ্যার) এবং জীব-বিজ্ঞানের জের বিবেচনা করা যাইতে পারে।

অপর বিভাগের পণ্ডিতেরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নর-নারীর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, লেন-দেন, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, শিল্প ইত্যাদি জীবনের সকল খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। সহজে এই বিভাগের নৃতত্ত্ববিদ্গণকে লোকাচারতত্ত্ববিৎ বলা চলে। ধর্ম্ম, শিল্প, ধন-দৌলত, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা-মূলক বিজ্ঞানগুলা সবই এই সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্যার সামিল।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, "ইতিহাস" নামে যা-কিছু সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে সবই নৃতত্ত্ব। কিন্তু পারিভাষিক হিসাবে এইখানে আর-একটা প্রভেদ চলিয়া আসিতেছে। আজি সাবেক কাল, মান্ধাতার-আমল, প্রাগৈতিহাসিক যুগ

ইত্যাদি সময়কার মানব-কথা অর্থাৎ মানব-সভ্যতার গোড়াটা লইয়া যাঁহারা অনুসন্ধান চালাইতেছেন একমাত্র তাঁহাদিগকেই নৃতত্ত্বের গবেষক বলা হয়।

অধিকন্তু বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জনপদে যে সকল "আদিম" অনুন্নত, অসভ্য জাতি "সভ্যতার শৈশবাবস্থায়" জীবিত রহিয়াছে তাহাদের আচার ব্যবহার এবং স্বধর্ম্মের সকল প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যে সকল অনুসন্ধানকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁহারাও নৃতত্ত্ববিদরূপে পরিচিত। এই হিসাবে পর্য্যটক, ভৌগলিক আবিষ্কারক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক নৃতত্ত্বের সংসারে নাম করিয়া থাকেন।

মর্গ্যানের সিদ্ধান্ত

(১)

মর্গ্যান্ লোকটা কে? চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই লেখক আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্ সমাজে তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ইরোকোআদের কুটুম্ব-সম্বন্ধ বা আত্মীয়তার প্রথা সম্বন্ধে ইনি ১৮৭১ সালে যে-সকল তথ্য প্রকাশ করেন তাহার ফলে গোটা লোকাচারতত্ত্ব, বিবাহ-পদ্ধতি এবং সামাজিক নৃতত্ত্বে এক নবযুগ সুরু হয়। ইঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম "এন্শ্যেণ্ট সোসাইটি" (বা প্রাচীন সমাজ)। "স্যাহ্বেজ" (বা সহজ) অবস্থা হইতে মানবজাতি কোন্ পথে "বার্ব্বার" সভ্যতা অতিক্রম করিয়া "উৎকর্ষে"র স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে সেই তথ্যগুলা নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থ ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মর্গ্যানের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, মানব-সমাজে এককালে

"দলগত" বিবাহ অর্থাৎ অবাধ যোনিসংস্রব প্রচলিত ছিল। এই অবাধ সংস্রবে বিধি-নিষেধ কায়েম হইতে থাকে। ক্রমশঃ গেন্‌স্ বা গোষ্ঠী-প্রথা দেখা দেয়। গোষ্ঠী-নীতি আবিষ্কার করা মর্গ্যানের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। গোষ্ঠী সমরক্তজ জীবন-কেন্দ্র। এক গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর-বিবাহ নিষিদ্ধ। গোষ্ঠী পরিচালিত হইত প্রথম প্রথম নারীর তরফ হইতে "জননী-বিধি"র নিয়মে। সেই "জননী-বিধির" গোষ্ঠী আজও চলিতেছে ইরোকোআ সমাজে এই গেল মর্গ্যানের তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

"নারীর আমল" গোষ্ঠীধর্ম্ম হইতে পরে উঠিয়া যায়। তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় "পুরুষ-বিধি" এবং পুরুষাধিপত্য। গ্রীক্ রোমাণ্ এবং জার্ম্মাণ্ সমাজগুলার প্রাচীনতম স্মৃতিশাস্ত্রে পুরুষ-প্রাধান্যশীল গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানই দেখিতে পাওয়া যায়। মর্গ্যানের এই আবিষ্কার প্রাচীন ইয়োরোপের ইতিহাস-রচনায় যুগান্তর আনিয়াছে।

(২)

এই চার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াই মর্গ্যান্ আলোচনা খতম করেন নাই! "উৎকর্ষে"র যুগ সম্বন্ধে অর্থাৎ যে যুগের ভরা জোআরে বর্ত্তমান জগতের "সভ্য" নরনারী বসবাস করিতেছে—সেই স্তরের জীবন-যাত্রাকে ইনি চরম ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন। লাভের লোভই এই যুগের ধনোৎপাদনের গোড়ার কথা,—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ধনজীবীরা আর কিছু চিন্তা করে না,—ইহাই মর্গ্যানের মতে উৎকর্ষশীল মানবের মূল মন্ত্র। ফরাসী সোশ্যালিষ্ট ফুরিয়ে যে-ভাবে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন, মর্গ্যান্‌ও সেইরূপই করিয়াছেন।

"উৎকর্ষের যুগকে গালাগালি দেওয়াই" মর্গ্যানের শেষ কথা নয়। একটা ভবিষ্য সমাজের স্বপ্নও তাঁহার মাথায় ছিল। কোথায় একটা অনুন্নত আদিম অসভ্য জাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বৃত্তান্ত-প্রকাশ এবং প্রাচীন ইয়োরোপের মান্ধাতার আমলের গ্রীক-রোমাণ্ জার্ম্মাণ্দের জীবন কথার আলোচনা, আর কোথায় বর্ত্তমান মানবের জন্য সমাজসংস্কার, পরিবার-সংস্কার, আর রাষ্ট্র-সংস্কারের মোসাবিদা। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে মর্গ্যান্ প্রায় মার্কসের বিপ্লব-পথেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ, মর্গ্যানের মতে ভবিষ্য মানব সেই মান্ধাতার আমলেরই যৌথসম্পত্তি নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীকর্ম্মের এক নবরূপ প্রকটিত করিবার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পাণ্ডিত্য

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। ইহার ইংরেজি সংস্করণ বাহির হয় ১৯০২ সালে। অন্যান্য ভাষায় ইহার তর্জ্জমা পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু কি মর্গ্যানের আবিষ্কারগুলা, কি এঙ্গেল্‌স্-মার্ক্‌সের আর্থিক ব্যাখ্যা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিতর ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই।

সেকালের কোনো ভারতীয় লেখক এই সকল তথ্য বা তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবিষয়ক আর্থিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় তথ্যগুলা এই মর্গ্যান-মার্ক্‌স-প্রবর্ত্তিত সমাজ-বিজ্ঞানের আওতায় আনিয়া পরখ্ করিতেও কোনো ভারতীয় গবেষক চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। রামমোহন, বঙ্কিম, ভূদেব, চন্দ্রনাথ

বিবেকানন্দ ইত্যাদির প্রবন্ধাবলীতে সে যুগের দৌড় জরীপ করা চলিতে পারে।

ভারতে যা-কিছু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে আন্দোলন প্রায় সবই মাত্র ১৯০৫ সালের সমসময় কালে এবং পরে দেখা দিয়াছে। রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র ইত্যাদির ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজি উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অধিকন্তু বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া যুবক-ভারত ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিদ্যার জন্যও সর্বোচ্চ শ্রেণীর ইয়োরামেরিকান গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হইতেছে। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের তরফ হইতে ভারতীয় মান্ধাতার যুগকে যাচাই করিবার দিকে অথবা মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ বুঝিবার দিকে কোনো চেষ্টা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কুত্রাপি ত নাই-ই, ভারতের কোথাও দেখি না।

বিষাক্ত "প্রাচ্যামি"

(১)

একদম নাই বলিলে ভুল হইবে। কেননা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতীয় লেখকদের কয়েকখানা ইংরেজি কেতাব বাহির হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে যে যে অংশে প্রাচীন তথ্যগুলার খাঁটি বিবরণ মাত্র সেই সকল অংশ প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানেই বিদেশী—বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকান তথ্যের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনার ইঙ্গিত মাত্র আছে সেইখানেই গোড়ায় গলদ ধরা পড়ে।

লেখকগণ প্রাচীন ভারতকে বিলকুল সৃষ্টি-ছাড়া ভূখণ্ডরূপে প্রচারিত করিবার জন্য বিজ্ঞান-সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। অথবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলার সন-তারিখ, "জাতিভেদ", স্তর-বিন্যাস বা যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই ইঁহারা ভারতীয় "স্বদেশী সমাজে"র স্বধর্ম্ম, বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ যে-সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার সকল জাতিরই "সামান্য ধর্ম্ম" মাত্র সেইগুলাকেও অতি মাত্রায় ভারতাত্মার ও প্রাচ্য-জীবনের প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রচারিত করা হইতেছে। চিত্রকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি "রসে"র সমালোচনায়ও এই বিষাক্ত "প্রাচ্যামি"র জয় জয়-কার চলিতেছে।

(২)

এইরূপ ভ্রমাত্মক আলোচনা পথ দেখাইয়াছেন ইয়োরোমেরিকার প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ "ওরিয়েণ্ট্যালিষ্ট্" পণ্ডিতগণ। তাঁহাদের জুড়িদারস্বরূপ পাশ্চাত্য, বিজেতা-জাতীয়, সাম্রাজ্য-শাসক, "কলোনিয়ালিষ্ট" (উপনিবেশতন্ত্রী) রাষ্ট্রিকেরাও সমাজ-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী। এই দুই শ্রেণীর লোক প্রায় এক শ' বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বকে পশ্চিম হইতে ফারাক্ করিয়া রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দুনিয়ার শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্যের যুগে শ্বেতাঙ্গদিগকে "একঘরে" করিয়া রাখা শ্বেতাঙ্গ বিজ্ঞান-সেবীদের স্বার্থ এবং স্বধর্ম্ম। পশ্চিমের চিত্তে আর পূর্ব্বের চিত্তে কোনো প্রকার মিল বা সাদৃশ্য আছে এ কথা স্বীকার করিলে পশ্চিমাদের ইজ্জৎ রক্ষা হয় না। পশ্চিমাদের এই ঘোরতর প্রাচ্য-বিদ্বেষই তথাকথিত "প্রাচ্যামি"র জনক।

তুলনামূলক সমাজ-বিদ্যার আলোচনায় ভুল কেন প্রবেশ করিয়াছে এবং এই বিজ্ঞানের সংস্কার কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা মৎপ্রণীত "ফিউচারিজ্‌ম্ অব্ ইয়ং এশিয়া" বা "যুবক এশিয়ার ভবিষ্যবাদ" (লাইপ্‌ৎসিগ্ ১৯২২) গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গেল গোটা সভ্যতা-বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা।

সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্তগুলার কিম্মৎ বাহির করিবার জন্য "পলিটিকাল ইন্‌ষ্টিটিউশ্যান্‌স্ অ্যাণ্ড থেয়োরিজ অব্ দি হিন্দুজ্" অর্থাৎ "হিন্দুজাতির শাসন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্রনীতি" (লাইপৎসিগ্ ১৯২২) নামক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ভারতসন্তান ভালয় মন্দয় গ্রীক্, রোমাণ্ এবং জার্ম্মাণ্‌দেরই সমকক্ষ ছিল—এই কথা সেই গ্রন্থের প্রাণ। বর্ত্তমান ভারত অথবা ভবিষ্য ভারত সম্বন্ধে এই কেতাবে কোনো কথা বলি নাই।

ভবিষ্যবাদের দর্শন

ভবিষ্য ভারত কোন্ পথে চলিবে? এই সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ খুশী তিনি সেইরূপ আদর্শ প্রচার করিতে অধিকারী। গোটা দুনিয়া কোন্ পথে চলিবে? এই সম্বন্ধে যেমন প্রত্যেক লেখক, সমাজ-সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক বা প্রপাগাণ্ডিষ্ট্ নিজ নিজ মত জাহির করিতেছে, ভারত সম্বন্ধেও ভবিষ্যবাদীরা সেইরূপ করিবে ইহা স্বাভাবিক। স্বাধীন চিন্তায় বাধা দিবে কে? যাহার মাথায় কিছু কিছু মগ্‌জ আছে, সেই এক-একটা দল পুরু করিতে অধিকারী।

কিন্তু তাহা বলিয়া কোনো-একটা পথকে "পূর্বী" এবং অপর কোনো পথকে "পশ্চিমা" দাগে চিহ্নিত করিতে বসিলে তর্ক-বিতর্কের আখড়ায় আসিয়া পাঞ্জা কষিতে হইবে। এই আখড়ায় আদর্শ, ভাবুকতা, মানবজাতির আশা, সমাজ-সংস্কারকের স্বপ্ন বা পীরবরের বাণী খাটে না। এখানে খাটে কেবল তথ্য, বাস্তব তথ্য, যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ঘটিতেছে তাহার নিরেট বিবরণ। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় সকল প্রকার জীবন-কেন্দ্রের সন-তারিখ-সমন্বিত এবং দফায় দফায় তুলনা-মূলক ইতিহাস বা নৃতত্ত্ব।

ধরা যাউক যেন চরখা চালাইলেই ভবিষ্য ভারত স্বর্গে উঠিবে। অথবা যেন পল্লী-কেন্দ্রেই ভারতের ভবিষ্য-বিকাশ ঘটিতে বাধ্য অথবা যেন কুটীর-শিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার শিল্প-ব্যবস্থা, ভারত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত, অথবা যেন ভবিষ্য-ভারতে রাষ্ট্র শাসন চলিবে পল্লী-পঞ্চায়তেরই বিধানে। ভবিষ্যবাদীরা এই চার দফায় ভারতীয় জীবন গড়িয়া তুলুন— আপত্তি কি? কিন্তু এই চার দফার কোনোটাকে ভারতীয় "আধ্যাত্মিকতার"ই বিশিষ্ট আবিষ্কার বলা যাইতে পারে কিসের জোরে? এই "চার মহা-সত্য" জগতের অন্যান্য দেশে কোনো কোনো যুগে নরনারীর জীবন-কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করে নাই কি?

এই "সত্য চতুষ্টয়"ই যদি আধ্যাত্মিকতা এবং মানব-সভ্যতার চরম নিদর্শন হয় তাহা হইলে দুনিয়ার আদিম, অসভ্য "বর্বর," অনুন্নত জাতিগুলা চরম মাত্রায় আধ্যাত্মিক এবং সভ্যতাশীল নয় কি? তাহা হইলে প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক, রোমান্‌রা, জার্মাণরা এবং মধ্য যুগের পর ফ্যাক্টরি যুগের কলচালিত শিল্প

ব্যবস্থার আমল পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় খৃষ্টানরা আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতার দাবী হইতে বঞ্চিত হইবে কেন ?

তাহা হইলে পাশ্চাত্য-সংসারের সোশ্যালিষ্ট্ পন্থীরা এবং বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট বা যৌথ-সম্পত্তি-পন্থী ধনসাম্যধর্ম্মীরা কি দোষ করিল ? তাহা হইলে লেনিন্-ট্রট্‌স্‌কিপ্রবর্ত্তিত বোল্‌শেভিক্ রুশিয়া কম-সে কম আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে চরমে গিয়া ঠেকে নাই কি ? তাহা হইলে লেনিন্-ট্রট্‌স্‌কির "গুরুর গুরু" জার্ম্মাণ্-ইহুদীর বাচ্চা কার্ল্ মার্ক্‌স্ তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এবং ভারত-ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি নয় কি ? পূর্ব্বই বা কোথায় ? পশ্চিমই বা কোথায় ?

তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ ভারতীয় সমাজে প্রচারিত হইলে ভারতবাসী নিজ নিজ স্মৃতি-নীতি-ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষশাস্ত্রগুলার দিকে এক নূতন চোখে দৃষ্টিপাত করিতে সুরু করিবে। ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে যুবক-ভারত বহু বুজ্‌রুকি এবং কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে শিখিবে। তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান-বিদ্যা কিছু কিছু করিয়া ভারত-সন্তানের পেটে পড়িতে থাকিবে।

মর্গ্যান, মার্ক্‌স্, বা এঙ্গেল্‌স্ কাহারও মত বা বাণীই বেদ-বাক্য নয়। সকলের কথাই তথ্যের জোরে কষিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু ইঁহাদের রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধের সমাজ-চিন্তা পুষ্ট হইয়াছে। এখনো এইগুলার দাম বিজ্ঞানের বাজারে ঢের। এই কারণে ভারত-সন্তানের পক্ষে এইগুলা জানিয়া রাখা দরকার। ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে এঙ্গেল্‌সের

গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয় নাই, ইহা লজ্জার কথা। এই ধরণের আরও অনেক গ্রন্থ এতদিনে বাংলা ভাষায় পাওয়া উচিত ছিল।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে "প্রাচীন সমাজ" সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া নিউইয়র্কে এই সকল গবেষণার ফল নানা গ্রন্থে প্রচারিত হইতেছে (১৯২০-২২) রবার্ট লোহি্ব, আর্থার গোল্ডেনহ্বাইজার্ এবং প্লিনি গডার্ড্ এই তিন জন লেখকের রচনবালী পাঠ করিলে মর্গ্যানের পরবর্ত্তী কালের সকল সিদ্ধান্ত ইংরেজিতে পাওয়া যায়। সেই সকলের চুম্বক-প্রকাশ এই ভূমিকায় চলিতে পারে না।

ইতিহাসের "আর্থিক ব্যাখ্যা"

(১)

মানব-জাতির শৈশব সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আলোচনা এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থের প্রথম কথা। তুলনাসিদ্ধ ইতিহাস হিসাবে এই রচনা এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর এক তরফ্ হইতে এই কেতাব সুধী-মহলের শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। সে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা বা সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যার তরফ্।

এই "আর্থিক ব্যাখ্যা" "ভৌতিক" ব্যাখ্যা ইত্যাদি ধরণের "ব্যাখ্যা"টা কি চীজ? এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ স্বয়ংই এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর প্রয়োগ-ক্ষেত্র। কেতাবটা ঘাঁটিলেই "ফলেন পরিচীয়তে।" সেই ব্যাখ্যা-প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই কেতাব বাংলায় দেখা দিল।

ভারতবাসীর পক্ষে "আর্থিক ব্যাখ্যা" হজম করা কিছু কঠিন। কেননা লেখায়, বক্তৃতায়, পাঠশালায়, বাক্‌বিতণ্ডায়, কবিতায়,

ইতিহাসে, খবরের কাগজে, মায় রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সভায় সভায় ও আমাদের পণ্ডিত এবং জননায়কগণ আমাদিগকে দুই পুরুষ ধরিয়া একটা মাত্র বুখ্নি শেখাইয়া আসিয়াছেন। সেই বুখ্নির মোটা কথা এই—"হিন্দু-মুসলমান আমলে নর-নারীরা ইহলোকের ধার ধারিত না। তাহারা পরলোক লইয়াই মস্‌গুল থাকিত। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ছিলেন পূরামাত্রায় আত্মিক। ভৌতিক জগৎটা তাঁহাদের জ্ঞান ও কর্ম্মের বহির্ভূত ছিল। যদিও বা কিছু অন্তর্গত ছিল তাহাও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।"

(২)

প্রাচীন ভারতের লোকগুলা যে মানুষ ছিল, ইহাদের যে রক্ত-মাংসের শরীর ছিল, অতএব রক্ত-মাংসেব স্বধর্ম্ম হিন্দু-মুসলমানদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিত—এই কথা বিশ্বাস করা আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহারা ছিলেন বোধ হয় প্রায় সকলেই ইতিহাসের "আত্মিক ব্যাখ্যার" ধুরন্ধর, অধ্যাত্মবিদ্যার পাণ্ড় বিশেষ। সভ্যতার এবং মানব-জীবনের একবগ্‌গা আত্মিক ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য মুল্লুকেও বহুকাল চলিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বুখ্নিটাই বোধ হয় ভারতীয় সমাজ-সংস্কারক এবং ইতিহাস-লেখক-মহলে অতিমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল।

এই একবগ্‌গা আত্মিক ব্যাখ্যার উপর চাবুক লাগানো হইয়াছে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত মৎপ্রণীত "পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অব্ হিন্দু সোসিয়োলজি" (অর্থাৎ হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব-ভিত্তি) নামক গ্রন্থে (পানিনি-কার্য্যালয়, এলাহাবাদ)। এই

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে ১৯২১ সালে। ভারতীয় মানুষের ক্ষিধে পায়, ভারতীয় মানুষ হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ায় না, পায়ে হাঁটিয়া চলে, ভারতীয় মানুষ জমি-জমা লইয়া মারামারি করে, ভারতীয় মানুষ লড়াই করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে চায়, ভারতীয় মানুষ "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং" কামনা করে, ভারতীয় মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করে, ভারতীয় মানুষ স্ত্রী-পুত্রের জন্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্য সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিধান করিতেও অভ্যস্ত,—এই সকল অতি মামুলি বস্তু এই গ্রন্থের তথ্য।

"ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল্" বা অতীন্দ্রিয় তরফ্‌টাকে ফুলাইয়া তুলিলে হিন্দুজীবন, হিন্দুত্ব, প্রাচ্য ধর্ম্ম, প্রাচ্যের সভ্যতা বুঝিতে পারা যাইবে না। ইতিহাস-রচনায় প্রচলিত "অতীন্দ্রিয়ামি" বা "আধ্যাত্মিকামি"র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু করিবার জন্যই ভারতীয়দের বাস্তবনিষ্ঠা প্রদর্শিত করা হইয়াছে। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ-প্রবর্ত্তিত "পজিটিভ্" শব্দের দ্বারা গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ, বাস্তবিক, "লোকায়ত", ইহলৌকিক, ভৌতিক, "মেটিরিয়ালিষ্টিক্" সাংসারি[illegible]নমিক্" "আর্থিক" —এসব শব্দ একই অর্থের এপাশ [illegible]শ মাত্র বিবৃত করে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ্ ভাষায় প্রকাশিত "ডিশাউংলেবেন্‌স্-আন্‌শাউং ডেস্ ইণ্ডারস্" (ভারতীয় জীবন-সমালোচনা) গ্রন্থেও (লাইপৎসিগ্, ১৯২৩) বিজ্ঞানমহলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

(৩)

"পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" গ্রন্থে ভারতীয় ইতিহাসের বাস্তব

বা ভৌতিক (এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক) "ভিত্তি" মাত্রের সূচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের আর্থিক বা ভৌতিক "ব্যাখ্যা" বলিলে যাহা বুঝায় তাহা "ভিত্তি" মাত্রের সমান নয়। এই ভিত্তিটাকে জীবনের, সভ্যতার এবং ক্রমবিকাশের "কারণ" রূপে প্রদর্শন না করা পর্য্যন্ত আর্থিক "ব্যাখ্যা" জারি করা হইয়াছে বলা হইবে না।

অর্থাৎ কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের কতকগুলা তথ্য ইতিহাস-গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে ছড়াইয়া দিলেই সভ্যতার আর্থিক "ব্যাখ্যা" করা হইল না। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় এই ব্যাখ্যার আসল কথা। থাওয়াপরার ব্যবস্থা দ্বারা, অন্নসংস্থানের উপায়ের দ্বারা, সোজা কথায় ভাত-কাপড়ের প্রভাবে দুনিয়ার ধর্ম্ম, সুকুমার শিল্প পারিবারিক রীতিনীতি, সৌজন্য, শিষ্টাচার এবং রাষ্ট্রশাসনের বিধি-নিষেধ সবই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, —এই কথা যে-সকল ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন একমাত্র তাঁহারই সভ্যতার ভৌতিক "ব্যাখ্যা" প্রচার করিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ইতালীয় ইতিহাস-দার্শনিক ভিকো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই ভৌতিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কস্-এঙ্গেল্স প্রচারিত "ডাস্ কোমুনিষ্টিশে মানিফেষ্ট্" অর্থাৎ ধনসাম্যধর্ম্মীদের অনুসাশন বা ইস্তাহার (১৮৬৭) নামক পুস্তিকায় এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর মূলসূত্রগুলা জগতে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছে। বিলাতে থোরোল্ড্ রোজার্স নামক প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিদের "ইকনমিক্ ইণ্টারপ্রেটেশন্ অব্ হিষ্টরি" এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর পূর্ব্বাপর ইতিহাস এবং

সমালোচনা নিউইয়র্কের অধ্যাপক সেলিগম্যানের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ফরাসী পণ্ডিত জিদ্ এবং রিষ্ট্ প্রণীত "ইস্তোআরাদে দোক্ত্রিন্ জেকোনোমিক্" গ্রন্থের শেষ অর্দ্ধে এই সকল চিন্তা-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ সুপরিচিত।

প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় মানব-সভ্যতার উপর ভাত-কাপড়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্ বর্ত্তমান জগৎকে "আত্মিক ব্যাখ্যা," আধ্যাত্মিকামি এবং অতীন্দ্রিয়ামির কবল হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের মাথাও অনেকটা পরিস্কার হইয়া আসিয়াছে।

অন্নচিন্তা ও দর্শন-সাহিত্য

(১)

"সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!"—এই গুঁতোর চরম গুঁতো হইতেছেন ভাতকাপড়ের টান, "অন্নচিন্তা চমৎকারা"। একথা আজকালকার দিনে কোনো ভারতবাসীকে এমন কি ফর্সা-কাপড়জামা-পরা পরীক্ষায়-পাশকরা মস্তিষ্কজীবী "ভদ্রলোক"দিগকেও—চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার দরকার নাই। ইয়োরোমেরিকায় কোনো নরনারীই এই বিষয়ে অন্ধ নয়। সভ্যতার "আর্থিক ব্যাখ্যা" বিংশ শতাব্দীর এক প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, তুনিয়ার "হাভাতে" "হাঘরে" দরিদ্র নির্য্যাতিত প্যারিয়াদের পক্ষে ইহাই একমাত্র বেদান্ত।

যাহারা চাষ-আবাদে জীবন ধারণ করে, তাহাদের "স্বধর্ম্ম" অর্থাৎ রীতিনীতি লেনদেন শাসন-শোষণ—একপ্রকার। আবার যাহারা জানোয়ার চরাইয়া সভ্যতা গড়িয়া তুলে তাহাদের ধরণ-ধারণ "আত্মিক" জীবনও আর একপ্রকার!

সেইরূপ যাহারা "রোজ আনে রোজ খায়" তাহারা বিশ্ব-শক্তিকে এক চোখে দেখে। আবার যাহারা যে জিনিষ তৈয়ারী করে সেই জিনিষ খায় না, সেইগুলার বদলে বাজার হইতে আর-একপ্রকার জিনিষ "কিনিয়া" আনিয়া খায়, আবার কিছু কিছু জমাইয়াও রাখে; তাহাদের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি, তাহাদের দর্শন, তাহাদের জীবন-সমালোচনা, তাহাদের বিশ্বদৃষ্টি ("হ্বেল্টান্‌শাউঙ") অন্যবিধ।

আবার চাষ-আবাদের ফলে বা আওতায় যে বিবাহ-পদ্ধতি, যে শিল্পকলা, যে ভগবদ্ভক্তি দেখা দেয় অন্য কোনো প্রকার ধন-সৃষ্টির ফলে বা আওতায় ঠিক সেইরূপভাবে এইসব না গজাইতেও পারে। শিল্পকর্ম্ম হাতের জোরে চলিলে একধরণের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠে। কিন্তু সেই শিল্পই যন্ত্রের দ্বারা চালিত হইলে দর্শন, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের সম্বন্ধ, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ, সবই নবরূপে দেখা দেয়। পল্লীস্বরাজ নামক সমাজ-শাসন বা রাষ্ট্রশাসন যে-ধরণের কৃষিশিল্পবাণিজ্যের প্রতিমূর্ত্তি নগরকেন্দ্র ঠিক সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থার সন্তান নয়; ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২)

এইসকল বিভিন্নতা ও পার্থক্যের ভিতর জগতে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক ভেদ নাই। শাদা চামড়া, লাল চামড়া, কাল চামড়া, হল্‌দে চামড়ার প্রভেদও নাই। ধনোৎপাদনের প্রণালী দুনিয়ার যত জায়গায় এবং যত যুগে একপ্রকার, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি মানব-সভ্যতার অভিব্যক্তিগুলা তত জায়গায় এবং তত যুগে একজাতীয় সমশ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান।

বাষ্প-চালিত শিল্প-বাণিজ্যের যুগারম্ভ পর্য্যন্ত কি এশিয়া, কি ইয়োরামেরিকা সকল ভূখণ্ডের মানবজাতিই এক "আদর্শে" চলিয়াছে। ইয়োরামেরিকা বর্ত্তমনে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে হাতের জোরে এবং মাথার জোরে। এই সৃষ্টিকার্য্যে এশিয়া এক কাঁচ্চাও সাহায্য করিতে পারে নাই। এই যুগে এশিয়াবাসীর মগজ্ পচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান জগৎ সৃষ্ট হইবামাত্র ইয়োরামেরিকা প্রায় ষোল আনাই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এই জন্যই আজ গতানুগতিকপন্থী এশিয়ার নরনারী ইয়োরামেরিকান্-দিগকে কোনো মতেই চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

তবে ইয়োরামেরিকার আবিস্কৃত বর্ত্তমান জগৎটা এশিয়ায়ও আসিয়া হাজির হইয়াছে। চীন, জাপান, ভারত, পারস্য, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের যেখানে যতখানি এই বর্ত্তমান জগতের প্রভাব দেখা যায় সেইখানে ততখানি এশিয়ান্ নরনারী ইয়োরামেরিকান্‌দের "মাসতুত ভাইয়ের" মতনই চলা-ফেরা করিয়া থাকে। ষ্টীম এঞ্জিন্ হইতে বোলশেহ্বিজম্ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতের সকল "সমস্যাই" আজ খাঁটি প্রাচ্য স্বদেশী মাল।

রক্তমাংসের স্বধর্ম্ম

মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্ প্রচারিত স্বতঃসিদ্ধগুলা অন্যান্য বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধসমূহেরই অনুরূপ। প্রত্যেক স্বতঃসিদ্ধেরই সীমানা আছে। আজকালকার বিজ্ঞান-জগতে আইনষ্টাইনের "রেলেটিহ্বিটি" বা আপেক্ষিকতা দিগ্‌বিজয় লাভ করিয়াছে। আইন্‌ষ্টাইনের তত্ত্বটা যদিও বুঝি না তাঁহার বোল্‌টা ব্যবহার করিতে ভয় পাইতেছি না। এই পারিভাষিক হিসাবে বলিতে চাই যে, আর্থিক ব্যাখ্যা-প্রণালীর স্বতঃসিদ্ধগুলাও "রেলেটিহ্ব" অর্থাৎ আপেক্ষিক।

মার্কস্-এঙ্গেল্‌সের কট্টর সেবকেরা অবশ্য এইসকল সূত্রের আপেক্ষিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। ইহারা একবগ্‌গা লোক, অদ্বৈতবাদী, "মোনিষ্টিক্"। কিন্তু বর্ত্তমান লেখক মানবজীবনকে কোনো এক খুঁটায় খাড়াভাবে দেখিতে বুঝিতে বা ব্যাখ্যা করিতে অপারগ। এক সঙ্গে বহু শক্তি জীবনকে পুষ্ট করিতেছে। এই বহুত্বের ভিতর শারীরিক কাঠাম, শরীরের শক্তিযোগ, রক্তমাংসের স্বধর্ম, সংগ্রামধর্ম্মের স্বাস্থ্যভিত্তি, আর্থিক মেরুদণ্ড, "দেহাত্মকবুদ্ধির" বস্তুতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত শক্তিগুলার ইজ্জৎ খুব বড়। জগতের পণ্ডিতেরা ভৌতিক ধর্ম্মের ইজ্জৎ সহজে দিতে রাজি নন। সেই সকল অধ্যাত্মনিষ্ঠ একবগ্‌গা পণ্ডিতের একদেশদর্শিতা ধ্বংস করিবার জন্য সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যার, এমন কি সময় সময় একবগ্‌গা আর্থিক ব্যাখ্যারও, প্রয়োজন আছে। "যেমন কুকুর, তেমন মুগুর।"

এই প্রয়োজনটা ভারতে যতই বুঝা যাইতে থাকিবে ততই সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র, পরিবার, সামাজিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য জীবন-কেন্দ্রগুলা বুঝিবার পক্ষে যুবক ভারত দিন দিন উন্নতি লাভ করিবে। অধিকন্তু ভবিষ্য ভারতকে কোন্ পথে চালাইলে কত চালে কিস্তীমাৎ হইবে তাহার অনেক সঙ্কেতই এই আর্থিক-ব্যাখ্যা-সমন্বিত ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিস্কার হইয়া আসিবে। এই ব্যাখ্যাই যুবক-ভারতে যুগান্তরের দ্বিতীয় স্তর গঠন করিবে। ভারতীয় "যৌবন পূজা"র আন্দোলনে অতীত-নিষ্ঠা এবং ভবিষ্য-বাদ দুইই নবরূপে দেখা দিবে।

এইসকল বিষয় "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের নানাখণ্ডে ঠারে

ঠোরে উত্থাপন করিয়াছি। সুবিস্তৃত গ্রন্থ লিখিবার সুযোগ ও সময় জুটে নাই। কিন্তু এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থে বাঙ্গালী পাঠক নবীন ইতিহাস-বিজ্ঞানের রস এক খাঁটি ফোয়ারার স্রোতেই—বস্তুতঃ স্বয়ং ভগীরথের তত্ত্বাবধানেই—চাখিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না বা কম জানেন তাঁহাদের কাজে আসিলেই এই অনুবাদ-গ্রন্থ সার্থক হইবে। *

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

* লুগানো, সুইটসার্ল্যাণ্ড
৮ই এপ্রিল, ১৯২৪

সূচীপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা

কার্ল্ মার্ক্স্ ও ফ্রিড্রিশ্ এঙ্গেল্স্

প্রথম অধ্যায়

মান্ধাতার আমল

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবারের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

ইরোকোআদের গোষ্ঠী-প্রথা

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রীক্ সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা

পঞ্চম অধ্যায়

আথেনিয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোমাণ সমাজে গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

"বার্ব্বার" জীবন ও "উৎকর্ষ"

পরিবার, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্র

প্রথম অধ্যায়

মান্ধাতার আমল

মর্গ্যানের "প্রাচীন সমাজ"

মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ্ লুইস্ মর্গ্যান প্রণীত "এন্শ্যেণ্ট সোসাইটি" বা "প্রাচীন সমাজ" নামক গ্রন্থ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বাখোফেন প্রণীত "মুট্টার রেষ্ট" বা "জননী-বিধি" নামক গ্রন্থে এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্কট্ল্যাণ্ডের আইন-ব্যবসায়ী ম্যাক্লেনানের "প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা" নামক গ্রন্থে আদিম মানব সমাজে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির আলোচনা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু মর্গ্যানই সর্ব্বপ্রথম সাবেক কালের সামাজিক ক্রম-বিকাশের ধারাটা যুক্তি-সঙ্গত রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রাণি-বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনায় ডারুইনের যে কীর্ত্তি, ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার ক্রম-বিকাশে কার্ল্‌মার্ক্‌সের যে ঠাঁই, মানবজাতির শৈশব অবস্থার ইতিহাস সঙ্কলন বিষয়ে মর্গ্যানকে সেই কীর্ত্তি ও ঠাঁই দিতে হইবে।

মানবজাতির শিশুকাল তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথমতঃ "স্যাভেজ" অর্থাৎ "সহজ" বা প্রকৃতির অবস্থা। "স্যাভেজ" শব্দে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা বুঝিতে হইবে না। এইজন্য "প্রাকৃতিক", "সহজ" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা গেল। দ্বিতীয়তঃ, "বার্ব্বারিয়ান," অর্থাৎ বার্ব্বার বা গোড়াপত্তনের অবস্থা। "বার্ব্বারিয়ান" শব্দেরও প্রচলিত অর্থ এই ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয়। ভারতীয় "বর্ব্বর" শব্দের যে অর্থ তাহাও এখানে চলিবে না। 'বার্ব্বার" বলিয়া একটা "যোগরূঢ়" শব্দ গড়িয়া লওয়া গেল। সোজাসোজি ইহার অর্থ ধরিয়া লইলাম "গোড়াপত্তন।" পরবর্ত্তী আলোচনায় বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা বাহির হইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ, "সিহ্বিলিজেশ্যন" বা উৎকর্ষের অবস্থা। এই "সিহ্বিলিজেশ্যন" শব্দটাও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একটা শব্দ-স্বরূপ ব্যবহার করা গেল। আটপৌরে ভাবে এই শব্দে আমরা সভ্যতা, ভব্যতা, শিষ্টাচার, "শীল" ইত্যাদি যে সকল বস্তু বুঝিয়া থাকি সেই সব কথা এখানে মনে আনিবার প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য, এই কারণেই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের "সহজ" এবং "বার্ব্বার" অবস্থাকে চলতি ভাষায় "অ-সভ্য", "বর্ব্বর", "অশিষ্ট", ইত্যাদি রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভুল করা হইবে।

মর্গ্যানের কেতাবে প্রথম দুই স্তরেরই বিশেষ বিশ্লেষণ আছে। তৃতীয় স্তরের পূর্ব্বাভাষ মাত্র তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রত্যেক স্তরকেই তিনি আবার পরপর তিন স্তরে ভাগ করিয়াছেন। খাওয়া পরার উপায় বাহির করিবার পথে মানুষ যেমন যেমন ওস্তাদি দেখাইয়াছে তেমন তেমন স্তরগুলাকে নীচু,

মাঝারি এবং উঁচু রূপে বিবৃত করা হইয়াছে। মর্গ্যানের বিবেচনায় খাওয়াপরার উপায় বাহির করিবার পথে মানুষ যত ওস্তাদ হয় ততই দুনিয়ার উপর মানুষের দখল বাড়িয়া যায়। যে যে যুগে অন্ন-সংস্থান স্বচ্ছল ও সহজভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে সেই সেই যুগে মানুষের কাজ-কর্ম্ম একটা উল্লেখযোগ্য গৌরব-গর্ব্বের অধিকারী হইতে পারিয়াছে। মানবজাতির পারিবারিক বা যৌন-সম্বন্ধের ক্রম-বিকাশ বিষয়েও এই অন্ন-সংস্থানের উপায় আবিষ্কার করিবার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মানবজাতির "সহজ" বা প্রাকৃতিক যুগ

১। নিম্নস্তর। এই যুগকে মানব সমাজের শৈশব অবস্থা বলিতে হইবে। মানুষ তখন তাহার আদিম জন্ম-নিকেতনেই বসবাস করিত। গ্রীষ্ম-প্রধান জনপদের নানা অঞ্চলে ছিল তাহাদের জীবন-কেন্দ্র। অনেক সময় তাহারা গাছে গাছে কাটাইতে বাধ্য হইত। বন্য জানোয়ারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য গাছ তাহাদের পক্ষে ছিল দুর্গ বিশেষ। ফল মূল ছিল তাহাদের খাদ্য। পরস্পর মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য ধ্বনির উৎপত্তি এই যুগের এক বড় ঘটনা। আজ-কাল জগতে যে সকল জাতি জ্যান্ত রহিয়াছে অথচ সাবেক কালে যে সকল জাতি জগতে মাথা তুলিয়াছিল তাহাদের কাহারো পূর্ব্বপুরুষের কোষ্ঠী "স্যাহেবজ" বা সহজ যুগ পর্য্যন্ত ঠেকে না। এই যুগটা হাজার হাজার বৎসর চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণের দ্বারা তাহার আয়ু মাপা অসম্ভব। মানুষ জানোয়ার জাতিরই বংশধর,—এই কথাটা মানিয়া লইলে তাহার

আদি শৈশবের নিম্নতম স্তরটা সম্বন্ধে বিনা আপত্তিতেই এই বিবরণ স্বীকার করা সম্ভব।

২। মধ্যস্তর। শৈশব পার হইয়া মানুষ "সহজ" যুগের মধ্যস্তরে পা ফেলিবার সময় মাছ, কাঁকড়া, শামুক এবং অন্যান্য জলজ জীবের ব্যবহার শিক্ষা করে। আগুনের ব্যবহারও মানুষ এই স্তরেই শিখিয়াছিল। আগুন এবং মাছজাতীয় খাদ্যের সাহায্যে মানুষ জল-বায়ুকে খানিকটা বশে আনিতে থাকে। নদী, সমুদ্র অথবা হ্রদের কিনারা ধরিয়া সে জগতের নানাস্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। এই বিচরণের যুগেই প্রস্তর-যুগের প্রাচীনতম যন্ত্রগুলা ব্যবহৃত হইত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই সমুদয় যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে "সহজ" যুগের নর-নারী দেশ দেশান্তরে জীবন-কেন্দ্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

আগুনের সাহায্যে তাহারা সর্ব্বত্র নয়া নয়া খাদ্য পরখ্ করিতে পারিত। গরম ছাইয়ে পুড়াইয়া অথবা এমন কি উননে পুড়াইয়াও তাহারা ক্রমশঃ শাক-সব্জী জাতীয় বস্তু খাইবার উপায় আবিষ্কার করে। জানোয়ার শিকার করিবার জন্য বল্লম, খাঁড়া ও অন্যান্য যন্ত্র আবিষ্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে মাংসও আহার্য্য তালিকায় ঠাঁই পাইতে থাকে। অনেক কেতাবে আমরা পাঠ করিয়া থাকি যে, বহু সমাজ একদম শিকারের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করিত। এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ শিকারের ফল নেহাৎ অনিশ্চিত।

তবে খাদ্যদ্রব্যের আবিষ্কার সর্ব্বদাই সহজ নয়। অধিকন্তু প্রকৃতি এই গুলির জোগান সম্বন্ধেও অত্যধিক মুক্ত-হস্ত নয়।

কাজেই মানুষ স্বজাতীয় মানুষ খাইতেই সুরু করিয়া দেয়। মানুষ খাওয়াটা বোধ হয় "স্থাহেজ" যুগের দ্বিতীয় স্তরের আবিষ্কার। বহুকাল ধরিয়া এই অনুষ্ঠান চলিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান জগতেও অষ্ট্রেলিয়া এবং পলিনেশিয়া দ্বীপের আদিম-বাসীরা মানুষকে খাদ্যদ্রব্য বিবেচনা করিয়া থাকে।

৩। উচ্চস্তর। তীর-ধনুকের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে "সহজ" মানুষ মধ্যস্তর ছাড়াইয়া উঠে। এই উচ্চতর স্তরে জানোয়ারের মাংস তাহার নিত্য খাদ্যের অন্তর্গত হয়। শিকার ছিল এই স্তরের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি। ধনুর্ব্বিদা একটি জটিল ও কঠিন বিদ্যা। দড়ি, জ্যা, ফলা ইত্যাদি তৈয়ারি করিতে পারা অনেক মাথা খাটাইবার উপর নির্ভর করে। এই সকল বস্তু আবিষ্কার করিতে যে পরিমাণ বুদ্ধির দরকার হয় এবং তাহার ফলে যে সকল শিল্প বাহির হইয়া পড়ে তাহার দ্বারা একই সঙ্গে আরও বহুবিধ আবিষ্কারের পথ খুলিয়া গিয়াছিল।

তীর-ধনুকের যুগেই মানুষ গ্রামে গ্রামে বস্তি বসাইতে সুরু করে। খাদ্যদ্রব্যের উপর বাছাই ও শাসন ইত্যাদি দেখা দেয়। কাঠের বাসন-কোসন এবং যন্ত্রপাতি এই যুগেরই জিনিষ। তখনও তাঁত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু হাতে সুতা কাটিবার এবং কাপড় বুনিবার কৌশল মানব-সমাজে দেখা দিয়াছিল। বেতের চুপড়ী, ধামা, ডালা ইত্যাদি বুনিতে ওস্তাদি দেখানো এই স্তরের এক বিশেষত্ব। অধিকন্তু মানুষ পাথরের যন্ত্রগুলা ঘসিয়া মাজিয়া ছুঁচোল করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মধ্যস্তরের পাথরগুলা ভোঁতা ছিল কাজেই উচ্চস্তরকে নব্য-প্রস্তর যুগ বলা হয়।

নব্য-প্রস্তর যুগের ছুঁচোল পাথরের কুড়াল মানুষের ইতিহাসে

এক অতি বিপুল "আবিষ্কার" বিশেষ। প্রাচীন-তর কালের আবিষ্কৃত আগুনের সঙ্গে কুড়ালের সংযোগে মানুষ গাছ খুদিয়া নৌকা বাহির করিয়াছিল। গাছ চিড়িয়া তক্তা আবিষ্কার করা এবং তাহার দ্বারা ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করাও নব্য-প্রস্তর যুগেরই কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য এই সকল রকমারি আবিষ্কারের আবেষ্টনেই তীর-ধনুকের উৎপত্তি হয়।

উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে সকল ইণ্ডিয়ান নর-নারী বাস করে তাহাদের জীবনে প্রাথমিক তীর-ধনুকের আনুষঙ্গিক সকল প্রকার কলা· ও বিদ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মাটীর বাসন ব্যবহার করিবার কায়দা এখনো রপ্ত করিতে পারে নাই।

এইখানে সভ্যতা বিকাশের ধারা সম্বন্ধে একটা সূত্র প্রচার করা যাইতে পারে। "সহজ" যুগে মানুষের পক্ষে তীর-ধনুকের যে দাম "বার্ব্বার" যুগে লোহার তলোয়ারের সেই দাম। সেই দামই আবার "সিভিলিজেশ্যন" বা উৎকর্ষের যুগে বন্দুকের। এই তিন যন্ত্রেই মানুষ বিশ্ব-বিজয়ের হাতিয়ার পাইয়াছে।

মানবজাতির "বার্ব্বার" বা গোড়া পত্তনের যুগ

১। নিম্নস্তর। মাটির বাসন ব্যবহার করিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে নর-নারী "সহজ" যুগের উপরের ধাপে পদার্পণ করে। "সহজ" যুগের উচ্চতম স্তরে বোধ হয় মানুষ বেতের অথবা কাঠের বাসন-কোসন আগুনের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেছিল। এই জন্য পথ ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে কাদা মাটি দিয়া বাসনগুলিকে লেপিবার কৌশল আবিষ্কৃত

হইয়া থাকিবে। অল্পকালের ভিতর মাটির বাসনই স্বাধীনভাবে একটা নয়া আবিষ্কার স্বরূপ নর-সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়।

মাটির বাসন আবিষ্কার করা পর্য্যন্ত জগতের সকল দেশেই মানুষ বোধ হয় এক পথে ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জনপদে হয়ত ক্রম-বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন রীতি দেখা দেয় নাই। কিন্তু "বার্ব্বার" যুগে মানবজাতির ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। এই যুগে দেশে দেশে বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক সুযোগ কাজে লাগাইতে যাইয়া মানুষ তাহার জীবন গঠন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রকটিত করিয়াছে।

জানোয়ার পুষিতে পারা "বার্ব্বার" যুগের সর্ব্বপ্রথম বিশেষত্ব। জানোয়ারকে পোষ মানাইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তাহাকে নানাবিধ আটপৌরে কাজে লাগানো বার্ব্বার মানবের মস্ত কৃতিত্ব। ঠিক এই ধরণেরই আর এক কৃতিত্ব—চাষ-আবাদ করিয়া উদ্ভিদ্‌কে "পোষ মানানো," শাক-সব্জী, গাছ-গাছড়ার উপর মানুষের দখল বসানো। এইখানে জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে হইবে।

পুরাণো দুনিয়ায় অর্থাৎ পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে (এসিয়ায়, ইয়োরোপে, আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলেশিয়ায়) ছিল পোষ-মানার উপযুক্ত প্রায় সকল প্রকার জীবজন্তু। আর চাষ-আবাদের যোগ্য সকল প্রকার শস্যই মাত্র একটা ছাড়া ছিল এই গোলার্দ্ধে। অপর পক্ষে তথাকথিত নয়া দুনিয়ায় অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্দ্ধে ছিল মাত্র একটা স্তন্যপায়ী পোষযোগ্য জানোয়ার। নাম তাহার লামা। এইটাও মাত্র দক্ষিণ আমেরিকার অতি সঙ্কীর্ণ জনপদের জীব। আর

গোটা আমেরিকা ভূখণ্ডে জন্মিত মাত্র এক শস্য,—ভুট্টা। অবশ্য এটা খাদ্য হিসাবে উচ্চতম শ্রেণীর শস্য সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক সুযোগের বিভিন্নতার জন্য বার্ব্বারেরা দুই গোলার্দ্ধে বিভিন্ন পথে জীবন-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে লাগিল। কাজেই বার্ব্বার যুগের স্তরে স্তরে দেশ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন স্তর-বিন্যাস দেখিতে পাই।

২। মধ্যস্তর। পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের নর-নারী এই স্তরে পা ফেলে জীবজন্তু পোষ মানাইতে। পশ্চিম গোলার্দ্ধের এই স্তর সুরু হয় চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে। "আডোব" অর্থৎ রোদে পোড়া ইট এবং পাহাড়ী পাথর দিয়া ঘর-বাড়ী তৈয়ারী করাও আমেরিকায় এই স্তরের ঘটনা।

পশ্চিম দুনিয়া অর্থাৎ আমেরিকার ক্রম-বিকাশই প্রথম আলোচনা করা যাইতেছে। কেন না ইয়োরোপীয়েরা যখন এই মুল্লুক আবিষ্কার করে তখন পর্য্যন্ত এই জগতের বার্ব্বারেরা মধ্যস্তরেই জীবন ধারণ করিতেছিল।

মিসিসিপি নদীর পূর্ব্বদিকে—অর্থাৎ বর্ত্তমান মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের পূর্ব্বার্দ্ধে তখনকার ইণ্ডিয়ানরা ছোট ছোট বাগানে চাষ চালাইত। ভুট্টা এবং কুমড়া, শশা, খরমুজ ইত্যাদি শস্যের আবাদ করিত। তাহারা কাঠের বাড়ীতে বাস করিত, পল্লীগুলা দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইহারা "বার্ব্বার" যুগের নিম্নতম স্তরের সাক্ষী।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের—বিশেষতঃ কলম্বিয়া নদীর দুই ধারকার ইণ্ডিয়ানরা তখনও "সহজ" যুগ ছাড়াইয়া "বার্ব্বার" যুগে পা দেয় নাই। তাহারা মাটীর বাসন ব্যবহার করিত না। চাষ-আবাদও তাহাদের জানা ছিল না।

কিন্তু বর্ত্তমান যুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে-নিউ মেক্সিকো প্রদেশে,—মেক্সিকো দেশে; গোটা মধ্য আমেরিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে যে সকল ইণ্ডিয়ানকে ইয়োরোপীয়েরা আবিষ্কার করে তাহারা ছিল "বার্ব্বার" যুগের মধ্যস্তরের নর-নারী। তাদের "আডোব" অথবা পাথরের গড়া ঘর-বাড়ীগুলা দুর্গের মতন দেখাইত। ভিন্ন২ আবহাওয়া এবং জনপদের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপন্ন করিতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল। তাহারা বাগ-বাগিচায় কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচনের ব্যবস্থা করিয়া চাষের উন্নতি সাধন করিত। মেক্সিকানরা "টার্কী" মুর্গী এবং অন্যান্য চিড়িয়া পুষিত। "লামা" ছিল পেরুর্ ইণ্ডিয়ানদের পোষমানা জানোয়ার।

লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর ব্যবহারও ইহাদের জানা ছিল। কিন্তু লোহার অভাবে ইহারা পাথরের যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। স্পেনদেশের দখলে আসিবার ফলে ইহারা পরবর্ত্তী স্তরের জীবন গড়িয়া তুলিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে বার্ব্বারেরা দুধ দুহিতে শিখিয়া মধ্যস্তরে উঠিয়াছিল। যে সকল জানোয়ার দুধ দেয় আর যাহাদের মাংস খাওয়া যায় এইরূপ জানোয়ারের "চাষ" ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত উদ্ভিদের চাষ এই গোলার্দ্ধে প্রচলিত হয় নাই।

জানোয়ারের "চাষ" করিতে-করিতে পশু-পালক দল বাড়িয়া যাইতেছিল। দলগুলা ক্রমশঃ এত ছড়াইয়া পড়ে যে, হয়ত এই উপায়ে এসিয়ার সেমিট এবং "আর্য্য" জাতিরা অন্যান্য বার্ব্বার জাতি হইতে ফারাক্ হইয়া যায়। ইয়োরোপের এবং এশিয়ার

ভাষাগুলার ভিতর জানোয়ারের নাম অনেক ক্ষেত্রেই একরূপ। কিন্তু উদ্ভিদের নামগুলা এশিয়ায় ও ইয়োরোপে পৃথক্। চাষ-আবাদ শিখিবার পূর্ব্বেই বার্ব্বার সমাজে ভাগাভাগি হইয়াছিল এই কারণে বিশ্বাস করা চলে।

পশু-পালনকারীরা বহুকাল পর্য্যটকের সমাজেই জীবন ধারণ করিত। ইউফ্রেতিস এবং তাইগ্রিস দরিয়ার উপকূলে, ভারতের সমতল অঞ্চলে, মধ্য এসিয়ার অক্সাস এবং জাক্জার্ভেস-মাতৃক জনপদে, রুশিয়ার ডন এবং ড্নিপার নদীর দুইধারে পর্য্যটক সমাজগুলা জানোয়ার চাষের সুন্দর সুযোগ পাইয়াছিল।

জানোয়ার পুষিতে অভ্যস্ত হইয়াই বার্ব্বারের দল এই সকল প্রকৃতির অনুগৃহীত অঞ্চলের দাম বুঝিতে শিখে। বন-জঙ্গলময় আর শীতের দৌরাত্ম্যে মৃতপ্রায় ভূখণ্ডে পশুপালন সহজসাধ্য নয়। নদী-মাতৃক উর্ব্বর ভূমির গুণ ক্রমশঃ ইহারা পশুপালনের কাজে লাগাইতে সুরু করে। পরে জানোয়ারগুলাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই ইহারা শস্যের চাষ শিখিয়া থাকিবে। উদ্ভিদ হইতে মানুষের খোরাকও যে জুটিতে পারে এই ধারণা বার্ব্বারদের মাথায় প্রথমে জন্মিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

মাংস এবং দুধ খাইয়া আর্য্য এবং সেমিট নর-নারী পুষ্ট হইতে থাকে। এই দুই আহার্য্য দ্রব্য ইহাদের কলেবর দৃঢ় এবং সুষ্ঠু রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। সন্তান সন্ততির শারীরিক উৎকর্ষ মাংস এবং দুধের দ্বারা বিশেষ রূপেই সাধিত হয়। নিউমেক্সিকো প্রদেশের পুয়েব্লো-"ইণ্ডিয়ান" নিরামিষাশী। ইহাদের মাথা মাছ-মাংস খাওয়া "ইণ্ডিয়ান"দের চেয়ে ছোট।

এই যুগে মানুষ-খাওয়া প্রথা বার্ব্বার সমাজ হইতে লুপ্ত হয়।

আজকাল এই রীতি কোথাও কোথাও একটা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপে চলিয়া থাকে মাত্র। কখনো কখনো বা মানুষ-খাওয়া কাণ্ড একটা দৈব দাওয়াই বিশেষ।

৩। উচ্চস্তর। লোহা-ঘটিত ধাতু পোড়াইতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে বার্ব্বারেরা এই স্তরে পা দেয়। মানবজাতি পরে অক্ষর আবিষ্কার করিয়া লিখিতে সুরু করিয়া এই স্তর ছাড়াইয়া "সিভিলিজেশ্যন" বা উৎকর্ষের কোঠায় উঠিয়াছে।

এই স্তরের পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল যুগে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে সকলগুলা একত্র করিলেও এই স্তরের কীর্ত্তির সমান হইবে না। এই যুগে প্রাচীনতম গ্রীসের "বীর"গণ তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। রোম নগরের ভিত্তি স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতালির জাতিগুলি এই স্তরে জীবন ধারণ করিয়াছিল। ল্যাটীন ঐতিহাসিক তাসিতুস-বিবৃত জার্ম্মাণ জাতি এবং 'ভিকিঙ'-যুগের স্কাণ্ডিনাভিয়ানরাও এই যুগেরই সাক্ষী।

এতদিনে আমরা সর্ব্বপ্রথম লোহার লাঙ্গলের সাক্ষাৎ পাই। জানোয়ারে টানা হালের সাহায্যে চাষ চলিত। তাহার ফলে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত। চাষের জন্যই বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমিন তৈয়ারী করা হইয়াছিল। কাঠ কাটা, আগাছা উড়াইয়া দেওয়া, এসব লোহার কুড়াল এবং লোহার কোদাল ভিন্ন সম্ভবপর হইত না।

এই সকল উন্নতির ফলে লোক সংখ্যা বাড়িতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে "বস্তি" গড়িয়া উঠে। ভূমির চাষ করিতে অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে দু চার লাখ লোক একত্র এক সমাজে

এক নিয়মে বসবাস করিতে শিখিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

বার্ব্বার জীবনের চরম কীর্ত্তি গ্রীক হোমারের কাব্য সাহিত্যে চিত্রিত রহিয়াছে। বিশেষভাবে "ইলিয়াদ"-গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। লোহার যন্ত্রপাতি উন্নত হইয়াছে। কাপড়, কুমারের চাকা ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষেরা তেল এবং মদ তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে। ধাতুজ দ্রব্যে সুকুমার শিল্পে সৃষ্টি পরিস্ফুট। গাড়ী, রথ, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ঘর-বাড়ী, নগর, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্ম্মাণে নানা কৌশল দেখা দেয়। দেওয়াল-ঘেরা নগর, দুর্গ-রক্ষিত নগর এই ছিল তখনকার বার্ব্বারদের সামাজিক জীবন-কেন্দ্র। সাহিত্য-বীর হোমার এই যুগেরই মহাকবি। প্রাচীন গ্রীক দেব-দেবী এই সমাজেরই আবিষ্কার। রোমান সেনাপতি সীজার অথবা ঐতিহাসিক তাসিতুস জার্ম্মাণ-সমাজ সম্বন্ধে যে বিবরণ ল্যাটিন ভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমরা এই হোমারীয়-যুগের প্রাথমিক অবস্থা দেখিতে পাই। গ্রীকেরা যে যুগটা পার হইয়া গিয়াছে জার্ম্মাণরা সেই যুগটার হাতেখড়ি দিতেছে,—এইরূপ ধরিয়া লইলে জীবন-বিকাশের ধারাটা সহজে বুঝা যাইবে।

মর্গ্যানের অনুসন্ধানের ফলগুলা সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া গেল। কথাগুলা সূত্রাকারে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—

১। "সহজ" যুগ,—প্রাকৃতিক বস্তুগুলা মানুষ এই যুগে তাঁবে আনিতে শিখে। এইগুলা নিজ দখলে আনিবার কাজে সাহায্য করিবার জন্যই মানুষ কতকগুলা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলে।

২। "বর্ব্বার" যুগ,—এই যুগে মানুষ জানোয়ার পুষিতে এবং

উদ্ভিদ চাষ করিতে শিখে। অধিকন্তু নানা কৌশলে প্রকৃতির স্বাভাবিক দানগুলাকে কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইয়া দেওয়া বার্ব্বার সমাজের অন্যতম কীর্ত্তি।

৩। "উৎকর্ষের" যুগ,—প্রকৃতিকে কৃত্রিম উপায়ে আরও ফলবতী করিয়া তোলায় মানুষের ক্ষমতা প্রযুক্ত হইয়াছে। এই শক্তি সুকুমার এবং আটপৌরে শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র রূপে দেখা দিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবারের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহতত্ত্ব, কুটুম্বজ্ঞান ও বিবাহ-পদ্ধতি

নিউ ইয়র্ক প্রদেশে ইরোকোআ নামক "ইণ্ডিয়ান" জাতিপুঞ্জের বাস। এই জাতির একটার নাম সেনেকা। এই সেনেকা ইরোকোআদের সমাজে মার্কিণ পণ্ডিত মর্গ্যান বহুকাল বসবাস করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি "সেনেকাদের একজনা" রূপেই পরিগণিত হন।

সেনেকাদের সমাজে একজন পুরুষ একজন স্ত্রীকে বিবাহ করিত। এক নারীর বহু স্বামী অথবা এক পুরুষের বহু পত্নী—এই প্রথা প্রচলিত ছিল না। বিবাহের বন্ধন অতি সহজেই দুই তরফ হইতেই ছিঁড়িয়া ফেলা সম্ভব ছিল। স্ত্রী-বর্জ্জন বা স্বামী-বর্জ্জন বিশেষ কঠিন ছিল না।

এই ধরণের পরিবারের বাপ, মা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন চিনিয়া লইতে বিশেষ কোন কষ্ট কল্পনার দরকার হইত না। কিন্তু আমরা এই সকল শব্দে যে ধরণের কুটুম্বিতা বুঝিয়া থাকি ইরোকাআরা ঠিক সেই ধরণের কুটুম্বিতা বুঝিত না। ইহাদের

পারিবারিক জীবনে আর কুটুম্ব জ্ঞানে এক বিচিত্র অমিল দেখিতে পাই।

ইরোকোআরা পুত্র কন্যা বলিলে নিজের ছেলে মেয়ে ত বুঝেই অধিকন্তু ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাও এই সমাজে পুত্র কন্যা রূপে অভিহিত হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীরাও ইরোকোআকে পিতা বলিয়া ডাকে। কিন্তু ভগ্নির ছেলেমেয়েরা তাহার পক্ষে ভগ্নির পুত্র কন্যাই বটে, আর ইহারাও তাহাকে মামা বলিয়া ডাকে।

অথচ ইরোকোআ নারী তাহার নিজের ছেলেমেয়েকে যে নামে ডাকে তাহার বোনের ছেলেমেয়েকেও সেই নামেই ডাকে। আবার বোনের ছেলেমেয়েরাও তাহাকে মা বলিয়াই ডাকে। কিন্তু তাহার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা তাহার নিকট ভাইপো ভাইজীই বটে, আর ইহারাও তাহাকে পিসি বলিয়া জানে।

এদিকে দুই ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে ভাই-বোন বলিয়া জানে। আবার দুই বোনের ছেলেমেয়েরাও পরস্পর পরস্পরকে ভাইবোন বলিয়া ডাকে। কিন্তু বোনের ছেলে-মেয়েরা ভাইয়ের ছেলেমেয়েদিগকে, আর ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা বোনের ছেলেমেয়েদিগকে সাধারণ ভাইবোন বলিয়া ডাকে না। মামাত, পিস্তুত ভাই বোন শব্দ এই সম্বন্ধের পরিচয় দেয়।

ইরোকোআ সমাজের আত্মীয়তা সূচক শব্দগুলায় নিকট এবং দূর সম্বন্ধত বুঝায়ই অধিকন্তু রক্তের ঐক্য পার্থক্যও এই সকল শব্দে পরিস্কাররূপে ধরা যায়।

ইরোকোআদের ভাষাসম্পদ আশ্চর্য্যজনক। আত্মীয়তাসূচক শব্দগুলার দ্বারা এক এক ব্যক্তির শতাধিক কুটুম্বের পরিচয়

লওয়া যায়। মার্কিণ ইণ্ডিয়ানদের মতনই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের কুটুম্ববাচক শব্দগুলা যারপরনাই ব্যাপক। দাক্ষি-ণাত্যের দ্রাবিড় এবং উত্তর ভারতের গৌড় জাতীয় নরনারীর সমাজে আমেরিকার সেনেকা জাতীয় শব্দের জুড়িদার অনেক। প্রায় দুই শত ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয়ের জন্য তামিল এবং ইরোকোআ সমাজে একই প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আবার. কি আমেরিকায়, কি দক্ষিণ ভারতে,—বিবাহ পদ্ধতির নিয়মে যে ধরণের আত্মীয়তা কায়েম হইবার কথা, ঠিক সেই ধরণে উহা কায়েম হয় না। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধের একটা বিরোধ দেখা যাইতেছে।

এই ধরণের বিচিত্র আত্মীয়তা, সামাজিক সম্বন্ধ বা কুটুম্ব-জ্ঞানের কারণ কি? পারিবারিক জীবনে আর কুটুম্ব-জ্ঞানে বিরোধ আসিল কোথা হইতে? আমেরিকায়, এশিয়ায়, এমন কি আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায়ও,—একদম ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নরনারীর ভিতর একই ধরণের কুটুম্ব-জ্ঞান দেখা যাইতেছে। আবার এই কুটুম্ব-জ্ঞানের সঙ্গে পারিবারিক পদ্ধতির কোন সাম-ঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এই তথ্যের একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বাহির করা আবশ্যক।

স্কটল্যাণ্ডের নৃতত্ত্ববিৎ ম্যাক্‌লেনান এই সকল আত্মীয়তা-বাচক শব্দগুলিকে নিরর্থক শব্দ মাত্র রূপে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টা গভীর ভাবে তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। বাপ, ছেলে, ভাই, বোন ইত্যাদি শব্দে নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে সম্মানসূচক শব্দ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। কেননা এই সকল সমাজে শব্দগুলার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা

সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যের জ্ঞানও জড়িত আছে। ম্যাক্‌-লেনান সেদিকে নজর না দিয়া ভুল করিয়াছেন।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত স্যাণ্ডুইচ্ দ্বীপগুলায় উনবিংশ-শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত এই সেনেকা-তামিল (আমেরিকান দ্রাবিড়) ধরণের "কুটুম্ব-জ্ঞান-ওয়ালা" পরিবার বসবাস করিয়াছে। হাওয়াই দ্বীপবাসীদের নিজ "কুটুম্ব-জ্ঞান"টা তাহাদের পারিবারিক জীবনের অনুরূপ নয়। সেনেকা-তামিল সমাজে পারিবারিক সম্বন্ধে আর কুটুম্ব-জ্ঞানে যেমন একটা অমিল আছে, হাওয়াই সমাজেও সেইরূপ পারিবারিক সম্বন্ধে আর কুটুম্ব-জ্ঞানে একটা অমিল দেখা যায়। হাওয়াই দ্বীপে ভাই এবং বোনের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে ভাই বোন বলিয়া জানে। ইহাদের জনক জননীর সকল ভাই বোনই ইহাদের হিসাবে বাপ মা। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এখানকার "পরিবার জীবনটা" সেনেকা-তামিল-দের "কুটুম্ব-জ্ঞানে"র সঙ্গে মিলে।

অর্থাৎ সেনেকা সমাজে পারিবারিক জীবন আগাইয়া আসিয়াছে কিন্তু কুটুম্ব-জ্ঞান এখনও কোনো সাবেক কালের পারিবারিক জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। সেই সাবেক কালের পরিবার হাওয়াই সমাজে দেখা যাইতেছে। আবার হাওয়াই সমাজের কুটুম্ব-জ্ঞান আরও কোনো পুরাণো পারিবারিক জীবনের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। সেই পুরাণো পারিবারিক জীবনের পরিচয় দুনিয়ার কোনো সমাজে আজকাল পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু নিশ্চয়ই জগতের কোথাও না কোথাও এইরূপ পরিবার ছিল। তাহা না হইলে তাহার অনুরূপ নৃতত্ত্বের গোড়ার কথা কুটুম্ব-জ্ঞান আসিল কোথা হইতে ?

এই সমস্তায় জবাব দিয়াছেন মর্গ্যান। তাঁহার মতে পরিবার, বিবাহ পদ্ধতি, রক্তসম্বন্ধ সর্ব্বদাই বদ্‌লাইতেছে। পারিবারিক জীবন বা যৌন সম্বন্ধ কোনো এক খুঁটায় দাঁড়াইয়া নাই। স্ত্রী পুরুষের যোগাযোগ স্তরে স্তরে উঠিতেছে। গোটা সমাজ যেমন এক ধাপ ছাড়াইয়া আর এক ধাপে গিয়া ঠেকিতেছে নরনারীর পারিবারিক ভিত্তি বা বিবাহ প্রথাও সেইরূপ এক ধাপ ছাড়াইয়া আর এক ধাপে গিয়া পৌঁছিতেছে।

কিন্তু আত্মীয়তা, সামাজিক সম্বন্ধ বা কুটুম্ব-জ্ঞানকে মর্গ্যান গতিশীল পরিবারের উল্টা বিবেচনা করেন। সামাজিক সম্বন্ধে বড় শীঘ্র নড়ন চড়ন দেখা যায় না। কুটুম্ব-জ্ঞান যারপরনাই স্থিতিশীল। পারিবারিক জীবনে মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইবার অনেক পরে হয়ত আত্মীয়তা সম্বন্ধে নরনারীর হুঁস হয়। সামাজিক সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন গজাইতে বহু দিন লাগে। এক কথায়, পরিবার চলিতেছে, কুটুম্ব-জ্ঞান দাঁড়াইয়া আছে।

জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানবিৎ কার্ল মার্কস্ এই উপলক্ষ্যে একটা সাধারণ সূত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন :—"কুটুম্ব-জ্ঞান, সামাজিক সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাই মানব জীবনের একমাত্র স্থিতিশীল, কুম্ভকর্ণ নয়। জগতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অনুশাসন, ধর্ম্ম-পদ্ধতি এবং দার্শনিক মতবাদ সবই এইরূপ গতিহীন। এই অচলায়তনগুলাকে নড়ন চড়ন সহাইতে অনেক সময় লাগে।"

পরিবার ক্রমে ক্রমে বদ্‌লাইতে থাকে। কিন্তু সামাজিক সম্বন্ধ "জীবাশ্মে" পরিণত হয়,—অর্থাৎ "সেকেলে" "বাপদাদাদের আমলের" একটা কিছু থাকিয়া যায়। ফরাসী জীবতত্ত্ববিৎ ক্বিয়ে প্যারিসের নিকট "মার্স্‌পিয়ান" (থলে-বাহী) জানোয়ারের

(যথা কাঙ্গারু) কতকগুলো হাড় পাইয়াছিলেন। সেইগুলা দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সে কোন যুগে কাঙ্গারু-জাতীয় জানোয়ারের আবাস ছিল। সেইরূপ নৃতত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনায়, যখনই আমরা কোথাও কোন প্রকার আত্মীয়তার সন্ধান পাই তখনই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সেই আত্মীয়তার সাক্ষী স্বরূপ একটা পারিবারিক জীবন সেখানে ছিলই ছিল। পুরাণো পরিবারপ্রথা, বিবাহপদ্ধতি বা যৌনসম্বন্ধ আবিষ্কারের পক্ষে আত্মীয়তা, কুটুম্ব-জ্ঞান বা সামাজিক সম্বন্ধ (এবং সেই সকল সম্বন্ধবাচক শব্দগুলা) বিশেষ সহায়।

ইরোকোআ সমাজে ভাই এবং বোন কোনো মতেই একই ছেলে মেয়ের বাপ মা বিবেচিত হইবে না। কিন্তু হাওয়াই সমাজে হইয়া থাকে। অবশ্য দুই সমাজেই যে কোনো ছেলে বা মেয়ের একাধিক বাপ এবং একাধিক মা দেখিতে পাই। এইরূপ বিচিত্র পারিবারিক গঠনের কথা সুধী-সমাজে পূর্ব্বে জানা ছিল না।

এতদিন পণ্ডিতেরা তিন প্রকার পরিবার গঠনের কথা জানিতেন। প্রথমতঃ, যে পরিবারে এক পুরুষের এক স্ত্রী; দ্বিতীয়তঃ, যে পরিবারে এক পুরুষের বহু স্ত্রী; এবং তৃতীয়তঃ, যে পরিবারে এক স্ত্রীর বহু স্বামী। কিন্তু সেনেকা এবং হাওয়াই নরনারীর পারিবারিক জীবন আবিষ্কৃত হইবা মাত্র বুঝা গেল যে, জগতে এমন যুগও গিয়াছে যখন একই সঙ্গে একপুরুষের বহু স্ত্রী এবং একই স্ত্রীর বহু স্বামী থাকিত। তাহা না হইলে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে বহু পুরুষকে বাপ এবং বহু স্ত্রীকে মা বলিবে কেন? অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা তখন সমাজের সাধারণ বা যৌথ

পুত্রকন্যা বিবেচিত হইত। সেই যৌথ জনকজননী বা যৌথ পুত্রকন্তা বা সমাজগত বিবাহপদ্ধতির যুগ হইতে ব্যক্তিগত এক-স্বামিত্বের বা এক-পতি পত্নীত্বের যুগ পর্য্যন্ত পৌছিতে মানব-সমাজ নানা প্রকার পারিবারিক গঠন পার হইয়া আসিয়াছে।

প্রচীনতম কালের ইতিহাস গড়িতে যাইয়া মর্গ্যান এবং অন্যান্ত পণ্ডিত শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে-"মান্ধাতার আমলে" স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্বন্ধে কোনো বাঁধাবাঁধি ছিল না; প্রত্যেক নারী যে কোন পুরুষের ভোগ্যা ছিল। আবার যে কোনো পুরুষকে যে কোনো নারী নিজের ভোগে আনিতে পারিত।

বাখোফেনের জননী বিধি

এই প্রাচীনতম বাধাহীন যৌথ সম্বন্ধের যুগ সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পণ্ডিত-সমাজে নানা প্রকার আজগুবি মত চলিয়া আসিতেছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বাখো-ফেন তাঁহার "মুট্টাররেষ্ট" (জননী-বিধি) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম এই সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞানপদ-বাচ্য মত প্রচারিত হইয়াছে।

বাখোফেন মানব জাতির পুরাণো রীতিনীতির ভিতর প্রাচীন-তম যৌন সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তগুলিকে তিনি অবশ্য একদম প্রাচীনতম অবস্থার সাক্ষীস্বরূপই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পর অন্যান্ত নৃতত্ত্ববিদেরা যে সকল অনু-সন্ধান চালাইয়াছেন তাহার ফলে আমরা আজকাল বলিতে পারি যে, বাখোফেনের সংগৃহীত দৃষ্টান্ত বা চিহ্নগুলা বাস্তবিক পক্ষে

প্রাচীনতম যুগের পরিচয় দেয় না। সেগুলা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পারিবারিক গঠনেরই সাক্ষী।

এমন কি এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক পারিবারিক জীবনটাও বাখোফেন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত যুগের বিবাহ পদ্ধতিকে "হেতোরে" প্রথা বলিয়াছেন। এই গ্রীক শব্দের যে অর্থ তাহার দ্বারা বাস্তবিকপক্ষে এক-স্বামী-ওয়ালা অথবা এক-পত্নীওয়ালা সমাজে প্রচলিত কোনো পুরুষের সঙ্গে কোনো কুমারীর যৌন সম্বন্ধ মাত্র বুঝায়। সাধারণ হিসাবে বেশ্যা সংশ্রবও "হেতোরে" প্রথারই অন্তর্গত। কিন্তু বাখোফেন যে সকল দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন সেগুলা এত আধুনিক সমাজের সাক্ষী হইতেই পারে না। যাহাহউক, বাখোফেন মানব জাতির ধর্ম্মকর্ম্মে এবং সামাজিক লেনদেনের ভিতর কতকগুলা অবাধ যৌন সংশ্রবের চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া লজ্জিত বোধ করেন নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই কারণে বাখোফেনের অনুসন্ধানগুলা মূল্যবান।

জানোআরদের যৌনজীবন

কিন্তু অন্যান্য নৃতত্ত্ববিদেরা মানব-সমাজের প্রাচীনতম কালের এইরূপ সর্ব্ববাধাহীন স্ত্রীপুরুষভোগের অবস্থা দেখিয়া লজ্জা বোধ করিয়াছেন। তাঁহারা এমন কি কথাগুলা স্বীকার এবং বিশ্বাস করিতে পর্য্যন্ত রাজী নন। ফরাসী পণ্ডিত লতুর্ণ্যো ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে "বিবাহ এবং পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে অবাধ যৌন-সংসর্গ নেহাৎ নিম্নতম শ্রেণীর পশু ছাড়া অন্য কোন জানোআরের জীবনে দেখা যায় না।

কথাটা অনেকাংশে ঠিক। কিন্তু জানোআরদের দৃষ্টান্ত হইতে মানুষের অতীত যুগ সম্বন্ধে কোনো মত প্রচার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এক পুরুষ-পাখী স্ত্রী-পাখীর সঙ্গে স্থির ভাবে "ঘর করে"। তাহার কারণ গর্ভাবস্থায় স্ত্রী-পাখী একদম অসহায়। এইরূপ শারীরিক কারণে শিরদাঁড়াওয়ালা জীবজন্তুগুলা যৌন সংসর্গ সম্বন্ধে অনেকটা বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পাখীর সমাজে এক-পতিত্ব বা এক-পত্নীত্ব রহিয়াছে বলিয়া মানুষের সমাজেও প্রাচীন কালে সেইরূপ ছিল এরূপ ভাবা চলিতে পারে না। মানুষ পাখীর সন্তান নয়।

এক-পত্নীত্ব বা এক-পতিত্ব যদি "পরম ধর্ম্ম" বিবেচিত হয় তাহা হইলে বিষ্ঠার পোকা জগতে অদ্বিতীয়। এই পোকা ৫০, ৬০, বা ২০০ টা গিঁটের সমষ্টি বিশেষ। প্রত্যেক গিঁটেই পুরুষ এবং স্ত্রী যোনি এক সঙ্গে বর্ত্তমান। প্রত্যেকটাই দিনরাত সন্তানের জন্ম দিয়া থাকে। এক পোকার সঙ্গে অন্য কোনো পোকার মেলামেশার দরকার হয় না। কাজেই বহু-পত্নীত্ব বা বহু-স্বামিত্ব ইত্যাদি 'পাপ কর্ম্ম" ইহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না।

কিন্তু স্তন্যপায়ী জানোআরদের সমাজে কি দেখি? যৌন সংসর্গের অশেষ রূপ। অবাধ ভোগ দেখা যায়। একটা দলের সঙ্গে আর একটা দলের যোগাযোগ দেখা যায়। একটা পুরুষের ভোগে বহু স্ত্রীকে দেখিতে পাই। অবশ্য একদম খাঁটি এক-
কটা স্ত্রীর ভোগে বহু পুরুষ বড় একটা দেখা যায় না। অর্থাৎ বহু-পতিত্ব প্রথাটা মানুষেরই খাস আবিষ্কার। তবে ইয়োরোপের স্ত্রী "কুকু" (কোকিল) গুলা একই

পরী ৫৩

ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন মরদের সঙ্গে বসবাস করে। কিন্তু "কুকু"দের এই প্রথাকে মানব-সমাজে প্রচলিত বহু-পতিত্বের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কেননা মানব-সমাজে একই বাড়ীতে একটা স্ত্রীর সঙ্গে বহু পুরুষ একত্র ঘর করে। পুরুষেরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধু ভাবেই মিলে মিশে। কিন্তু পুরুষ "কুকু"রা কোনমতে এক ঠাঁই হইলে কামড়াকামড়ি করিয়া মরে।

জানোয়ারদের ভিতর বানরগুলিই মানবজাতির নিকট আত্মীয়। এই বানর-সমাজেও অশেষ প্রকার যৌন সংসর্গের রীতি দেখা যায়। বানরদের ভিতরও আবার যেগুলা "অ্যান্থ্র-পয়েড" অর্থাৎ বিলকুল মানুষেরই মাসতুত ভাই স্বরূপ তাহাদের যৌন সংসর্গ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। লতুর্ণ্যো বলেন, এগুলির ভিতর বহু পত্নীত্ব প্রায়ই দেখা যায়। সোস্যিরের মতে ইহারা এক পত্নীক। "মানব-সমাজের বিবাহ পদ্ধতি" নামক গ্রন্থে (১৮৯০) ভেষ্টার মার্ক "অ্যান্থ্র পয়েড" সম্বন্ধে যে সকল তথ্য দিয়াছেন তাহার জোরেও একটা শেষ মীমাংসা করা কঠিন।

যূথ বনাম যোনি

লতুর্ণ্যো কাজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, স্তন্যপায়ী জীবের সমাজে মাথা বা বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে যৌন সংসর্গের কোনো সম্বন্ধ নাই। ফরাসী পণ্ডিত এস্পিনা তাঁহার "সোসিয়েতে জানিমাল" (পশু সমাজ) গ্রন্থে (১৮৭৭) খোলাখুলি বলিয়াছেন —"যূথ বা দলই জানোআরদের ভিতর চরম সমাজ-কেন্দ্র। যূথগুলা বোধ হয় কতকগুলা পরিবারের সমষ্টি। কিন্তু যূথের

সঙ্গে পরিবারের আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ। দুইয়ের ক্রমবিকাশের গতি উল্টা দিকে।"

এস্পিনার মতটা আরও বিশেদ্‌রূপ বিবৃত হইতেছে। ইনি বলেন—"পরিবার যদি দৃঢ় হয় তাহা হইলে যূথ শিথিল হইবে। কিন্তু পারিবারিক বন্ধন যেখানে নরম অর্থাৎ যেখানে যৌন সংসর্গ অবাধ চলিতে পারে সেখানে যূথ খুব প্রবল। যূথ গড়িয়া উঠিতে পারে কখন? যখন ব্যক্তিরা পরিবারের বন্ধন হইতে স্বতন্ত্রতা লাভ করে। এই কারণেই পাখীর সমাজে যূথ দেখা যায় না। কিন্তু স্তন্যপায়ী জানোআরদের ভিতর মাঝে মাঝে যূথ দেখিতে পাই। তাহার কারণ এই যে, ইহারা মাঝে মাঝে পরিবারের বাঁধাবাঁধি হইতে ছাড়া পায়। আসল কথা—দল বা যূথ গড়িয়া উঠিবার বিরুদ্ধে প্রধান বাধা পারিবারিক টান।"

এস্পিনার মত আরও তলাইয়া বুঝিলে জানোআরদের সামাজিক ক্রমবিকাশের শক্তিগুলা হাতে হাতে ধরা পড়ে; তিনি এই উপলক্ষ্যে আরও বলিয়াছেন :—"লজ্জা করিয়া দরকার নাই। বেশ স্পষ্টভাবে স্বীকার করা উচিত যে, পরিবারের চেয়ে উঁচু কোনো সমাজ-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে পারে কেবল তখন,—যখন পারিবারিক জীবনটাই অনেক বদলাইয়া যায়! পারিবারিক টান অটুট রহিয়াছে অথচ সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চতর দলগত জীবন-কেন্দ্র বেশ শক্তভাবেই গড়িয়া উঠিল এরূপ হইতে পারে না।"

জানোআরদের ভিতর দল এই জন্যই বড় বেশী স্থায়ী হয় না। পুরুষগুলা নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে অন্যান্য পুরুষের একতিয়ার সহিতে পারে না। কাজেই দল শীঘ্র শীঘ্র ভাঙিয়া যায়। অন্ততঃ পক্ষে যৌন সংসর্গের ঋতুতে দলের অস্তিত্ব লোপ পায়। তখন পুরুষেরা

নিজ নিজ স্ত্রী লইয়া "একলা ঘর" করে। পরস্পর হিংসা করা জানোআর-জীবনের বিশিষ্ট কথা।

প্রাচীন মানবের সঙ্ঘগঠন

প্রাচীন কালের মানব-সমাজকে জানোআরদের সমাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে কি? কোনো মতেই না। জানোআরের জীবনে পরিবারই আসল কথা, কিন্তু প্রাচীন মানবের জীবনে আসল কথা দল বা সমাজ বা সঙ্ঘ। তখনকার দিনে মানুষ নেহাৎ অসহায় অবস্থায় ছিল। জগতের অসংখ্য বিপজ্জনক শক্তিপুঞ্জ হইতে আত্মরক্ষা করা ছিল তাহার জীবনের প্রধান কাজ। এই অবস্থায় কোনো স্ত্রীর সঙ্গে "একলা ঘর করা" তাহার পক্ষে অসাধ্য এবং অসম্ভবই ছিল। নানা ব্যক্তি সমবেত-ভাবে জীবন-যাত্রার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হইলেই প্রাচীনকালে মানবের পক্ষে জীবন ধারণ সম্ভবপর হইত। অতএব জানোআর-সমাজের দৃষ্টান্তকে প্রাচীন মানব-সমাজের সাক্ষী বা জুড়িদার বিবেচনা না করিয়া ঠিক তাহার উল্টা বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য।

প্রাচীনকালে মানুষেরা এইরূপ বড় বড় দল গড়িতে পারিয়াছিল কি করিয়া? প্রধান কারণ এই যে, পুরুষেরা স্ত্রীভোগ সম্বন্ধে পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া মরিত না। স্ত্রী লইয়া হিংসা করিতে থাকিলে মানুষের যূথগুলা জানোআরদের যূথের মতনই দুর্ব্বল থাকিত; তাহা হইলে মানুষের সমাজে বহুকালব্যাপী দল কোনো মতেই তিষ্টিতে পারিত না। জানোআরদের যূথের মতন মানুষের সামাজিক কেন্দ্রগুলাও ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গিয়া যাইত।

কল্পনা, অনুমান বা জানোআরদের সঙ্গে তুলনা ছাড়িয়া দিয়া

খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভর করিলে বাস্তবিক পক্ষে মানব জাতির বিবাহপদ্ধতি সম্বন্ধে কি দেখিতে পাই? প্রাচীনতম কালের নরনারী "দলে দলে" বিবাহ করিতে অভ্যস্ত ছিল। এক সমাজ, গোষ্ঠী বা কেন্দ্রের সকল পুরুষের সঙ্গে অপর কোনো সমাজ, গোষ্ঠী বা কেন্দ্রের সকল স্ত্রীর বিবাহ হইত। অর্থাৎ ঐ দুই দলের যে কোনো পুরুষ যে কোনো নারীর স্বামী বিবেচিত হইতে পারিত। এই ব্যবস্থায় পুরুষে পুরুষে অথবা নারীতে নারীতে "পর-স্ত্রী" বা "পর-পুরুষ" লইয়া হিংসা এক প্রকার জন্মিতেই পারিত না। পরবর্ত্তীকালে বহু-পতিত্ব প্রথার পরিচয় পাই। এই ব্যবস্থায়ও পুরুষে পুরুষে হিংসার ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। কাজেই জানোআরের জীবনে এইরূপ বহু পুরুষের এক স্ত্রী-ভোগ দেখা যায় না।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণের জোরে যে সকল দলগত বিবাহ প্রথার বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে তাহার ভিতর অনেক সামাজিক জটিলতা এবং কিম্ভুতকিমাকার হ য ব র ল দেখা যায়। ইরোকোআ এবং হাওয়াই সমাজের বিচিত্র কুটুম্ব-জ্ঞান এবং বিবাহ-প্রথায় আর কুটুম্ব-জ্ঞানের অমিল দেখিয়া সেই সকল অদ্ভুত কাণ্ডের কিছু কিছু ধারণা করিতে পারি। তাহার ফলে স্বতঃই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় যে, এই সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম প্রথার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অপেক্ষাকৃত সরল যৌনসংসর্গের যুগ ছিল। সেই যুগকে "অবাধ বিবাহের কাল" বলা যাইতে পারে।

জানোআরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লতুর্ণ্যো আমাদিগকে অবাধ যৌনসংসর্গের বিপক্ষে প্রমাণ দিতেছিলেন। কিন্তু জানোআর

জীবনে হিংসা প্রবৃত্তির আলোচনা করিতে করিতে আমরা ঠিক-তাঁহার উল্টা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম। বুঝিতেছি "প্রাগৈতিহাসিক" যুগে যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো স্ত্রীকে ভোগ করিতে অভ্যস্ত ছিল।

অবাধ যোনিসংসর্গ

"অবাধ যোনিসংসর্গ" কাহাকে বলে? এক কথায়,—বর্ত্তমান মানবের সমাজে সুপরিচিত বাধাবিঘ্ন বা আপত্তিগুলা তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল না। হিংসা একটা মস্ত বাধা। প্রাচীনতর অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কালে হিংসা করিবার দিকে মানুষের খেয়াল বা সুযোগ ছিল না। হিংসা না করাই জীবনসংগ্রামের প্রধান অস্ত্র বিবেচিত হইত। হিংসা পরবর্ত্তী কালে মানব-সমাজে দেখা দিয়াছে। হিংসা বলিলে পর-স্ত্রী সম্বন্ধে লোভ এবং নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষ হইতে সাম্‌লাইয়া রাখা এই দুই মনোভাব বুঝিতে হইবে।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। আজকালকার দিনে ভাইয়ে বোনে, মায়ে বেটায় অথবা বাপে-মেয়েতে যৌনসংসর্গ প্রায় সর্ব্বত্রই মহাপাপ, অধর্ম্ম বা কুকর্ম্ম। কিন্তু তখনকার দিনে এই দিকেও কেনো বিধি নিষেধ ছিল না। ভাইয়ের পত্নী হইত বোন। বর্ত্তমান জগতেও কোনো কোনো সমাজে সন্তানসন্ততিরা জনকজননীর সঙ্গে যোনিসংসর্গ চালাইয়া থাকে। বেরিং প্রণালীর অধিবাসী কাম্বিয়াৎ, আলাস্কার কাদিয়াক, এবং কানাডার ভিন্নে জাতি এইরূপ বাপেমেয়ের এবং মায়েপোয়ের সংসর্গ মানিয়া চলে। এইরূপ সংসর্গ চিপ্পেওয়ে "ইণ্ডিয়ান", চিলি দেশের কুকু,

কারিবিয়ান জনপদের অধিবাসী এবং ইন্দোচীনের কারেন ইত্যাদি সমাজেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকন্তু প্রাচীন গ্রীক, রোমান, পার্থিয়ান, পারসীক, হূণ ইত্যাদি জাতীয় "পুরাণে" এই সংসর্গের গল্প অনেক আছে।

এই সংসর্গগুলাকে মানব জাতি অর্ব্বাচীন কালে পাপ বলিয়া "আবিষ্কার" করিয়াছে। কিন্তু এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে অথবা যে সমাজে এই আবিষ্কার সাধিত হয় নাই সেই সমাজের বিবাহ প্রথা বা পারিবারিক জীবনকে অবাধ যৌনসংসর্গের পদ্ধতি বলা হইতেছে। এইখানে আর একটুকু পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। যে-কোনো নারী যে-কোনো পুরুষের ভোগ্যা—এই সামাজিক ব্যবস্থায় সর্ব্বদাই একটা নিয়মবিহীন শৃঙ্খলাবিহীন যৌনসংসর্গের বিধান চলিতেছে এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। এই ব্যবস্থায়ও কিছুকালের জন্য এক এক জোড়া পুরুষ-স্ত্রী একত্র ঘর বা সহবাস করিতেছে এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ বর্ত্তমানকালে যেখানে যেখানে "দলে দলে বিবাহ" প্রথা দেখা গিয়াছে সেই স্থানেই বেশীরভাগ এইরূপ "জোড় পরিবার"ই নজরে পড়িয়াছে।

হ্বেষ্টারমার্ক তাঁহার "বিবাহ পদ্ধতির ইতিহাস" নামক গ্রন্থে জগতে কখনো অবাধ বিবাহ বা বাধাবিহীন যৌনসংসর্গের যুগ ছিল না এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে একমাত্র সেই সম্বন্ধকেই "বিবাহ" বলা যাইতে পারে যে ব্যবস্থায় পুরুষ এবং স্ত্রী অন্ততঃ প্রথম সন্তানের জন্ম পর্য্যন্ত একত্র বসবাস করে। কিন্তু "অবাধ যৌনসংসর্গ" বলিলে অথবা "দলে দলে বিবাহ" বলিলে যাহা বুঝায় তাহাতেও এইরূপ হ্বেষ্টারমার্ক-বিবৃত "বিবাহ" প্রচলিত থাকা অসম্ভব নয়।

অবাধ যৌন সংসর্গে মোটের উপর তিনপ্রকার সংসর্গ বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ; "জোড়" পরিবারে বসবাস। দ্বিতীয়তঃ, সন্তানের জন্ম হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ নারীর একত্র বসবাস। ইহা "জোড়" পরিবারেই অন্তর্গত। তৃতীয়তঃ, একদম উচ্ছৃঙ্খল সর্ব্ববাধাহীন বাধ্যবাধকতাহীন দায়িত্বশূন্য স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গ। সাধারণতঃ এই তৃতীয় অবস্থাকেই অবাধ যৌনসংসর্গের একমাত্র দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এইরূপ চিন্তা করা ভুল।

হ্বেষ্টারমার্ক বলেন,—সমাজের বিধিনিষেধের বহির্ভূত সকল প্রকার বাধ্যবাধকতাহীন উচ্ছৃঙ্খল যোনিসংসর্গকে বিবাহ বলা চলে না। এই ব্যবস্থায় নাকি কোনো ব্যক্তির চিত্ত স্বাভাবিকরূপে খেলিতে পারে না, বরং ইহার প্রভাবে ব্যক্তিগত মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি লুপ্ত হইবারই কথা। তাঁহার মতে, যে সমাজে বিধিনিষেধ নাই সেই সমাজ বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয়দাতা।

কিন্তু হ্বেষ্টারমার্কের এই মত গ্রহণীয় নয়। বেশ্যালয়ের আবহাওয়া মনে রাখিয়া প্রাচীন মানবের জীবনযাত্রা বুঝিতে অগ্রসর হওয়া অবিবেচকের কার্য্য। বর্ত্তমান মানব যাহাকে হিংসা বলে সে প্রবৃত্তি প্রাচীন মানবের ছিল না। বর্ত্তমান মানব যে সংসর্গকে 'ইন্‌সেষ্ট" নামক গর্হিত পাপ বিবেচনা করে, প্রাচীন মানবের চিন্তায় সেই ধারণা জন্মে নাই। বর্ত্তমান মানবের ধারণায় যাহা উচ্ছৃঙ্খল "লাইসেন্স" বিশেষ, যাহা কুনীতি, দুর্নীতি, ব্যভিচার বা বেশ্যাবৃত্তি মাত্র—প্রাচীন মানবের চোখে তাহা অন্যরূপ বিবেচিত হইত। এই সকল কথা মনে রাখিলেই "মান্ধাতার আমলের" সমাজ-ব্যবস্থা, রীতিনীতি, লেনদেন এবং পারিবারিক ভিত্তি বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাইয়ে বোনে বিবাহ (সমরক্তজদের যৌন সংশ্রব)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবাধ যোনিসংসর্গ ক্রমে লোপ পাইতে থাকে। এই ক্রমিক লোপ নানা আকারে দেখা দেয়। বিভিন্ন পারিবারিক প্রথার ভিতর যোনিসংসর্গের ভিন্ন বাধা বা বিধিনিষেধ প্রকটিত হয়।

মর্গ্যানের মতে সর্ব্বপ্রথম যে পারিবারিক প্রথা গড়িয়া উঠে তাহাকে "বংশগত" পরিবার বলা চলে। একজন পুরুষ একজন নারীকে বিবাহ করিল। ইহাদের পুত্রকন্যারা পরস্পর বিবাহ করিবে। তাহাদের পুত্রকন্যারা অর্থাৎ প্রথম পরিবারের পৌত্র পৌত্রীরাও পরস্পরে বিবাহ করিবে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে বংশের ভিতরই ভাই বোনের বিবাহ চলিতে থাকে। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে সন্তান সন্ততির বিবাহ নিষিদ্ধ। ঠাকুরদা ঠান্‌দির সঙ্গেও নাতি নাত্‌নিদের বিবাহ নিষিদ্ধ।

এই বিধিনিষেধের ব্যবস্থায় এক ভাইয়ের সঙ্গে মাত্র এক বোনের বিবাহ চলিতে পারে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না। বড়দা, ছোড়দা, মেজদা, খুড়তুত ভাই, জ্যাঠতুত ভাই, মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই, ইত্যাদি ভাই পর্য্যায়ের যে কোন পুরুষ ঐ ধরণের বোন পর্য্যায়ের কোনো স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারে। "বংশগত পারিবারিক প্রথার" আসল কথা ভাই-বোনের যোনিসংসর্গ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণ সঙ্গীতগুরু অপেরালেখক হ্বাগ্নার প্রাচীন স্কাণ্ডিনাহ্বিয় (টিউটনিক) "নিবেলুঙ" পুরাণ

অবলম্বন করিয়া শিল্প প্রসিদ্ধ গীত-নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচনায় ভাইয়ে বোনে প্রেমের কাহিনী বিবৃত রহিয়াছে। সমসাময়িক নীতিজ্ঞদের আওতায় হ্বাগ্নার একটা বিষম ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় দেখিতে পাই :—"ভাই বিবাহের যোগ্যা বোনকে স্ত্রীরূপে আলিঙ্গন করে, এই অদ্ভুত ঘটনা জগতে কেহ কখনো দেখিয়াছে শুনিয়াছে কি? হ্বাগ্নারের দেবদেবীরা "নবরুচিত" উচ্ছৃঙ্খল প্রেম-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছেন : বস্তুতঃ হ্বাগ্নার এইখানে প্রাচীন সমাজের রীতি-নীতি ভুল বুঝিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি নিবেলুঙ পুরাণাবলীর মর্ম্মটা ঠিক ধরিতে পারেন নাই।

১৮৮২ সালের প্রকাশিত সংস্করণে হ্বাগ্নারের ভুল দেখাইয়া মার্কস্ বলিয়াছেন :—"মান্ধাতার আমলে বোনই ছিল ভাইয়ের পত্নী। আর ইহাই ছিল তখনকার দিনের নীতিসঙ্গত বিধান।" হ্বাগ্নারের একজন ফরাসী সমালোচক মার্কের বিরুদ্ধে জানাইয়াছিল যে, "এগিসড্রেকা" নামক টিউটনিক পুরাণে লোকি ফ্র্যাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন :—'নির্লজ্জ বেহায়া তুই! দেবতাদের সম্মুখে তুই তোর ভাইকে আলিঙ্গন করিয়াছিস্!' তাঁহার মতে সেই পুরাণে ভাই-বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ। হ্বাগ্নার এই পুরাণের তথ্যই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে বাস্তবিক ঠিক উল্টা। এগিস্ড্রেকা পুরাণটা প্রাচীন বটে, কিন্তু সেটা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজের তুলনায় নেহাৎ নবীন। সেই প্রচীনতর সমাজে যে রীতি নীতিসঙ্গত ছিল তাহা এই নবীন পুরাণে নিন্দিত হইয়াছে। সেই সমাজটার নিয়ম বুঝিতে না পারিয়া হ্বাগ্নার গোলে পড়িয়াছেন।

"এগিস্‌ড্রেকা" পুরাণে আরও ভাই-বোনের বিবাহ কাহিনী আছে। "বন" দেশের দেবতারা ভাইয়ে বোনে বিবাহ দেয়। কিন্তু "অস" দেশের দেবতারা তাহার বিরোধী। কাজেই টিউটনিক পুরাকাহিনীর যে চিত্র "এগিস্‌ড্রেকা"তে পাওয়া যায় তাহাতে যে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্ব চলিতেছে বুঝিতে হইবে।

হ্বাগ্নারের মতন ভুল মহাকবি গোটেও করিয়াছিলেন। গোটে তাঁহার "বায়াডের" নামক কাব্যে "দেবদাসী" প্রথাটী আধুনিক চোখে দেখাইয়াছেন। প্রাচীন সমাজে নারীর সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি "বায়াডেরেকে" প্রায় বেশ্যায় পরিণত করিয়াছন।

ভাই-বোনের যোনি-সংসর্গ জগতে আর দেখা যায় না। বংশগত বিবাহ বা সমরক্তজ যৌনসংশ্রব একদম লুপ্ত হইয়াছে। নেহাৎ আদিম অবস্থার জনসমাজেও এই প্রথার অস্তিত্ব নাই। তবে সমগ্র পলিনেশিয়ায়, হাওয়াই সমাজের আত্মীয়জ্ঞান, কুটুম্বিতা ইত্যাদি আজও যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা চলে যে, কোন না কোন দিন সেই প্রথা এই সমাজে প্রচলিত ছিল। এই ধরণের বংশগত বিবাহ প্রথা পার হইয়াই প্রাচীনতম অবাধ যোনিসংসর্গের নিয়ম পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য প্রথার রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুনালুয়া পরিবার

বংশগত বিবাহের প্রথায় বাপমার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ। অবাধ বিবাহে এই প্রথম বাধা। ভাইয়ে বোনে সংসর্গ নিষেধ বিবাহের ইতিহাসে দ্বিতীয় বাধা।

কিন্তু এই নিষেধ জারি হইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। ভাই বোনদের বয়স সাধারণতঃ প্রায় সমান। কাজেই সংসর্গের ঝোঁক অতি সহজ ও স্বাভাবিক।

অবাধ বিবাহে বাধা

প্রথমেই মায়ের পেটের বোনের সঙ্গে সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে। প্রথমে মাত্র দুএক পরিবারে এই বাধা স্পষ্ট হয়, ক্রমশঃ বাধাটা সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছিল বিবেচনা করা চলিতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পর্য্যটকেরাও হাওয়াই সমাজে কয়েক স্থলে ভাই বোনের বিবাহ লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা হউক একে একে খুড়তুত, মাসতুত ইত্যাদি অন্যান্য ভাই পর্য্যায়ের পুরুষের সঙ্গে সেই শ্রেণীর কন্যার যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

মর্গ্যান বলেন:—"ভাই বোনের যোনিসংসর্গ বন্ধ করিয়া মানবজাতি প্রকৃতিকে নির্ব্বাচনের কর্ম্মক্ষেত্রে—অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে বিজয় লাভের এক বড় অস্ত্র কায়েম করিয়াছিল।" যে সকল জাতি এই নিষেধ মানিত তাহারা অবাধ বিবাহশীল জাতিগুলাকে ছাড়াইয়া—এমন কি জোড় পরিবারওলা সমাজকেও পেছনে ফেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল।

এই নিষেধই পরবর্ত্তী কালে "গেন্‌স্," "গেনোস" বা গোষ্ঠী প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে; জগতের সকল "বার্ব্বার" সমাজে গোষ্ঠীর্ প্রচলন দেখিতে পাই। প্রাচীন গ্রীস এবং রোম গোষ্ঠীর স্তর ছাড়াইয়া উৎকর্ষের যুগ প্রথম সুরু করে।

মান্ধাতার আমলে পরিবারগুলা চিরকাল এক অখণ্ড যৌথ সমষ্টি রূপে টিকিতে পারে নাই। কয়েক পুরুষের ভিতরই ভাগাভাগি সুরু হইয়াছিল। "বর্ব্বার" যুগের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যৌথ সমবেত পরিবারজীবন চলিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও পরিবার বৃদ্ধির একটা সীমানা ছিল। বৃহত্তম পরিবারগুলাও একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইত না। কমসেকম খাওয়াপরার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনেই পারিবারিক আয়তনের সীমারেখা টানা হইয়া পড়িত।

ক্রমশঃ যোনিসংসর্গে বিধিনিষেধ দেখা দিল। "শীল" জ্ঞান সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। মায়ের পেটের ভাই বোনদের ভাগাভাগি হওয়া, আলাদা আলাদা থাকা, সুনীতির অঙ্গ বিবেচিত হইল। খাওয়াপরার, ভাগবাটোআরার সঙ্গে ভাই-বোনদের পৃথক্-করণ পারিবারিক ও সমাজিক জীবনে একদম নতুন ধরণধারণ সৃষ্টি করিল।

ভাইয়েরা কতকগুলা স্বতন্ত্র পরিবারের এবং ক্রমশঃ বংশের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অপর দিকে বোনেরাও ঠিক এইরূপ কতকগুলা স্বতন্ত্র বংশের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মর্গ্যান এক প্রকার পারিবারিক জীবনকে "পুনালুয়ান" প্রথা রূপে বিবৃত করিয়াছেন। সেই প্রথা ভাইবোনের ভাগাভাগি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বংশগত পরিবার "পুনালুয়ান"

পরিবারের জনক। "পুনালুয়া" শব্দের অর্থ "নিকট আত্মীয়" বা "ঘনিষ্ট সহচর"।

হাওয়াই সমাজে বোন পর্য্যায়ের সকল নারী (নিজের মায়ের পেটের ভাই ছাড়া এবং নিজের জনক পর্য্যায় ছাড়া) সকল পুরুষকে বিবাহ করে। ইহারা সকলেই এই স্বামিগণের যৌথ পত্নী। এই স্বামীরা পরস্পরকে ভাই বলিয়া ডাকে না। "পুনালুয়া" বা নিকট আত্মীয় এই শব্দ ব্যবহার করিয়া ইহারা পরস্পরে সম্বন্ধ বুঝিয়া থাকে।

সেইরূপ ভাই পর্য্যায়ের পুরুষেরাও (নিজের মায়ের পেটের বোন ছাড়া এবং নিজের জননী পর্য্যায় ছাড়া) সকল নারীকে বিবাহ করে। ইহারা সকলেই এই পত্নীগণের যৌথস্বামী। পরস্পরের ভিতর সংসর্গ অবাধ। পত্নীরা পরস্পরকে বোন বলিয়া ডাকে না,—ডাকে "পুনালুয়া" বা নিকট আত্মীয় বলিয়া।

এই পুনালুয়া পরিবার কালে অন্যান্য রূপ গ্রহণ করে। আপন ভাই বোনে বিবাহ নিষেধ করিয়া মানবজাতি এই প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই সমাজের পরিবারেরা যৌথ, অর্থাৎ যে কোনো পুরুষ যে কোনো স্ত্রীর স্বামী। এই হিসাবে অবাধ যোনিসংসর্গ বিশেষ প্রবল।

ইরোকোআদের "সেকাল"

আমেরিকার ইরোকোআ সমাজে যে ধরণের কুটুম্ব-জ্ঞান বা আত্মীয়তার পরিচয় পাই তাহার সঙ্গে "পুনালুয়া" পরিবারের যোনিসংসর্গ খাপ খায়।

ইরোকোআ নারী তাহার বোনের ছেলেপুলেকে নিজের

ছেলেপুলে বলিয়া ডাকে। পুরুষ তাহার ভাইয়ের ছেলেপুলেকে নিজের ছেলেপুলে বলিয়া ডাকে। আর দুই দিককার ছেলেপুলেরা পরস্পর ভাইবোন। কিন্তু ইরোকোআ নারী তাহার ভাইয়ের ছেলেপুলেকে ভাইপো ভাইঝি বলিয়া ডাকে। পুরুষও তাহার বোনের ছেলেপুলেকে ভাগ্নে ভাগ্নী বলিয়া ডাকে। আর এই ছেলেপুলেরা পরস্পর মামাত পিসতুত ভাই বোন।

মায়ের পেটের ভাইয়ে বোনে বিবাহ নিষেধই এইরূপ কুটুম্ব-জ্ঞানের গোড়ার কথা। নারীরা তাহাদের বোন পর্য্যায়ের যে কোনো নারীর স্বামীকে স্বামী বলিয়া জানে। পুরুষেরাও সেইরূপ তাহাদের ভাই পর্য্যায়ের যে কোনো পুরুষের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী বলিয়া জানে। ইরোকোআ সমাজে ইহাই আইন। তবে অনেক সময়ে হয়ত এইরূপ যৌথপতিত্ব বা যৌথপত্নীত্ব কার্য্যতঃ দেখা যায় না।

কিন্তু ভাইবোনে সংসর্গ নিষিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বে যাহারা মামুলি ভাই বোন বলিয়া পরিচিত ছিল এখন তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, খাঁটি ভাইবোনের দল। দ্বিতীয়তঃ, ভাইপো ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নীর দল। ইহারা এখন আর ভাই বোন নয়। ইহাদের বাপমাও আর যৌথ বাপ মা নয়। কিন্তু পুরাণো আমলে ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নী নামক কুটুম্ব মানুষের বিবেচনায় ঠাঁই পাইতেই পারিত না।

ইরোকোআ সমাজে একপত্নীত্ব প্রথায় পরিবার চলিতেছে অথচ ইহার কুটুম্ব-জ্ঞানের সঙ্গে এক পত্নীত্বের কোনো সম্বন্ধ নাই। "পুনালুয়া" প্রথার পরিবার জগতে না থাকিলে ইরোকোআদের কুটুম্ব-জ্ঞান সংসারে দেখা দিত না। জগতের যেখানে যেখানে

এই কুটুম্ব-জ্ঞান প্রচলিত আছে সেই খানেই পুনালুয়া পরিবারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

হাওয়াই সমাজে পুনালুয়া প্রথার পারিবারিক জীবন দেখা গিয়াছে। খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের চোখে অবশ্য ইহা এক অতি বীভৎস দুর্নীতি বিশেষ। এমন কি জার্ম্মাণ পণ্ডিত বাখোফেনও যেখানে যেখানে অবাধ যোনিসংসর্গের চিহ্ন মাত্র দেখিয়াছেন সেই খানেই "ইন্‌সেষ্ট" নামক পাপের উল্লেখ করিয়াছেন। কার্লমার্কস বলেন ঃ—"পুনালুয়া" প্রথার বিবাহকে যদি আজকাল-কার 'সভ্য' লোকেরা দুর্নীতির পাপ বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হন তাহা হইলে পুনালুয়া পরিবারে অভ্যস্ত লোকেরাও বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমাজে প্রচলিত বহু বিবাহকে জঘন্য 'ইনসেষ্ট' বিবেচনা করিতে অধিকারী। কেননা মায়ের বা বাপের দিকের নিকট মাসতুত, মামাত, খুড়তুত, পিসতুত ভাই বোনের মধ্যে খৃষ্টিয়ান সমাজে বিবাহ কম চলে না।"

রোমান সেনাপতি সীজার সমসাময়িক বৃটন জাতির বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। বৃটনরা তখন "বার্ব্বার" যুগের মাঝামাঝি ছিল। দশ বার জন নারী যৌথ ভাবে পুরুষগণের ভোগ্যা বিবেচিত হইত। পুরুষগণের মধ্যে "ভাই" পর্য্যায়ের লোক থাকিত। "বাপ মা এবং ছেলে পুলে"ও এইরূপ অবাধ যোনিসংসর্গশীল সমাজের অন্তর্গত ছিল।

সীজার বিবৃত বৃটনদের "ভাই" শব্দে কি বুঝিতে হইবে? সকলেই আপন মায়ের পেটের ভাই কখন নয়,—কারণ "বার্ব্বার" রমণীর আট দশ ছেলে একসঙ্গে একাধিক নারী ভোগ করিবার উপযুক্ত বয়স পায় না। বরং ইরোকোআ কুটুম্ব-জ্ঞানের মাফিক

পুনালুয়া পরিবারের "ভাইয়ের" অনেকে একসঙ্গে এইরূপ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। কারণ এই প্রথায় পুরুষের পক্ষে মামাত পিসতুত ভাইয়েরা সকলেই ভাই। সীজারের সময় বৃটিশ জাতি পুনালুয়ান স্তরেই বসবাস করিতেছিল অনুমান করিতে হইবে।

সীজারের আর একটা কথা লইয়া গোল বাধিতে পারে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে তখন "বাপ মারা ছেলেপুলে" দের সঙ্গে অবাধযোনিসংসর্গ করিতে অভ্যস্ত ছিল। হয়ত সীজার সামাজিক অবস্থাটা ঠিক ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু একথাও ঠিক যে "পুনালুয়া" প্রথায় বাপ এবং ছেলে এই দুই পর্য্যায়ের পুরুষেরা একই নারীর যৌথ স্বামী হইতে পারে। সেই-রূপ মা এবং মেয়ে এই দুই পর্য্যায়ের নারীরাও একই পুরুষের ভোগ্যা হইতে পারে। পুনালুয়া প্রথায় নিষিদ্ধ কেবল বাপে মেয়েতে আর মায়ে পোয়ে সংসর্গ।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস "স্যাভেজ" এবং "বার্ব্বার" সমাজের বৃত্তান্তে যৌথপত্নীত্বের বিবরণ দিয়াছেন। এই যৌথপত্নীত্ব সীজারের সময়কার বিলাতী অবাধযোনি সংসর্গের মতন পুনালুয়া শ্রেণীর কোনো না কোনো দলগত বিবাহেরই নিদর্শন। ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের টিকুর জাতি সম্বন্ধে হ্বাট্-সন্ এবং কে এই ধরণের কাহিনীও প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের বিবরণে প্রকাশ যে "টিকুরেরা যোনি সংসর্গ বিষয়ে বাদ বিচার করে কম। এক জোড়া পুরুষ নারী কখনো কখনো বিবাহিত বলিয়া প্রচারিত হয় বটে,—কিন্তু বিবাহের টান নেহাৎ নরম।"

গোষ্ঠী প্রথার উৎপত্তি

বোধ হয় পুনালুয়া পরিবারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে "গেনস্" বা গোষ্ঠী প্রথার জনক। তবে অষ্ট্রেলিয়ায় এক প্রকার পারিবারিক প্রথা দেখা গিয়াছে,—যাহাকে পুনালুয়ার অনুরূপ বিবেচনা করা যায় না,—অথচ সেই সমাজেও গোষ্ঠী দেখিতে পাই। কাজেই গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক সূত্র ঢুঁড়িতে হইবে।

প্রত্যেক দলগত বিবাহেই সন্তানের বাপ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু মা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। দলের সকলে ছেলেপুলেই তাহার চিন্তায় সন্তান বটে। কিন্তু আপন ছেলেপুলেকে সে বিশেষরূপেই চিনে; কাজেই যেখানে যেখানে দলে দলে বিবাহ চলে সেখানে বংশানুক্রম একমাত্র মায়ের তরফ হইতে সম্ভব। "স্যাহেবজ" এবং "বার্ব্বার" সমাজের নিম্নতম স্তরে এই ধরণের বংশানুক্রম দেখা যায়। বাখোফেন এই তথ্যটা সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা তাঁহার এক আবিষ্কার বিশেষ। তাঁহার পরিভাষায় মায়ের জোরে বংশ পরম্পরা আর পুরুষানুক্রম ও কুটুম্ব-জ্ঞান "মাতৃবিধির" অধীন অবশ্য। মাতৃবিধি বলিলে জননীর যেরূপ আইনসঙ্গত এক্তিয়ার স্বতই মনে আসে "স্যাহেবজ" বা "বার্ব্বার" যুগে তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব "আইনে"র কথা না তুলিয়া সাধারণ হিসাবে জননী বিধি শব্দ ব্যবহার করা যাউক।

পুনালুয়া রীতির সমাজ-বন্ধনের একটা চিত্র দেওয়া যাইতেছে। এক নারীর কতকগুলা কন্যা হইল। তাহাদের আবার কন্যা জন্মিল। এই কন্যারা আবার অন্যান্য কন্যাদের

জননী হইল। এইরূপে কন্যার পর কন্যারা, অর্থাৎ দৌহি প্রদৌহিত্রী ইত্যাদি সকলেই পরস্পর বোন বিশেষ। কিন্তু এই সব কন্যার পাল বিবাহ করিবে কাহাদিগকে? নিজ নিজ মায়ের পেটের ভাইয়েরা ইহাদের স্বামী হইতে পারিবে না। এই পর্য্যন্ত স্থির। কিন্তু ভাইয়েরা পুনালুয়া সমাজ-বন্ধনের অন্তর্গত লোকই বটে। সেই আদি নারীর রক্তের জোরে কন্যা, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী ইত্যাদি মেয়েরা এবং প্রত্যেক পুরুষের ভাইয়েরা সকলে মিলিয়া একটা সমাজ-গণ্ডী তৈয়ার করে। সেই সমাজ গণ্ডীই "গেন্স" বা গোষ্ঠী।

এই গেন্স বা গোষ্ঠীর জন্য যতগুলা স্বামী দরকার তাহারা আসে অন্যান্য নারী সম্ভূত গেন্স বা গোষ্ঠীর সমাজ হইতে। আর এই গেন্সের "ভাই"গুলা অন্যান্য নারী সম্ভূত গেন্সের নারীদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকে। আসল কথা,—কোনো আদি নারীর রক্ত যদি কোন পুরুষ ও স্ত্রীর ভিতর থাকে,—সে রক্তের পরিমাণ কমই হউক বা বেশীই হউক,—তাহাদের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ। এই ধরণের নিষেধের উপর ভর করিয়া যে সমাজ-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে তাহাকে অন্যান্য যথা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আরও শক্ত ও পৃথক করিয়া তোলা হয়।

গোষ্ঠীর উৎপত্তি পুনালুয়া পরিবারের এক অনিবার্য্য ক্রম-বিকাশের ফল। জগতের যেখানে যেখানে গোষ্ঠী প্রথা দেখা যায় সেইখানেই পুনালুয়া পরিবারের অস্তিত্ব অনুমান করা যুক্তি-সঙ্গত। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রায় সকল "বার্ব্বার" এবং "উৎকর্ষশীল" সমাজেই "পুনালুয়া" প্রথার বিবাহপদ্ধতির যুগ ঘটিয়া গিয়াছে।

মর্গ্যান যখন তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন তখন দুনিয়ার দলগ

বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে নৃতত্ত্বসেবীদের ভিতর জ্ঞান নেহাৎ কম ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার দলগত বিবাহ পদ্ধতি অতি অল্পই পরিচিত ছিল। হাওয়াই সমাজের বিবাহতথ্যগুলা হইতে মর্গ্যান আমেরিকার কুটুম্ব-জ্ঞান বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই তথ্যরাশিই মাতৃ-বিধি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়া দেয়। অধিকন্তু অষ্ট্রেলিয়ার বিবাহ প্রথা হইতে হাওয়াইয়ের প্রথা যে উচ্চ স্তরে অবস্থিত এই ধারণাও পণ্ডিতমহলে জন্মিতে পারিয়াছিল।

কাজেই "পুনালুয়া" প্রথাকে মর্গ্যান পরবর্ত্তী কালের জোড় পরিবারের পথ প্রদর্শক বিবেচনা করিতে থাকেন। তাঁহার মতে জগতের প্রায় সকল স্থানেই পুনালুয়া বিবাহ কমবেশী দেখা গিয়াছে। কিন্তু মর্গ্যান এই বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ছিলেন। কারণ অন্যান্য অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, জগতে অন্যান্য ধরণের দলগত বিবাহও প্রচলিত ছিল এবং আছে। কিন্তু "পুনালুয়া" প্রথা যে দলগত বিবাহের এক চরমতম পরিণতি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া মর্গ্যান নৃতত্ত্বের আলোচনায় রাজপথ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই

অষ্ট্রেলিয়ায় বিবাহের "দল"

ইংরেজ পাদ্রী লরিমার ফিজন অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত দলগত বিবাহ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান চালাইয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণা সমূহই দলগত পরিবার সম্বন্ধে নৃতত্ত্বের বড় খুঁটা বিশেষ।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় মাউণ্ট গাম্বিয়ার পাহাড়ের অধিবাসী পাপুয়ান জাতি দুই দলে বিভক্ত। একটার নাম ক্রোকি, অপরের নাম কুমিতে। প্রত্যেক দলের ভিতরই আপোষে

যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ। কিন্তু এক দলের পুরুষেরা অপর দলের স্ত্রীদের স্বামী এবং দ্বিতীয় দলের পুরুষেরা প্রথম দলের স্ত্রীদের স্বামী। বিবাহ হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, দলে দলে। বয়সের বাদ বিচার নাই।

যে কোন ক্রোকি যে কোন কুমিতে নারীকে পত্নী বিবেচনা করে। এই বিবাহে যে কন্যা জন্মে সে মাতৃরক্তের জোরে কুমিতে দলের লোক। কাজেই ক্রোকি দলের যে কোন পুরুষই এই কন্যার স্বামী। অর্থাৎ তাহার জনকও ইহাকে পত্নী বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

বুঝিতে হইবে যে, এই প্রথায় বাপে-মেয়েতে যোনি সংসর্গ "ইনসেষ্ট" নামে দূষণীয় নয়। প্রথাটা একদম আদিম অবাধ-যোনিসংসর্গের যুগ হইতেই সটান সোজা নামিয়া আসিয়াছে এইরূপ অনুমান করা চলে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার পাপুয়ান সমাজে বাপে-মেয়েতে যোনি সংসর্গের কথা শুনা যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, এই সংসর্গ কার্য্যতঃ নিষিদ্ধই বটে। তাহা হইলে প্রথাটাকে আদিম অবাধযোনিসংসর্গের কাছাকাছি বিবেচনা না করিয়া অনেকটা "আধুনিক,"—বংশগত পরিবারের লাগাও এক পদ্ধতি বিবেচনা করাই যুক্তিসংগত। বস্তুতঃ অষ্ট্রেলিয়ার বিবাহ প্রথা বংশগত পদ্ধতিও পার হইয়া আসিয়াছে এইরূপই বুঝিতে হইবে।

দুই দলে বিভক্ত বৈবাহিক লেনদেন প্রথা অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য জনপদেও প্রচলিত। পূর্ব্ব অঞ্চলে,—ডার্লিং দরিয়ার উপকূলে এবং কুইন্স্ল্যাণ্ডের উত্তরপূর্ব্ব জনপদেও গাম্বিয়ার

পাহাড়ের বিবাহ পদ্ধতি দেখা যায়। এক কথায় প্রথাটাকে বেশ সুবিস্তৃত বিবেচনা করা চলে।

এই প্রথায় ভাইয়ে-বোনে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু বোনের ছেলেপুলেরা ভাইয়ের ছেলেপুলেদিগকে বিবাহ করে। অর্থাৎ মামাত পিসতুত ভাইবোনে বিবাহ চলে।

নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশে ডালিং দরিয়ার অধিবাসী কামিলারয় জাতি চার দলে বিভক্ত। ইহাদের দলগত বিবাহ জটিলতর। প্রত্যেক দলের সঙ্গে অপর এক দলের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দুই দল পরস্পর স্বামী ও স্ত্রী। ইহাদের পুত্রকন্যারা আর সেই দুই দলের অন্তর্গত বিবেচিত হয় না। ইহারা নতুন নতুন দলের সামিল। তৃতীয় ও চতুর্থ দল এইরূপে উৎপন্ন হয়।

এই যে নতুন দুই দল—তৃতীয় ও চতুর্থ,—ইহারাও প্রথম দুই দলের মতনই পরস্পর স্বামী স্ত্রী জোগাইয়া থাকে। ইহাদের সন্তানসন্ততিরা আবার এই দল দুইটার সামিল বিবেচিত হয় না। তাহাদিগকে প্রথম ও দ্বিতীয় দলের লোক রূপে গণ্য করা হয়।

এক পুরুষ প্রথম ও দ্বিতীয় দলের স্তর গড়িয়া তুলে। তৃতীয় ও চতুর্থ দলের স্তর দ্বিতীয় পুরুষের দরুণ গড়িয়া উঠে। তৃতীয় পুরুষ আবার প্রথম ও দ্বিতীয় দলেরই লোক। ফলতঃ, ভাইয়ে বোনের ছেলেমেয়েদের ভিতর বিবাহ ঘটে না, কিন্তু তাহাদের পুত্রপৌত্রীদের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ নয়।

অষ্ট্রেলিয়ার দলগত বিবাহ পদ্ধতিকে কোনো মতেই উচ্ছৃঙ্খল বেশ্যা সমাজে প্রচলিত যোনিসংসর্গের রীতি বিবেচনা করা

চলে না। সাধারণ চোখে প্রথাটাকে অনেকটা এক পত্নীত্ব অথবা বহুপত্নীত্বের মতনই মনে হইবে! বস্তুতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় পর্য্যটকেরা অষ্ট্রেলিয়ান প্রথায় একটা নতুন কিছু সন্দেহই করিতে পারে নাই। অনেক বৎসর বসবাস করিবার পর ফিজন এবং হাউয়িট পাপুয়ানদের বিবাহ পদ্ধতির সূত্র অবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সূত্রগুলা বেশ নিয়মবদ্ধ এবং নিরেট। যখন তখন যেখানে সেখানে যে কোনো পুরুষ, যে কোনো নারীকে ভোগ করিতে অধিকারী নয়। বিধিনিষেধ পূরা দস্তুরই বর্ত্তমান। হাজার হাজার মাইল হাঁটিতে হাঁটিতে পাপুয়ান এমন এক দেশে আসিয়া হাজির হয় যেখানকার ভাষা সে বুঝে না। কিন্তু দলের বিধান অনুসারে সেই সমাজেও তাহার পত্নী হইবার যোগ্য মেয়ে জোটে। সেইরূপ কোনো ব্যক্তি হয়ত একাধিক নারী লইয়া ঘর করিতেছে। অর্থাৎ কোনো সময়ে এমন এক অতিথি আসিয়া জুটে যে, সে দলের নিয়মে তাহার পত্নীকে অভ্যাগতের পত্নী বিবেচনা করিতে বাধ্য।

বস্তুতঃ ইয়োরোপীয়েরা যেখানে মামুলি চোখে দুর্নীতি মাত্র লক্ষ্য করিতেছে সেখানে প্রকৃত পক্ষে চরম নীতি সঙ্গত ধর্ম্মই প্রতিপালিত হইতেছে। এক দলের নারীরা সকলেই যখন অতিথির পত্নী হইবার যোগ্য তখন অতিথি তাহাদিগকে ন্যায়তঃ ভোগ করিতে অধিকারী। কিন্তু যে দুই দলে যোনিসংসগ নিষিদ্ধ সেই দুই দলের কোনো পুরুষ স্ত্রী কোনো মতেই একসঙ্গে রাত্রি যাপন করিতে পারে না। কোনো কোনো প্রদেশে মেয়ে চুরি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও দলের বিধান প্রতিপালিত হয়।

মেয়ে চুরি কাণ্ডে এক পত্নীত্বের বীজই দেখিতে পাই। কমসেকম জোড়-পরিবারের একপত্নীত্ব লক্ষ্য করিতে পারি। কয়েক জন ইয়ারে মিলিয়া এক নারীকে হরণ করিয়া আনে। ইহারা পরস্পর এই স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে। কিন্তু অবশেষে যে যুবার পরামর্শে মেয়ে-চুরি সাধিত হইয়াছিল সে এই স্ত্রীর একমাত্র স্বামী বিবেচিত হয়।

কিন্তু এইরূপে চুরি করা মেয়ে যদি স্বামীর হাত হইতে পলাইয়া যায় তাহা হইলে প্রথমে যে তাহাকে পাকড়াও করে সে তাহার স্বামী হয়। প্রথম স্বামীর আর কোনো এক্তিয়ার থাকে না।

দলগত বিবাহের মধ্যে এইরূপে কমবেশী ব্যক্তিগত বন্ধনের নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। অল্পবিস্তর জোড় পরিবারের প্রথা গড়িয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া বহুপত্নীত্বের বিধানও দেখা দেয়। ক্রমশঃ দলের নিয়ম কানুন শিথিল হইতে থাকে। কিন্তু ইয়োরোপীয় আইনের অত্যাচারে দলগত বিবাহ লোপ পাইবে কি? গোটা পাপুয়ান জাতিই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে কে বলিতে পারে?

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত দলগত বিবাহের যে রূপ দেখা যাইতেছে তাহা হাওয়াই প্রসিদ্ধ "পুনালুয়া" প্রথার দলগত বিবাহ হইতে অনেক নিম্ন স্তরের সমাজচিত্র প্রদর্শন করে। অষ্ট্রেলিয়ান প্রথায় অনেকাংশ বিচরণশীল বাস্তুভিটাহীন "ভ্যাগ্বেজদের" লেনদেনই চোখে পড়ে। কিন্তু হাওয়াই প্রথায় সমাজ বেশ একটু স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়া যৌথ ধনদৌলতের ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে বোধ হইবে। এই দুই প্রথার ভিতর মাঝামাঝি স্তর অনেকই

গিয়াছে। কিন্তু মানবজাতির বিবাহ সম্বন্ধের ইতিহাস লইয়া পণ্ডিত মহলে এখনো গভীরতর অনুসন্ধান সুরু হয় নাই।

মর্গ্যানের ভুল

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়া ছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯১ সালে বাহির হয় চতুর্থ সংস্করণ। ইহার তিন বৎসর পরে আর একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত হাইনরিখ কুনে, "ডিফার হ্বাণ্ড্‌শাফ্‌টসর্গানিজাট সিওনেন জর আউষ্ট্রেলিনেগার" (অষ্ট্রেলিয়ান নিগ্রোদের কুটুম্ব সম্বন্ধ) বিষয়ে এক সুবিস্তৃত গ্রন্থ প্রচলন করেন। এঙ্গেল্‌স মর্গ্যান এবং ফিজন এই দুইজনের নিকট ঋণী ছিলেন। কুনোর মতে এই দুইজনের সকল কথা সর্ব্বথা গ্রহনীয় নয়।

কুনো বলেন :—"মর্গ্যান এবং ফিজন বিবাহের দলগুলাকে পুনালুয়া পরিবার হইতে প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করেন; কিন্তু এইরূপ বিবেচনা করিবার কোনো কারণ নাই। গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দলগুলা প্রচলিত ছিল একথা সত্য; বস্তুতঃ মর্গ্যান যে প্রাচীন সমাজকে 'বংশগত বিবাহ' বা ভাইয়ে বোনে বিবাহের সৃষ্টি স্বরূপ জ্ঞান করেন দলগুলা সেই সমাজেরই খানিকটা সমসাময়িক। কিন্তু কামিলারয়, কাবি, য়ুইপেরা ইত্যাদি জাতির ভিতর যে ধরণের বিবাহের দল দেখা যায় সেগুলা অত পুরাণো নয়। এই দলসমূহ পরবর্ত্তী কালে গড়িয়া উঠিয়াছে। সে কাল পুনালুয়া স্তরের অনেক পরের কথা; তখন স্থানে স্থানে গোষ্ঠী প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে।"

কুনোর মতে বিবাহের অষ্ট্রেলিয়ান দলপ্রথা সমাজ গঠনের

প্রাচীনতম নিদর্শন নয়। খাঁটি গোষ্ঠী প্রথা ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে আধাআধি গোষ্ঠীর যুগ একটা ছিল। সেই আধাআধি গোষ্ঠীর সমসাময়িক রূপেই এই দলগুলাকে গ্রহণ করতে হইবে। অর্থাৎ তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বংশগত পরিবার বা ভাইয়ে বোনে বিবাহ আধাআধি গোষ্ঠী এবং অষ্ট্রেলিয়ান দল বিবাহ,—এই তিন প্রথা যুগপৎ চলিতেছিল।

আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। কুনো বলেন :— অষ্ট্রেলিয়ায় একসঙ্গে নানা স্তরের পারিবারিক গঠন অর্থাৎ বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত। নিম্নতম স্তরের লোকেরা নিজ দলের ভিতর বিবাহ করে। মাঝামাঝি স্তরের দলে নিজের ভিতর বিবাহ চলে না। এই দলের লোকেরা বাহিরের এক দলের সঙ্গে বিবাহ পাতাইতে বাধ্য। কিন্তু উচ্চতম স্তরে যে দল অবস্থিত তাহার বিবাহ প্রথা আবার নিম্নতম স্তরের অনুরূপ।"

উচ্চতম এবং নিম্নতম স্তরে এই বিষয়ে বাহ্যতঃ একটা ঐক্য দেখা যায় সত্য। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে এই দুইয়ে প্রভেদ আছে। কারণ নিম্নতম স্তরে নিজ দলের নিকট দূর আত্মীয় তফাৎ করা হয় না। কিন্তু উচ্চতম স্তরে এই তফাৎ করা একটা বিশেষত্ব।

আবার, নিম্নতম স্তরে বাপে মেয়েতে বিবাহ চলে। উচ্চতম স্তরেও এই বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু বাপ পর্য্যায়ের ব্যক্তিগুলা এই দুই স্তরে বিভিন্ন।

কুনোর মতে সাধারণ পর্য্যটকদের জাতি-বিবরণগুলা এই কারণে সাবধানে বিশেষ গ্রহণ করা উচিত। "নিজ দলের ভিতর বিবাহ," "বাপে মেয়েতে বিবাহ" ইত্যাদি শব্দে প্রত্যেক স্থলেই

এক একটা বিশেষত্বপূর্ণ রীতি বুঝিতে হইবে। কিন্তু পর্য্যটকরা অনেক ক্ষেত্রেই সেই বিশেষত্বগুলার খবর রাখেন না।

দলগত বিবাহের আসল কথাটা ভুলিলে চলিবে না। এই প্রথায় এমন কতকগুলা বাঁধাবাঁধি আছে যাহার ফলে কোনো কোনো নির্দ্দিষ্ট আত্মীয়ের মধ্যে যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ।

মর্গ্যান গোষ্ঠী প্রথাকে "পুনালুয়া" প্রথা হইতে উৎপন্ন রূপে প্রচার করিয়াছেন। কুনোর মতে মর্গ্যান এই সম্বন্ধে যথোচিত প্রমাণ জোগাইতে পারেন নাই। বরং গোষ্ঠীর প্রারম্ভিক অবস্থায় দলগুলা যে বেশ প্রচলিত তাহা অষ্ট্রেলিয়ার নিগ্রোসমাজে প্রমাণিত হইতেছে।

কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্যায় মর্গ্যানের আবিষ্কার বিশেষরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। দলগত বিবাহের আলোচনায় মর্গ্যান দেখাইয়াছেন যে বাপে মেয়েতে বিবাহ নিষিদ্ধ করাই সমাজ গঠনের গোড়ার কথা। কুনো এই কারণে মর্গ্যানকে প্রশংসনীয় বিবেচনা করেন।

কুনোর গবেষণায় আরও কয়েকটা কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে ভাবিতেন যে, সাণ্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জের বাহিরে "পুনালুয়া" প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বিবাহ পদ্ধতি হাওয়াই সমাজের নিজস্ব। কিন্তু কুনো বলেন:— অষ্ট্রেলিয়ার দিয়েরি সমাজে প্রচলিত পিরায়ূরু প্রথা আর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পুনালুয়া একই প্রতিষ্ঠান। যে সকল পর্য্যটক বহুকাল বসবাস করিয়া দিয়েরিদের ভাষা দখল করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের বৃত্তান্ত হইতে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

মর্গ্যান বিবৃত বংশগত বা ভাইয়ে-বোনের বিবাহের প্রথায় যে

সকল কুটুম্ব বাচক শব্দ আছে সেইগুলার দ্বারা অষ্ট্রেলিয়ার দিয়েরি সমাজের কুটুম্ব বুঝানো যায় না। দিয়েরি সমাজে অনেক নতুন নতুন শব্দের চল আছে। হাওয়াইয়ে প্রচলিত শব্দগুলা দিয়েরি কুটুম্বের সমাজে চালাইতে গেলে মহা গোলে পড়িতে হইবে। মর্গ্যান এই কারণেই ভুল করিয়াছেন। হাওয়াই সম্বন্ধে মর্গ্যানের মত কাজেই ভ্রমাত্মক রহিয়া গিয়াছে।

মর্গ্যানের আরও কয়েকটা ভুল বাহির হইয়াছে। মর্গ্যানের মতে বংশগত বা ভাইয়ে-বোনে বিবাহের প্রথায় রক্তের আত্মীয়দের ভিতর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যাঁহারা এই সম্বন্ধে মর্গ্যানের প্রতিবাদ করেন তাঁহারা কুনোর মতে ঠিক অষ্ট্রেলিয়ায় রক্তের সম্বন্ধওয়ালা আত্মীয়দের যোনিসংসর্গ নিষিদ্ধ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে নতত্ত্বে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ফলে লোকের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছে যে, জগতের সর্ব্বত্র মায়ের রক্তের জোরে এবং মায়ের নামে প্রাচীনতম পরিবার ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাপের জোরে পারিবারিক প্রথাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিবেচনা করিবার দিকে পণ্ডিত মহলে ঝোঁক দেখা গিয়াছে। জনকের সন্ধান পাওয়া যখন মান্ধাতার আমলে একপ্রকার অসম্ভবই ছিল, এবং জননী সম্বন্ধে যখন কোনো প্রকার সন্দেহ চলিতেই পারে না তখন মাতৃবিধিকে পিতৃবিধি অপেক্ষা পুরানো বিবেচনা করা স্বাভাবিক।

কিন্তু কুনো বলেন:—"কমসেকম অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ গঠন সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। যে যে সমাজে গোষ্ঠী প্রথা বেশ পাকাপাকি গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সকল সমাজে মাতৃবিধি

সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু গোষ্ঠী প্রথা যেখানে নাই অথবা যেখানে নেহাৎ অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে সেখানে জনকের জোরে পরিবার দেখিতে পাই। জননীবিধি আর গোষ্ঠী পরস্পর সম্বন্ধ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জোড়-পরিবার

কিছু কালের জন্য জোড়ে জোড়ে বসবাস করা দলগত বিবাহের যুগেও এবং এমন কি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও দেখা গিয়াছে একাধিক নারীর সঙ্গে পুরুষ সহবাস করিত, আবার নারীও একাধিক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করিত। কিন্তু পুরুষও জানিত কে তাহার প্রধানা পত্নী। আবার সেই নারীও বুঝিত যে এই পুরুষই তাহার প্রধান স্বামী। এইরূপে অবাধযোনিসংসর্গের ব্যবস্থায় যে এক বিচিত্র পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই বলে, "জোড় পরিবার।"

খৃষ্টিয়ান পাদ্রীরা এই ব্যবস্থা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাদের মতে এইরূপ জীবন একমাত্র উচ্ছৃঙ্খল নারী হইলেই সম্ভব ছিল। অথবা খোলাখুলি নীতিহীনতার বাধা স্বরূপ এই সমাজ তাহাদের চোখে নিন্দনীয় বিবেচিত হইত।

বিবাহে বিধিনিষেধ

জোড়ে জোড়ে কম বেশী সময়ের জন্য স্ত্রীপুরুষের ঘর করা বাস্তবিক পক্ষে একটা সুনীতির বিস্তারের লক্ষণ ছিল। ভাই পর্য্যায়ের পুরুষেরা বোন পর্য্যায়ের নারীদিগকে বিবাহ করিতে পারিবে না,—এই নিয়ম যতই সমাজে বদ্ধমূল হইতেছিল ততই জোড় পরিবারের প্রথা বাড়িতেছিল।

গোষ্ঠী প্রথা দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে "ভাই" পর্য্যায়ের পুরুষ এবং "বোন" পর্য্যায়ের স্ত্রী বাড়িতে থাকে। কাজেই ভাইয়ে বোনে বিবাহ নিষেধের বিধান যুবকযুবতীদের পক্ষে বেশ একটা কড়া আইনই ছিল। এই অবস্থায় অবাধযোনিসংসর্গের এক প্রধান বাধাই সৃষ্ট হয় জোড় পরিবার প্রথায়। বুঝা গিয়াছে এই প্রথার প্রচলনের জন্য গোষ্ঠীবিকাশ প্রচুর দায়ী।

ইরোকোআ এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান্ সমাজের নিম্নতম স্তরে ও আত্মীয়দের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের ফলে শত শত পুরুষকে অথবা শত শত নারীকে নিজ নিজ স্ত্রী বা স্বামী ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। এ এক বিষম সমস্যার কথা। দলগত বিবাহের সহজ সরল নিয়ম উঠিয়া যাইতে বাধ্য। তাহার ঠাঁইয়ে জোড়পরিবার দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আমেরিকার আদিম সমাজগুলায় দেখা যায় যে, পুরুষ একজন নারী লইয়াই বসবাস করে। এক পত্নীত্বই সমাজের দস্তুর। কিন্তু অন্যান্য নারী ভোগ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য বা দুর্নীতি বিবেচিত হয় না। অপর দিকে নারী প্রায় সর্ব্বত্রই যতদিন পর্য্যন্ত সে কোনো পুরুষের সঙ্গে বসবাস করে ততদিন পর্যান্ত

তাহাকেই একমাত্র স্বামী বিবেচনা করে। সেই সময়ের ভিতর পরপুরুষের সঙ্গে সংশ্রব সমাজ কর্ত্তৃক কড়া ভাবেই দণ্ডিত হয়।

এই জোড় পরিবার যখন তখন পুরুষের ইচ্ছায় অথবা নারীর ইচ্ছায় ভাঙ্গিয়া ফেলা সম্ভব। ছেলেপুলেরা মায়ের সম্পত্তি এবং তাহার সঙ্গেই থাকে।

একই রক্তওয়ালা আত্মীয়দের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া মানবসমাজ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ইহার ফলে তাহার জয়লাভ ঘটিয়াছে। মর্গ্যান বলেন:—"ভিন্ন ভিন্ন রক্তওয়ালা সমাজের ভিতর যোনিসংসর্গ ঘটায় শারীরিক ও মানসিক হিসাবে প্রবলতর সন্তানসন্ততির জন্ম হইয়াছে। পরবর্ত্তী বংশের মাথার খুলি এবং মগজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে বংশের পর বংশ দুই বিভিন্ন বংশীয় জনক জননীর ক্ষমতা লাভ করিয়া জগতে শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে।" যে সকল সমাজে এই ধরণের বিবাহ অনুষ্ঠিত তাহারা অন্যান্য সমাজকে পরাস্ত করিয়াছে। অথবা তাহাদের নেতৃত্বে অবনত জাতিরা জগতে চলাফেরা করিতে বাধ্য হইয়াছে। জোড়-পরিবার প্রথা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের এক বড় অস্ত্র।

পরিবারের ক্রমবিকাশে দেখিতে পাই যে, প্রথম অবস্থায় একই বংশের যে কোনো পুরুষ যে কোনো নারীর সঙ্গে সহবাস করিত। যোনিসংসর্গের ক্ষেত্র বা গণ্ডী তখন বিস্তৃততম ছিল। এই ক্ষেত্র বা গণ্ডী ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে।

প্রথমে নিবারিত হইয়াছে নিকট আত্মীয়দের যোনিসংসর্গ। তাহার পর দূর আত্মীয়রা গণ্ডীর বহির্ভূত বিবেচিত হইয়াছে। এমন কি যে সকল নরনারীকে নেহাৎ আইনের ভাষায় "দূর

আত্মীয়” বলা চলে অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে রক্তের যোগ একপ্রকার নাই বলিলেও চলে তাহারাও শেষ পর্যন্ত যৌনসংসর্গের ক্ষেত্রের বাহিরে স্থান পাইয়াছে। এই উপায়ে ধাপের পর ধাপে দলগত বিবাহ লুপ্ত হইয়াছে। অবশেষে মানবসমাজ এক জোড়া নরনারীকে কেন্দ্র বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্য প্রথম প্রথম আবার এই জোড়ও মাত্র ক্ষণিক বা সাময়িক মাত্র। কিন্তু এই জোড় যতদিন একসঙ্গে থাকে ততদিন একটা পরিবার চলিতেছে এই ধারণা জন্মে। এই জোড় ভাঙিলেই বিবাহ বন্ধ হইল এইরূপও বুঝা হইয়া থাকে।

জোড়পরিবারের প্রথায় ব্যক্তিগত বা নিজস্ব স্ত্রী ও স্বামীর ধারণা দেখিতে পাইতেছি। এইখানে বর্তমান যুগের এক পত্নীত্বের প্রথম অবস্থাই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান কালের ব্যক্তিগত বা স্বাধীন প্রেম নামক কোন বস্তু এক পত্নীত্ব প্রথার জন্মকালে দেখিতে পাই না।

নারীর মূল্য

পূর্ববর্তী যুগে মেয়ে চুরি করিয়া বেড়াইবার জন্য পুরুষকে ব্যস্ত হইতে হইত না। কিন্তু এই যুগে মেয়ে চুরি বা বাহির করা পুরুষের পক্ষে একটা সমস্যা বিশেষ। ফলে জোড়-পরিবার প্রথা সুরু হইবামাত্র মেয়ে-চুরি, মেয়ে-লুট, মেয়ে-বিনিময় ইত্যাদি কাণ্ড জগতে দেখা দিয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের নৃতত্ত্ববিৎ ম্যাক্লেনান এই দাম্পত্য পরিবার বা বিবাহকে দুইভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। এক শ্রেণীকে তিনি বলেন “দখলের জোরে” বিবাহ। অপর শ্রেণী ইহার ঠিক

বিনিময়ের বিবাহ। বাস্তবিক পক্ষে পারিবারিক প্রথাকে এই উপায়ে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। দুই প্রথাই পুরুষের পক্ষে মেয়ে ঢুঁড়িবার উপায় মাত্র।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে বিবাহের জন্য পাত্রপাত্রীর মতামত লওয়া হয় না। এই বিষয়ে মায়েরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। অনেক সময়ে মায়েরা অনেক দিন আগে হইতেই বরকন্যার বিবাহ স্থির করিয়া রাখে। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত পাত্র পাত্রী তাহার কোনো খবরই পায় না।

বিবাহের সময় বর কন্যার মাকে এবং মায়ের দিককার আত্মীয়দিগকে উপহার দেয়। কন্যার বাপ বা বাপের দিককার আত্মীয় কিছুই পায় না। এই উপহার মায়েরই প্রাপ্য: মা কন্যাকে বরের হাতে দান করিয়াছে এই জন্য।

স্বামী ইচ্ছা করিলে বিবাহ রদ করিতে পারে। স্ত্রীও পারে কিন্তু আজকাল ইরোকোআদের সমাজে লোকমত বিবাহ ভাঙ্গিবার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতেছে। পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি বাধিলে গোষ্ঠীর লোকেরা শালিসীর ব্যবস্থা করে। তাহাতে সুফল না ফলিলে বিবাহ রদ করা হয়: সন্তানেরা মায়ের সঙ্গে যায়। দুই পক্ষই পরে আবার স্বাধীনরূপে বিবাহ করে।

জোড় পরিবার মোটের উপর বেশী দিন টিকে না। কাজেই আর্থিক হিসাবে ইহা দুর্ব্বল। এই জন্য প্রাচীন কালের ধনসাম্য বা যৌথ সম্পত্তির ব্যবস্থা তখনও চলিতে থাকে। একটা স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ঘরসংসার গড়িয়া তোলা হয় না।

যৌথসংসারের কর্ত্তা থাকে কেহ নারী। বাপের ইজ্জৎ জোড়পরিবারে কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা

বিবেচনা করিতেন যে, মান্ধাতার আমলে নারীরা ছিল পুরুষের গোলাম। এই ধারণা একদম ভুল। "স্যাভেজ" এবং "বার্বার" সমাজের সকল স্তরেই নারীদের স্বাধীনতা ত পুরা মাত্রায় আছেই। অধিকন্তু সমাজে নারীর সম্মানও খুব বেশী।

ইরোকোআদের সেনেকা জাতি সম্বন্ধে পাদ্রী আর্থার রাইট বলেন:—"লম্বা যৌথ বস্তিতে বসবাস করিবার সময় গোষ্ঠী থাকিত নিয়ম কানুনের হর্ত্তা কর্ত্তা। অন্যান্য গোষ্ঠী হইতে মেয়েদের জন্য স্বামী আসিত। সংসারের মাথায় থাকিত মেয়েরা। খাওয়া দাওয়ার জিনিষপত্র সকল পরিবারের জন্য একত্র মজুত থাকিত। কিন্তু যে স্বামী কুঁড়েমি করিয়া জীবন কাটাইতে অথবা কোনো কারণে যৌথভাণ্ডারে উচিত পরিমাণে মাল জোগাইতে না পারিত তাহার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাহাকে ছেলেপুলে ফেলিয়া বস্তি ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইতে হইত। অন্য কোনো বস্তিতে যাইয়া অন্য গোষ্ঠীর এক মেয়ের সঙ্গে তাহার জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। গোষ্ঠীর ভিতর স্ত্রীজাতির ক্ষমতা ছিল বিপুল। অনেক সময় গোষ্ঠীর কর্ত্তাকে মেয়েদের বিচারে কর্ত্তামি রেহাই দিতে হইয়াছে। তাহাকে হটাইয়ে মেয়েরাই আর একজনকে গোষ্ঠীনায়ক বসাইয়াছে।"

বস্তির ভিতরকার মেয়েরা সকলেই এক গোষ্ঠীর লোক। স্বামীরা আসে অন্যান্য গোষ্ঠী হইতে। কাজেই যৌথসম্পত্তির যুগে মেয়েরাই থাকে সকল বিষয়ে রাণী। জার্ম্মাণ নৃতত্ত্ববিৎ বাখোফেন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতি বিধান করিয়াছেন।

পর্য্যটক এবং পাদ্রীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে "স্যাভেজ" এবং

"বার্ব্বার" সমাজে মেয়েদিগকে খাটিতে হয় ভূতের মতন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের মর্য্যাদার হানি ঘটে না। আজকালকার ইয়োরোপীয় সমাজে বোধ হয় ভদ্রঘরের মেয়েরা খাটে কিছু কম, কিন্তু "স্যাভেজ" বা "বার্ব্বার" নারী তাহাদের পুরুষের নিকট যে পরিমাণ আসল সম্মান পায় সেই সম্মান "সভ্য"-সমাজের মেয়েরা কখনো চাখে না। বেশী খাটে বলিয়া যৌথবস্তির নারীরা পুরুষদের গোলাম এইরূপ বিবেচনা করিলে ভুল করা হইবে।

দলগত বিবাহের জের

দলগত বিবাহ একদম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কি? জোড় পরিবার কি আমেরিকার সর্ব্বত্রই দলগত বিবাহের স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার নানা অঞ্চল সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায় যে, অবাধ যৌনিসংসর্গ এখনও চলিতেছে। উত্তর আমেরিকায়ও অন্ততঃ চল্লিশ সমাজে কোনো পুরুষ একজন নারীকে বিবাহ করিলে সে তাহার সকল শালীর স্বামী বিবেচিত হয়।

কালিফোর্ণিয়া উপদ্বীপে বাঙ্ক্রফ্ট একপ্রকার জাতীয় "মহোচ্ছব" লক্ষ্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে নানা "জাতির" নরনারী একত্র জুটিত এবং "[illegible]" চালাইয়া অবাধ যৌনিসংসর্গ উপভোগ করিত। সম্ভবতঃ এই জাতিগুলা গোষ্ঠী বিশেষ। [illegible] আদিমের বাধাবন্ধহীন সর্ব্বব্যাপী স্ত্রীপুরুষ মিলনের স্মৃতি এই উৎসবে কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায়ও মাঝে মাঝে এই রীতি দেখা যায়। কোনো কোনো সমাজে নায়ক এবং পুরোহিত স্থানীয় বড় পুরুষের

দেশের সকল স্ত্রীলোকের উপর ভোগ-সত্ব দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু যুবারা এই সকল স্ত্রী ভোগ করিবার সুযোগ পায় মহোচ্ছব ইত্যাদির সময়।

হ্বেষ্টার মার্ক প্রণীত "মানবসমাজে বিবাহের ইতিহাস" গ্রন্থে এই ধরণের সাময়িক অবাধযৌনিসংসর্গের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের হো, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোগর ইত্যাদি জাতি বৎসরে কয়েকবার এই উপায়ে প্রাচীন যুগের বাধাহীনতার পুনরাবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত। আফ্রিকায়ও এই রূপ দেখা যায়। কিন্তু মজার কথা হ্বেষ্টার মার্ক এই সকল সাময়িক বাধাহীন স্ত্রীপুরুষ মিলনের ব্যবস্থাকে সাবেক কালের সনাতন অবাধযৌনিসংসর্গ এবং দলগত বিবাহ পদ্ধতির জের বিবেচনা করেন না। তাঁহার মতে মহোচ্ছবে প্রচলিত বাধাহীনতাগুলি "আদিম" মানবের শৃঙ্গার "ঋতু"র স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। জানোয়াররা যেমন বৎসরের কোনো নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে শৃঙ্গার প্রবণ হয়, হ্বেষ্টার মার্ক বিবেচনা করেন আদিম নরনারীও সেইরূপ মাঝে মাঝে যৌনিসংসর্গ জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হয়। সেই আকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপই শৃঙ্খলীকৃত বিধিবদ্ধ সমাজেও উচ্ছৃঙ্খল বাদবিচারহীন শৃঙ্গার ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দলবদ্ধ বিবাহনীতির পর জোড় পরিবার নীতির যুগ। এই যুগ পরিবার বাখোফেনই প্রথম আবিষ্কার করেন। স্ত্রী এই যুগে পুরুষ-সাম্য বা যৌথ-স্বামীর অধিকার ছাড়াইয়া এক পতির ভোগ্যা বিবেচিত হয়। কিন্তু "সত্য যুগের" সনাতন ধর্ম্ম বর্জ্জন করা সহজ কি? কখনও নয়। তাহার জন্য "প্রায়শ্চিত্ত" করা

দরকার। মনে একজনের ভোগ্যারূপে চিহ্নিত হওয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে এক মহা পাপ বিশেষ।

সেই পাপ এড়াইবার জন্য সমাজ হইতে স্ত্রীজাতিকে মাঝে মাঝে বহু পুরুষের ভোগ্যা হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। এই সুযোগগুলাকে বাখোফেনের ভাষায় স্ত্রীজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিবেচনা করে। কেননা তাহাদের ধারণায় একাধিক পুরুষের সঙ্গে নারীর সহবাস করাই নারীর বিধান। ইহাই সত্য যুগে স্ত্রীজাতির "স্বধর্ম।"

মিলিতা দেবতার মন্দিরে ব্যাবিলন দেশের নারীরা বৎসরে একবার করিয়া বহু পুরুষের ভোগে আসিত। পশ্চিম এসিয়ার অন্যান্য জনপদে ভদ্রঘরের মেয়েরাও আনাইতিস দেবতার মন্দিরে কয়েক বৎসর ধরিয়া "স্বাধীন প্রেমের" সুযোগ পাইত। এই সম্বন্ধবাধাহীন যোনিসংসর্গের পর তাহারা ঘরে ফিরিয়া বিবাহ যোগ্যা পাত্রী বিবেচিত হইত। ধর্ম্মের নামে এই ধরণের রীতি ভূমধ্যসাগর হইতে গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে আজও নানা অঞ্চলে চলিতেছে।

বাখোফেন বলেন:—"যৌথ-স্বামিত্ব নামক ধর্ম্ম বা নীতি বর্জ্জন করার ফলে যে পাপ জন্মে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যে সাজ অনুষ্ঠিত হয় তাহা ক্রমে ক্রমে মাত্রায় লঘু হইয়া আসিয়াছে। প্রথম প্রথম নারীকে প্রতি বৎসরই একবার করিয়া যৌথ-স্বামিত্ব ভোগ করিতে বাধ্য করা হইত। পরে এই বার্ষিক রীতির ঠাইয়ে জীবনে একবারমাত্র নারীরা বহুপুরুষের সঙ্গে সহবাস করিলেই ধর্ম্মের বিধান পালিত হইল বিবেচিত হইত। সেই একবারকার বাধাহীনতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে।

প্রথমে নিয়ম জারী ছিল যে, বিবাহিতারা অর্থাৎ পত্নীরা একবার করিয়া কিছুকাল যৌথ-স্বামিত্ব ভোগ করিবে। পরে নিয়ম হইল যে, পত্নীদের পক্ষে এইরূপ অবাধ প্রেম নিষিদ্ধ,—অবিবাহিতাদের অর্থাৎ কুমারীদের এই ধর্ম্ম পালন করিতে অধিকার। অর্থাৎ বিবাহিত অবস্থায় অবাধযোনিসংসর্গের পরিবর্ত্তে অবিবাহিত অবস্থায় ইহার প্রচলন ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচিত হইল। পরে আবার যোনিসংসর্গের গণ্ডীটাই সঙ্কুচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কোনো পুরুষের সঙ্গে (পত্নীরা বা) কুমারীরা স্বাধীন প্রেম চালাইতে পারিত কিন্তু ক্রমশঃ কোনো কোনো নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর পুরুষ ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে এই সংসর্গ বিধিসঙ্গত বিবেচিত হইত না।" দেবমন্দিরাদিতে কুমারী-ভোগ, দেবদাসী প্রথা এই শেষ অবস্থারই সাক্ষী।

কোনো কোনো সমাজে ধর্ম্মের অছিলা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কালের এসিয়ান (কল্ট) ও অন্যান্য সমাজে, এবং বর্ত্তমান কালেও ভারতবর্ষের আদিম নরনারী, মালয়জাতি, দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি সমাজে কুমারীরা বিবাহের পূর্ব্বে যথেচ্ছ যোনিসম্ভোগের জন্য ধর্ম্মের পাঁতি পায়। দক্ষিণ আমেরিকায় সর্ব্বত্রই এই রীতি দেখা যায়। সুইস্ আমেরিকান জীবতত্ত্ববিৎ আগাসিজ তাহার "ব্রেজিল পর্য্যটন" নামক গ্রন্থে ভদ্র ধনী পরিবারের ভিতরও এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

কোনো কোনো সমাজে বরের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন প্রথমেই ক'নেকে ভোগ করিতে অধিকারী। বরের পালা সর্ব্ব শেষে। ভূমধ্যসাগরের বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার

আউগিলার সমাজে এই রীতি পূর্ব্বে ছিল। আজও আবিসিনিয়ার বারিয়া জাতি এই রীতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের নায়ক, রাজা, পুরোহিত-সমাজ, ওঝা ইত্যাদি পদস্থ উচ্চতম ব্যক্তিরা বিবাহিতা নারী মাত্রের সঙ্গে বিবাহের রাত কাটাইতে অধিকারী। ব্যাঙ্ক্রফট্ আলাস্কার প্রায় সর্ব্বত্র এবং উত্তর মেক্সিকোর বহু সমাজে বিবাহের প্রথম রাতের এই স্বধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন।

মধ্য যুগের আগাগোড়া ইয়োরোপের আদিম কেল্টিক জাতির দেশগুলায় প্রথম রাত্রির বিধান সুপ্রচলিত ছিল। স্পেনের কথা স্মরণ করিতে হইবে। কাষ্টিলিয়া প্রদেশে কিষাণরা কখনও দাসে পরিণত হয় নাই। কিন্তু আরাগণ প্রদেশে চাষীরা জমিদার বা নবাবদের গোলাম ছিল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড আরাগণের গোলাম-প্রথা আইন করিয়া তুলিয়া দেন।

সেই আইনের বাক্যগুলি পড়িলে মধ্যযুগের স্পেনিস জাতির বিশেষতঃ আরাগণের নরনারীর রীতিনীতি বুঝিতে পারা যাইবে। আইনের কিয়দংশ এই:—"পাদ্রি ও সেনিঅর বা জমিদারগণ এখন হইতে চাষাদের স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম রাত্রি কাটাইতে পারিবেন না। অথবা বিবাহের রাত্রির পরের প্রভাতেও কিষাণ পত্নী বিছানায় শুইবার পর উহারা নিজেদের প্রভুত্বের বজায় রাখিবার জন্য সেই বিছানার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন না। অধিকন্তু কিষাণদের ছেলেপুলেকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহারা এমন কি বেতন দিয়াও নিজ কাজে লাগাইতে পারিবেন না।"

বাখ্‌অফেন বলেন:—"এক পত্নীত্বের উৎপত্তির জন্য স্ত্রী

জাতিই প্রধানতঃ দায়ী।" ইহা স্বীকার করা কঠিন নয়। মানবজাতির আর্থিক ইতিহাসে সাবেক কালের যৌথসম্পত্তির ব্যবস্থা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। এদিকে লোক সংখ্যাও বাড়িয়া চলিতেছিল। সেই অবস্থায় অবাধযোনিসংসর্গ আর মান্ধাতার আমলের চোখে দেখা সম্ভবপর ছিল না। নারীরা সহজে এই ব্যবস্থাকে স্বযোনির পক্ষে খানিকটা নিন্দাজনক বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিতেছিল। ক্রমশঃ "সতীত্বের" ধারণা কমবেকম অন্ততঃ সাময়িক ভাবে কোনো এক পুরুষের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থাই তাহাদের চিন্তায় উন্নতির লক্ষণ বিবেচিত হইতেছিল। কিন্তু পুরুষের চিন্তা পদ্ধতি এইভাবে বদলায় নাই। পুরুষের পক্ষে দলগত বিবাহের অবাধ সম্ভোগ ব্যবস্থা চিরকালই বাঞ্ছনীয় রহিয়াছে। নারীজাতির ইজ্জৎজ্ঞানের প্রভাবেই জগতে জোড় পরিবার দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। এই ভিত্তির উপর পরবর্ত্তী কালে পুরুষেরা এক-পতি-পত্নীত্ব প্রথা কায়েম করিয়াছে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এক-পতি-পত্নীত্বেও সংযম একমাত্র নারীর তরফেই বর্ত্তমান।

জোড়-পরিবার "স্যাহ্বেজ" এবং "বর্ব্বার" যুগের সন্ধিকালে গড়িয়া উঠিয়াছিল; "স্যাহ্বেজ" অবস্থার বিবাহ পদ্ধতি ছিল দলগত, "বার্ব্বার" যুগে তাহার স্থানে জোড়-পরিবার প্রচলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে—অর্থাৎ উৎকর্ষের যুগে এক-পত্নীত্ব সর্ব্বত্র মাথা তুলিয়াছে।

জোড়-পরিবারে "দলটা" মাত্র দুই ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। "জীবাণুকেন্দ্রের" ইহাই ক্ষুদ্রতম সমষ্টি। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে যোনিসংসর্গের সজ্ঘ তাহার শেষ

কোঠায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। একটা পুরুষ এবং একটা নারী, এই দু'য়ের সমবায়কে জোড়-পরিবারে যেরূপ সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহার বেশী আর সম্ভব নয়। পারিবারিক জীবনের পক্ষে অন্য কোনো নতুন রূপ গ্রহণ করা এক্ষণে অসম্ভব। জোড়-পরিবারের প্রথাই মানবজাতির বিবাহ ব্যবস্থার চরম পরিণতি।

কিন্তু দুনিয়া এইখানেই ঠেকে নাই। জগতে নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। তাহার ফলে যোনিসংসর্গের নিয়ম অর্থাৎ বিবাহ পদ্ধতি এবং পারিবারিক প্রথাও রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

পশুপালনের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব

এইবার জোড়-পরিবারের জন্মনিকেতন আমেরিকা পরিত্যাগ করা যাউক। নব ভূখণ্ডে অন্য কোনো রূপের পরিবার দেখা দেয় নাই। এক-পত্নীত্ব বা এক-পতিত্বের কোনো চিহ্ন ইণ্ডিয়ান সমাজে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের ইতিহাস অন্যরূপ।

এই ভূখণ্ডে জানোআর চাষ এবং পশুপালনের ফলে মানব সমাজে এক অপূর্ব্ব ধনসম্পদ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে সামাজিক জীবনও এক অভিনব প্রণালীতে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

"বার্ব্বার" যুগের নিম্নতম স্তরে ঘর-বাড়ী, কাপড়-চোপড়, গহণা, রান্না-বাড়ী ও খাওয়া-দাওয়ার যন্ত্রপাতি, হাঁড়ি-কুঁড়ি, নৌকা এবং সাধারণ অস্ত্র-শস্ত্র মানবজাতির দৌলত ছিল। খাদ্যদ্রব্য

সংগ্রহ করিতে হইত রোজ রোজ। কিন্তু পশুপালক জাতিরা সহজেই অল্পকালের ভিতর প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘোড়া, উট, গাধা, গাভী, ভেঁড়া, ছাগল, শূয়র, ইত্যাদির দখল লইয়া এই সকল পর্য্যটক জাতি বিনা কষ্টে সুবিস্তৃত জনপদের কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিল। সামান্য পরিশ্রমেই ইহারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে পারিত। পঞ্চনদে, গঙ্গামাতৃক জনপদে, তাইগ্রিস এবং ইউফ্রেতিস দরিয়ার উপকূলে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের সুযোগ জুটিয়াছিল। তখনকার দিনে অক্সাস এবং জাক্জার্তিস অঞ্চলে ভূমিও সুজলা সুফলাই ছিল। এই জনপদেও পশুপালক জাতি সহজেই দুধ ও মাংস জোগাইতে পারিত। প্রাচীন আর্য্য এবং সেমিটিক জাতীয় নরনারীরা এইরূপে আর্থিক হিসাবে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে।

কিন্তু এই সব অভিনব ধন-দৌলতের মালিক ছিল কে? প্রথম প্রথম গোটা "গেন্স্" বা গোষ্ঠীই যৌথভাবে সকল সম্পদের অধিকারী ছিল; কিন্তু অতি শীঘ্রই জানোআরের পালগুলা ভিন্ন ভিন্ন মালিকের অধিকারভুক্ত রূপে দেখা দেয়।

বাইবেল গ্রন্থের "ওল্ডটেষ্টামেণ্ট" খণ্ডের প্রথম মোজেস-অধ্যায়ের রচয়িতার বিবরণে জানিতে পারি যে, ফাদার আব্রাহাম তাঁহার স্বীয় জানোআরপালের মালিক ছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এই স্বত্বাধিকার কোথা হইতে জুটিয়াছিল? এক যৌথ-পরিবারের কর্ত্তা রূপে? না গোটা গোষ্ঠীর নায়ক রূপে? তবে আসল কথাটা ভুলিলে চলিবে না। আব্রাহাম কোনো মতেই আজকালকার আমলের অনুরূপ মালিক বা স্বত্বাধিকারী ছিলেন না।

অন্যান্য দেশের ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেও যেখানে যেখানে সাহিত্য-নিবদ্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেখানেই দেখিতে পাই যে জানোআরের পালগুলা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারনায়কের সম্পত্তি বিবেচিত হইত। সম্পত্তি হিসাবে জানোআরের পালে আর ধাতুজ পদার্থে, বিলাস দ্রব্যে এবং মানুষ জানোআরে অর্থাৎ গোলামে কোনো তফাৎ করা হইত না। অর্থাৎ সবই পরিবার-নায়কদের দৌলতরূপে প্রচলিত ছিল।

এই যুগে গোলাম-প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। "বার্বার" যুগের নিম্নতরস্তরে গোলাম বা মানুষ-জানোআরের কোনো প্রয়োজন হইত না। দাসের দ্বারা কোনো কাজ করাইবার মতন কাজ দেখা দেয় নাই। কাজেই আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা পরাজিত ও দখল করা নরনারীদিগকে যে ভাবে ব্যবহার করিত তাহাতে আর উচ্চতর স্তরে অবস্থিত জনগণের কার্য্য প্রণালীতে বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

আমেরিকান ইণ্ডিয়ান-সমাজে পরাজিত নরনারীদিগকে নানা উপায়ে নিজের লোকরূপে সমাজে ঠাঁই দেওয়া হইত। পুরুষ-দিগকে নির্য্যাতন করা হইত। পরে তাহারা সমাজের ভিতর ভাই বলিয়া গৃহীত হইত। মেয়েদিগকে বিবাহ করা হইত; তাহাদের সন্তানসন্ততিরাও সঙ্গে সঙ্গে পোষ্য বিবেচিত হইত। এই সমাজে মানুষের পরিশ্রম খাটাইয়া খরচের চেয়ে বেশী দামের মাল উঠানো সম্ভব ছিল না। কাজেই মানুষকে জানোআরের মতন ব্যবহার করিবার দরকার আবিষ্কৃত হয় নাই।

কিন্তু পশুপালন, ধাতু শিল্প, কাপড় চোপড় বুনা এবং চাষ আবাদের ফলে মানবসমাজে এক আর্থিক বিপ্লব ঘটে। এই

যুগের স্ত্রী সহজে জুটিত না। স্ত্রীলাভ করিতে হইলে "পয়সা খরচ" করিতে হইত। সেইরূপ ধনোৎপাদনের জন্যও মজুর জুটাইতে হইত। কাজেই মানুষকে জানোআররূপে পাইবার জন্য এটা চাহিদা সমাজে দেখা দিয়াছিল। অধিকন্তু জানোআর-গুলা এই সমাজে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সম্পত্তি।

প্রত্যেক পরিবারে জানোআরের পাল বৎসর বৎসর বাড়িয়া যায়। কিন্তু পরিবারের লোক সংখ্যা এত শীঘ্র এবং এত বেশী বাড়ে না। কাজেই পশু তদ্‌বীর করিবার জন্য প্রত্যেক পরিবারেই মজুর নিয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় পরাজিত শত্রুকে গোলামরূপে পরিবারের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখার প্রথা আবিষ্কৃত হয়।

ধন দৌলতের বৃদ্ধি এবং গোলাম-প্রথা এই দুইয়ের প্রভাবে জোড় পরিবার এবং মাতৃবিধি নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছিল। জননীরই তখন রাজ্য বটে, কিন্তু জনক নেহাৎ অবজ্ঞাত বা অজ্ঞাত ছিল এইরূপ ভাবিবার কারণ নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রে বোধ হয় আজকালকার তথাকথিত সামাজিক চোখে পরিজ্ঞাত জনক অপেক্ষা জোড় পরিবারের জনক সম্বন্ধে সন্দেহ কমই ছিল।

"নারীর আমলের" শ্রম বিভাগনীতি অনুসারে পুরুষের জিম্মায় ছিল খাওয়া দাওয়া সংগ্রহ করিবার কাজ। এই সম্পর্কের যন্ত্রপাতি সবই ছিল তাহার নিজস্ব। অপর পক্ষে স্ত্রী থাকিত ঘরকন্নার রাণী। জানোআরের পাল এবং গোলামের দল এই দুই নয়া সম্পত্তিও ছিল পুরুষেরই অধিকারে।

কিন্তু সম্পত্তিগুলার উত্তরাধিকারী হইত কাহারা? জননী-

বিধি তখন স্বত্বের আইন নিয়ন্ত্রিত করিত। বাপ তাহার ছেলে-পুলেকে নিজ সম্পত্তি দিয়া যাইতে পারিত না। সম্পত্তিগুলা গোষ্ঠীর ভিতর থাকিতে বাধ্য। গোষ্ঠী:—সেত মায়ের নামে চলে, মায়ের বংশের লোকের সমষ্টি। কাজেই মায়ের সমরক্ত আত্মীয়েরা সম্পত্তি পাইত। পুরুষের নিজ স্ত্রীর সন্তানসন্ততিরা গোষ্ঠীর বহির্ভূত। সুতরাং বাপের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তিতে তাহাদের কোনো অধিকার বর্ত্তে না।

তবে পুরুষের ছেলেপুলেরা সম্পত্তির অধিকারী হইত কিরূপে? তাহারা তাহাদের জননীর অর্থাৎ বাপের স্ত্রীর গোষ্ঠী ভুক্ত, বাপের গোষ্ঠীভুক্ত নয়। কাজেই জননী বংশের অন্যান্য আত্মীয়দের যে যে ধনদৌলতে অধিকার ইহাদের সেই সবে অধিকার।

জানোআর, গোলাম ইত্যাদি সম্পত্তির অধিকারী পুরুষ যখন মরিত তখন এইগুলা পাইত কাহারা? তাহার ভাই বোনেরা এবং ভাগ্নে ভাগ্নীরা। দরকার হইলে তাহার মাসতুত ভাই বোনেরাও এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিত। নিজের স্ত্রী অথবা ছেলেপুলেরা এই জানোআর-ধন বা গোলাম-ধনের মালিক হইতে পারিত না।

জননী-বিধির বিরুদ্ধে পুরুষের বিদ্রোহ

ধন দৌলত বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ স্বভাবতঃ নিজের ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে অনুভব করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সনাতন জননী-বিধির বিরুদ্ধে তাহার মেজাজ খেলিতে সুরু করিয়াছিল। বিশেষভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক নিয়মগুলা তাহার চিন্তায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

জননী-বিধি ভাঙ্গিয়া ফেলা এই যুগে পুরুষের এক বড় কাজ। কিন্তু এই বিপ্লবসাধন আজকালকার চোখে যত কঠিন বোধ হইতেছে তখনকার দিনে তত কঠিন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি না করিয়াই এই আর্থিক বিপ্লব ঘটনা সম্ভবপর হইয়াছিল।

পুরুষের সন্তানসন্ততিরা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোক,—কেবল এই নিয়মটা কায়েম করা মাত্রই সকল ল্যাঠা চুকিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দিককার সন্তানসন্ততিদিগকে তাহাদের বাপের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। মাতৃ-গোষ্ঠী জননী বিধি, নারীর-আমল উড়িয়া গেল। তাহার স্থানে দেখা দিল বাপের নাম, জনক বংশ, পুরুষের আইন।

কবে কোথায় জননী-বিধিকে উড়াইয়া দিয়া জনক-বিধি মানব সমাজে জুড়িয়া বসিয়াছে তাহার প্রমাণ বাহির করা বড় কঠিন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটিয়াছিল। বাখোফেন সংগৃহীত নিদর্শনগুলা আলোচনা করিলে সেই সাবেক কালের জননী-গোষ্ঠীর প্রতাপ কিছু কিছু আন্দাজ করা যায়।

এই বিপ্লব অতি সহজেই আজও আমাদের চোখের সম্মুখেই সাধিত হইতেছে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতিপুঞ্জ এই আইন পরিবর্ত্তণের সজীব দৃষ্টান্ত। ধনসম্পদ বাড়িবার ফলে এই বিপ্লব ঘটিতেছে। নিবিড় বন জঙ্গলে বসবাস ত্যাগ করিয়া প্রেরি নামক তরুহীন ঘাসবহুল সমতল মাঠে বস্তি গাড়ার সঙ্গে সঙ্গেও জীবনযাত্রার প্রণালী, স্বত্বাধিকারে নিয়ম ইত্যাদি বদলাইয়া যাইতেছে। অধিকন্তু খৃষ্টান পাদ্রী এবং

বর্ত্তমান উৎকর্ষের যুগের ধাক্কায়ও জননী-বিধি উড়িয়া যাইতেছে।

মিসৌরি জনপদের আটটা ইণ্ডিয়ান জাতির ভিতর ছয়টাতে "পুরুষের আমল" কায়েম হইয়াছে। "নারীর আমল" এখনও চলিতেছে বাকী দুইটায়। শাওনি, মিয়ামি এবং ডেলাহ্বার জাতিদের ভিতরও নয়া প্রথা প্রবেশ করিতেছে। ছেলেপুলে দিগকে বাপের নাম দেওয়া হইতেছে এবং এই উপায়ে বাপের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের এক্তিয়ার সৃষ্ট হইতেছে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস বলেন :—"মানুষ চিরকালই এইরূপ কূটকৌশলের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। নামটা মাত্র বদলাইয়া সে জিনিষটাই বদলাইয়া দিল এইরূপ বিশ্বাস করা তাহার স্বভাব। একটা মতলব হাঁসিল করিবার জন্য সে সহজেই যে কোনো প্রথা ভাঙিয়া তাহার ভিতর একটা নতুন কিছু কায়েম করিবার জন্য ছিদ্র বাহির করিতে পারে। এই জন্য তাহার মাথায় যুক্তির অভাব হয় না।"

শাওনি, মিয়ামি ইত্যাদি সমাজে নাম বদলাইবার ব্যবস্থা করিয়া বস্তুতঃ মহা হযবরল সৃষ্টি করা হইয়াছে। সোজাসুজি জনক-বিধি কায়েম করিলেই কোনো গণ্ডগোল থাকিত না। কিন্তু কার্ল মার্কস্ বলেন :—"এই প্রণালীই পুরাণোর ঠাঁইয়ে নতুন আমদানি করিবার পক্ষে অতি স্বাভাবিক।"

জননী-বিধির পতনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির পরাজয় ঘোষিত হইল। পুরুষেরা একমাত্র জানোআর ও গোলাম এবং খাওয়াপরার অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে স্বযোনিতে এবং স্বনামে উত্তরাধিকারের এক্তিয়ার পাইয়া থামে নাই। ইহারা ঘরকন্না

গৃহস্থালি ইত্যাদি নারীর সম্পত্তি বা "স্ত্রীধনে"ও দখল বসাইয়া ছিল। মেয়েরা "পুরুষের আমলে" সকল ইজ্জৎ হারাইয়া দাসে পরিণত হইল। তাহাদের একমাত্র ব্যবসা হইল পুরুষের ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সন্তান প্রসবের কল মাত্র হওয়া।

নারীজাতির দুর্গতি হোমারীয় যুগের গ্রীক্ সমাজে বিশেষ পরিস্ফুট। পরবর্ত্তী কালের গ্রীস উৎকর্ষের এক উন্নততম দেশ। সেই যুগে নারীর দুর্গতি আরও অধিক মাত্রায়ই দেখা দিয়াছিল। ক্রমশঃ এই দুর্গতিকে নানা উপায়ে "লেপ মুড়ি" দিয়া অথবা চুনকাম করিয়া খানিকটা ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই "পোষাকী সাজে" বা ছদ্মবেশেও নারীর দুর্গতি লুকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। আজকালকার নারীর ইজ্জতে আর সেই জননী-বিধির যুগের স্বাধীনতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

পুরুষ পরিবারে ও সমাজে রাজা হইয়া বসিল। তাহার অধীনে পরিবারের ভিতর কতকগুলা স্বাধীন ও গোলাম নরনারী বসবাস করিতে অভ্যস্ত হইল। সেমিটিক জাতির ভিতর পরিবারের নায়ক এক সঙ্গে বহু স্ত্রী ভোগ করে। তাহার পরিবারের গোলামেরাও সস্ত্রীক তাহার সঙ্গেই ঘর করে। সকলে মিলিয়া জানোআর চরাণো এই সুবিস্তৃত যৌথ পরিবারের কাজ।

বাপের একতিয়ার আর গোলাম-প্রথা এই দুই বস্তু "পুরুষের আমলের" পারিবারিক কেন্দ্রে সর্ব্বপ্রথম দেখা দেয়। প্রাচীন রোমের পারিবারিক জীবন এই সামাজিক পদ্ধতির বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। ল্যাটিন ভাষায় "ফ্যামিলিয়া" শব্দে আজকালকার

প্রচলিত "পরিবার" বুঝাইত না। আজকালকার পরিবারে লোক দেখানো স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে "অন্তরে গরল মাখা" কোঁদল লড়াই চলে। রোমের "ফ্যামিলিয়া" ছিল খোলাখুলি বাপের একচ্ছত্র রাজ্য আর গোলামের বাথান। বস্তুতঃ গোলামই ছিল "ফ্যামিলির কেন্দ্র।"

প্রথম প্রথম রোমের লোকেরা ফ্যামিলি শব্দে এমন কি পরিবারের প্রধান দুই ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রী এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিও বুঝিত না। গোলাম ছিল এই শব্দের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি। পরিবারের অন্তর্গত দাস বুঝাইবার জন্য তাহারা "ফ্যামির্উলুস" শব্দ ব্যবহার করিত। "ফ্যামিলিয়া" ছিল কোনো ব্যক্তির অধীনস্থ দাস সমষ্টির প্রতিশব্দ। গেয়াসের আমলে লোকেরা উইল করিয়া "ফ্যামিলিয়া" অর্থাৎ দাস সমষ্টি দান করিয়া যাইত। অবশ্য এই সম্পত্তি ছিল প্যাট্রিমোনিয়ুম বা পিতৃসত্ব। গোটাপরিবার ক্রমশঃ এই একই শব্দে বুঝানো হইতেছিল।

রোমান পরিবারে বাপ ছিল সর্ব্বময় কর্ত্তা। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং দাস সমষ্টির উপর তাহার এক্তিয়ার ছিল চরম। অর্থাৎ সকলেরই উপর সে জীবন মরণের অধিকার ভোগ করিত। এই বজ্রশৃঙ্খলে আঁটা সমাজকেন্দ্র হইতেই পরিবার শব্দ জগতে উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রীকেরা রোমাণ "আর্য্য" হইতে তখন তফাৎ হইয়া গিয়াছিল। চাষ আবাদ এবং দাসত্ব প্রথাও তখন মানবসমাজে সুপ্রচলিতই ছিল।

মার্কস্ বলেন:—বর্ত্তমান উৎকর্ষের যুগের ফ্যামিলি বা পরিবারকে গোলামীর কেন্দ্র বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল ব্যক্তিগত সাধারণ গোলামী মাত্র নয়, ভূমিগত গোলামীও

পরিবারের সঙ্গে জড়িত। চাষআবাদের কাজে কতকগুলা মানুষকে জানোআরের মতন ব্যবহার করিবার জন্যই বর্ত্তমান পারিবারিক প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন যুগে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় যত প্রকার দ্বন্দ্ব ও লড়াই দেখা দিয়াছে সকলগুলার বীজই পরিবারের ভিতরে নিহিত আছে। এইরূপ বুঝিলে ইতিহাসে পরিবারের কিম্মৎ পাকড়াও করা যাইবে।"

পুরুষাধিপত্যের জন্ম

এক পত্নীপতিত্বের পথে জোড়পরিবার এইরূপেই দেখা দিয়াছিল। পুরুষের নামে বংশের পরম্পরা রাখিবার জন্য স্বামী নিজের ইজ্জৎ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে চলিতে সুরু করিল। ফল হইল স্ত্রীর উপর জুলুম। পত্নী যাহাতে পরপুরুষে আসক্ত না হয় সেই দিকে গেল পুরুষের চিন্তা। আইন গড়িয়া উঠিল তদনুরূপ। স্ত্রীর উপর পুরুষের যথেচ্ছ অধিকার দেখা দিল। স্ত্রীকে হত্যা করিলেও সে অন্যায় বা বেআইনী কিছু করিল এরূপ ভাবিবার আর অবসর থাকিল না।

পুরুষ-বিধি জারি হইবার যুগ সম্বন্ধে সাহিত্য নিবন্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। তুলনামূলক আইন-বিজ্ঞানের আলোচনায় মানব জাতির সেই অবস্থা পরিষ্কাররূপে ধরা পড়ে। মাক্‌সিম্ কোহো-লেহ্স্কি প্রণীত "তাব্ল্যো দেজ ওরিজিন এ দ' লেহ্বোলিউসিয়োঁ দ' লা ফামিয় এ দ' লা প্রোপ্রিয়েতে" নামক পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক ফরাসী গ্রন্থ ১৮৯০ সালে সুইডেনের ষ্টকহল্ম নগরে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার

সার্ব্বিয়া এবং বুলগেরিয়া দেশে "জাড্রুগা" (অর্থাৎ বন্ধুবর্গ) এবং "ব্রাৎসৎভো" (অর্থাৎ সৌভ্রাত্র সঙ্ঘ) নামক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন।

এশিয়ায় এই ধরণের কুটুম্ববর্গ, "বেরাদরি," জ্ঞাতিরদল, "জাতভাই" ইত্যাদি আজও বর্ত্তমান আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কোহ্বালেহ্বসকি মান্ধাতার আমলের জনক-বিধি নিয়ন্ত্রিত যৌথপরিবার বিবেচনা করেন। ইঁহার মতে আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজে প্রচলিত এক-পত্নীত্ব আর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জননী-বিধি নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক প্রথার মাঝামাঝি এই সব "বন্ধুবর্গ," জ্ঞাতিসঙ্ঘ, পিতৃকুল ইত্যাদির ঠাঁই প্রাচীন আর্য্য ও সেমিটিক জাতিপুঞ্জের সম্বন্ধে এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে বিশেষ কোনো আপত্তির কারণ নাই।

জুগোস্লাভিয়ার "জাড্রুগা" যৌথপরিবার পল্লীসমাজের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জনকের সন্তানসন্ততিরা কয়েক পুরুষ ধরিয়া এইরূপ পরিবারে একসঙ্গে বসবাস করে। একই জমি চষা হয়। কাপড়চোপড় তৈয়ারি এবং ব্যবহার করা হয় একসঙ্গে। মেহনতের সকল প্রকার ফল এবং মুনাফাই সমবেতভাবে ভোগ করা হইয়া থাকে।

"জাড্রুগা"র কর্ত্তা থাকে "দোমাসিন"। এই ব্যক্তি পরিবারের নায়ক হিসাবে কেনাবেচা ইত্যাদি সবই নিজ জিম্মায় চালায়। সকলের চেয়ে যে বয়সে বড় সেই কর্ত্তা হয় এমন নয়। সকলে মিলিয়া যাহাকে কর্ত্তা বাছাই করা হয় সেই "দোমাসিন"। "দোমাসিনে"র পত্নীকে বলে "দোমাসিসা"। এই নারীর অধীনে "জাড্রুগা"র সকল মেয়ের জীবন পরিচালিত হয়।

মেয়েদের স্বামী বাছাই কাজে "দোমাসিসা"র এক্তিয়ার এক প্রকার অসীম।

পরিবারের স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া সভা করে। এই পারিবারিক সভাই বাস্তবিক পক্ষে সকল বিষয়ে চরম কর্ত্তৃত্বের অধিকারী। "দোমাসিন"ও এই সভার নিকট জবাবদীহি হইতে বাধ্য। জমিজমা ইত্যাদি কেনাবেচা সম্বন্ধে এবং সামাজিক লেনদেন ও অন্যান্য বিষয়ে এই সভার মজলিস ছাড়া কিছুই মীমাংসা হইবার জো নাই।

রুশিয়ায় যে এই ধরণের যৌথপরিবারের সমাজ চলিয়া আসিতেছে তাহা ১৮৭৫ সালের পূর্ব্বে কেহই বিশ্বাস করিত না। পরবর্ত্তী কালে রুশিয়ার পল্লীসমবায়ের মতন পরিবারসমবায়ও পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হইয়াছে।

জুগোস্লাভিয়ার ডাল্‌মাসিয়া জনপদের পল্লীবিধিতে এই পরিবারসমবায় বা যৌথপরিবারকে বলে "হ্বর্ব্য"। প্রাচীনতম রুশ আইনগ্রন্থেও এই শব্দই ব্যবহৃত দেখিতে পাই। য়ারোস্লাভের "প্রাহ্বডা" সেই রুশবিধির নাম। প্রাচীন পোল্যাণ্ড এবং চেকমুল্লুকের সংহিতায় বা স্মৃতি শাস্ত্রেও এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন জার্ম্মাণদের সমাজ প্রতিষ্ঠান আলোচনা করিয়া হয়স্‌লার এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থেও দেখিতে পাই কোনো একটা পরিবার সাবেক কালে আর্থিক বা সম্পত্তি বিষয়ক কেন্দ্র ছিল না। সমবেত ঘরকন্নাই ছিল জার্ম্মাণদের দস্তুর। পরিবারগুলা যৌথভাবে পুরুষানুক্রমে কখনো কখনো গোলামের দল লইয়া বসবাস করিত।

কোহ্বালেহ্বসকির মতে প্রাচীন রোমের পরিবারও এই স্লাভ, জার্ম্মাণ শ্রেণীরই সামাজিক ও আর্থিক কেন্দ্র ছিল। ইঁহার বিবেচনায় রোমাণ পরিবারকে যেরূপ বজ্রকঠোর শিকলে বাঁধা একচ্ছত্র শাসনের জীবন বিবেচনা করা হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে। "পরিবারসভা" নামক প্রতিষ্ঠান যে সমাজে চলে সেই সমাজে কোনো ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তামি চলে না সহজেই বোধগম্য।

আয়ার্ল্যাণ্ডের কেল্টিক সমাজেও পরিবার সমবায়ের প্রথা বাহির হইয়াছে। ফ্রান্সে বিপ্লবের যুগ পর্য্যন্ত নিভার্নে অঞ্চলে এই প্রথা ছিল "পার্সোনারি" নামে। ফ্রাঁশ কোঁৎ অঞ্চলে প্রথাটা এখনও চলিতেছে। সাওন এবং লোআর জনপদে বড় বড় বস্তি দেখা যায়। এইগুলায় সুবিস্তৃত যৌথ আরামশালা বা বৈঠক-খানা এক বিশেষত্ব। এই বৈঠকখানার চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন শোআর ঘর আছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়া এক একটা চাষী পরিবার এইরূপ বস্তিতে সমবেতরূপে জীবন ধারণ করে।

আলেকজান্দারের সেনাপতি নেআর্খস পঞ্জাবে যৌথ পরিবার এবং যৌথ আবাদ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজও এখানে সেই প্রথা বিদ্যমান। ককেসাস অঞ্চলে কোহ্বালেহ্বসাকি নিজেই এই পারিবারিক প্রথা ঢুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন।

উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া দেশে কাবিলজাতির ভিতর এই প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। আমেরিকারও এই প্রথা বাহির হইয়াছে। প্রাচীন মেক্‌সিকোয় "কাল্‌পুলিস" নামক প্রতিষ্ঠান ছিল। সেইটা নাকি যৌথ পরিবারেরই অনুরূপ। কিন্তু পেরুদেশ সম্বন্ধে কুনো অন্য কথা বলেন। ইঁহার মতে এদেশে জমি ভাগা-

ভাগি করিয়া দেওয়া হইত। জমির উপর ব্যক্তিদের নিজ নিজ একতিয়ার ছিল। এই ব্যবস্থা অবশ্য খৃষ্টানদের পেরুবিজয়ের সমসাময়িক।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে জনক-বিধি, জ্ঞাতিবর্গ, পরিবারসমবায় আর যৌথচাষ মানব সভ্যতার ইতিহাসে বেশ বড় ঠাঁই অধিকার করিয়াছিল। কোহ্বালেহ্বসকির গবেষণায় আরও জানিতে পারি যে এই যৌথ পরিবারই কালে পল্লী-সমবায়ে পরিণত হয়। পল্লীসমবায়ের অধীনে জমিগুলা স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব স্বরূপ চষা হইত। ক্রমশঃ জমিগুলা নিজ নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

যৌথ পরিবারের ভিতর কর্ত্তার ক্ষমতা রুশসমাজে অতিমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। পুত্রবধূদিগকে ভোগ করা ইহার এক মামুলি কাজের অন্তর্গত ছিল। রুশিয়াব পল্লীগাথায় এই সমাজচিত্র পরিস্ফুট।

বহু-পত্নীত্ব এবং বহু-পতিত্ব কোনো সমাজেই সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রতিষ্ঠান হইতে পারে না। দুইই বিলাস মাত্র। বিলাস ভোগ কোনো জাতিরই সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যে সমাজে দুইই এক সঙ্গে প্রচলিত সেখানে প্রতিষ্ঠান দুইটা অতি সাধারণ এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব। কারণ সেখানে যে কোনো ব্যক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী যে কোনো নারীর দ্বিতীয় স্বামীকে সহজেই পায়। অর্থাৎ সেখানে "দলগত" বিবাহ পদ্ধতিই চলিতেছে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু যে সমাজে পুরুষেরা বহু স্ত্রী ভোগ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীরা বহু স্বামীর অধিকারী নয় সেই সমাজে একমাত্র সম্পত্তি-

শালী লোকের পক্ষে এই প্রথা চালানো সম্ভবপর। এই প্রথা গোলাম কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত কিন্তু জনসাধারণ এক-পত্নীত্বই পালন করিয়া চলে। বহু-পত্নীত্ব ব্যতিরেক বিশেষ। সেইরূপ তিব্বতী এবং ভারতীয় সমাজের বহু-পতিত্বও ব্যতিরেক বিশেষ।

নায়ার সমাজে এক নারীর বহু স্বামী দেখা যায়। ইহা বহু-পতিত্ব সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুপতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে বহু-পত্নীত্বও চলিতেছে। কারণ প্রত্যেক পুরুষই অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে দ্বিতীয় নারীর স্বামী হইতে পারে। বিবাহ সম্বন্ধে নায়ার প্রথায় ক্লাব রচিত হয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোনো মতেই এখানে খাঁটি বহু-পতিত্বের একচেটিয়া রেওয়াজ নাই। বস্তুতঃ সেই মান্ধাতার আমলের দলগত বিবাহ পদ্ধতিই এখানে চলিতেছে বলিতে হইবে। পুরুষেরা এখানে বহু-পত্নীক, স্ত্রীরাও বহু-স্বামিক।

বর্ত্তমান যুগের এক-পতিত্ব বা এক-পত্নীত্ব, জননী-বিধি বা "নারীর আমল" ভাঙিয়া যাইবার পর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "নারীর আমল" ভাঙিয়াছিল জোড়-পরিবারের যুগে। তাহার পূর্ব্বে ছিল দলগত বিবাহের নানারূপ। সেই রকম পারিবারিক কেন্দ্রের চিহ্ন স্বরূপই আজও কোথাও কোথাও বহুপতিত্ব দেখা যায়। বহু-পত্নীত্ব জগতে বিরল,—একমাত্র ধনী ব্যক্তি বিশেষের বিলাস সামগ্রী রূপে এশিয়ার কোথাও কোথাও ইহার চল আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক-পতি (পত্নী) ত্ব-মূলক পরিবার

বহুকাল ধরিয়া জগতে চলিয়াছিল জোড়-পরিবারের যুগ। মান্ধাতার আমলের "বার্ব্বার" স্তরটা আগাগোড়াই এই ধরণের পারিবারিক কেন্দ্রের সমাজবিন্যাসে ভরা ছিল। ক্রমে ক্রমে এক-পত্নীত্ব এবং এক-পতিত্ব গজাইয়া উঠে। "বার্ব্বার" এবং উৎকর্ষের স্তরের সন্ধিকালে জোড়-পরিবার দুনিয়া হইতে একদম লুপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

জনক-বিধি, বাপের নামে বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার, এক কথায় "পুরুষের আমলে"র সঙ্গে সঙ্গে একপত্নী (পতি-)ত্ব মানবসমাজে মাথা তুলিয়াছে। পুরুষ যাহাতে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিনা সন্দেহে চিনিতে পারে এবং প্রতিবেশীর ভিতর চিনাইতে পারে তাহার জন্যই এই বিবাহপদ্ধতি সমাজে শিকড় গাড়িতে পারিয়াছে।

জোড়পরিবারে বিবাহবন্ধন অনেকটা শিথিল ছিল। এই ব্যবস্থায় পুরুষ কিম্বা স্ত্রী যে কেহ ইচ্ছা করিলেই সহজে পারিবারিক কেন্দ্রটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। একপত্নী-(পতি)-ত্বের ব্যবস্থায় বিবাহ ভাঙা তত সহজ নয়। তবে মোটের উপর একমাত্র পুরুষেরই এই অধিকার আছে। এমন কি ফরাসী আইন "কোড নেপোলিয়নে"র বিধানেও পুরুষ উপপত্নী রাখিতে অধিকারী। উপপত্নীদিগকে নিজ পরিবারের ভিতর না আনিলেই হইল। কিন্তু কোন স্ত্রী যদি তাহার সাবেক কালের স্বাধীনতা

কিছুমাত্র ভোগ করিতে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে সমাজে এবং আইনে তাহার সাজা হয় প্রচুর।

হোমারের গ্রীক্ সমাজ

একপত্নী-(পতি)-ত্বের ব্যবস্থায় নারীর দুর্গতি হইয়াছে যথেষ্ট। প্রাচীন গ্রীক্ সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কার্ল মার্ক্‌স্ গ্রীক্ পুরাণ সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"গ্রীক্ দেবীগণের ইতিহাসে দেখিতে পাই তাহারা কোনো অতীতকালে যোনি-সম্ভোগ বিষয়ে বেশ স্বাধীন ছিল। এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জৎ ভোগও তাহাদের জুটিত অনেক। কিন্তু বীরযুগের নর-নারীর কার্য্যকলাপে দেখা যায় যে পুরুষেরা স্ত্রীদিগের উপর অধিকার পাইয়া বসিয়াছে। গোলাম-প্রথার ফলেও নারীর ইজ্জৎ যার-পর-নাই অবনত হইয়াছে।"

"অদিসি" গ্রন্থে তেলেমাখস নিজ জননীকে গালাগালি করিয়া বে-ইজ্জৎ করিয়াছে। কবি হোমারের বৃত্তান্তে জানিতে পারি যে, লড়াইয়ের দখল-করা মেয়েরা বিজেতা সেনাপতিদের ভোগ্যা বিবেচিত হইত। পল্টনের নায়কেরা নিজ নিজ পদ ও খেতাব অনুসারে সুন্দরী ভোগের অধিকারী ছিল। এই ধরণের একটা দখল-করা মেয়ে লইয়াই আখিলেশ এবং আগামেম্নন তকরার সুরু করে। সেই তকরারই গোটা "ইলিয়াদ" কাব্যের খুঁটা।

যখনই হোমার কোনো হোমড়াচোমড়া যোদ্ধার নাম করিয়াছেন তখনই তিনি সেই সঙ্গে তাহার ভোগ্যা দাসী এবং ভোগ-শয্যার কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সকল

সুন্দরীরা অনেক সময়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে তাহাদের মুল্লুকে পর্য্যন্ত গিয়াছে। নাট্যকার এস্‌খিলসের রচনায় জানা যায় যে, আগামেম্নন দাসী কাসান্ড্রাকে স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপ যোনি-সংসর্গে যে পুত্র উৎপন্ন হইত তাহারা কিছু কিছু বাপের সম্পত্তি পাইত। তাহাদিগকে গোলাম বিবেচনা করা হইত না। উপপত্নীর বিরুদ্ধে আসল পত্নীরা কিছুই বলিতে পারিত না। তাহাদিগকে সবই নীরবে সহ্য করিতে হইত অবশ্য পত্নীরা আবার নিজ সতীত্ব বজায় রাখিতে বাধ্যই ছিল।

পরবর্ত্তী কালের সভ্যতার যুগে গ্রীক্ নারীর দুর্গতি আরও বেশী ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই হোমারীয় সাহিত্যের বীরযুগে নারী মান্ধাতার আমলের স্বাধীনতার তুলনায় নেহাৎ নগণ্য জীবন চালাইত। তাহার স্বামীর বিচারে এবং আইনের চোখে সে প্রধানা পত্নী মাত্র,—অথবা উত্তরাধিকারীদের জননী মাত্র বিবেচিত হইত। পরিবারের ঘরকন্না, দাসদাসী ইত্যাদির উপর তাহার কর্ত্তামি চলিত এই যা। এই দাসীদের ভিতর হইতে আবার স্বামী যখন তখন যাহাকে তাহাকে খোলাখুলি ভাবে উপপত্নী রূপে বাছিয়া লইত।

জোড়-পরিবার ভাঙিয়া যাইবার যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে এক-পতিত্বই কায়েম হইয়াছে। এক-পত্নীত্ব কোথাও দেখা যায় না। পরিবারের ভিতর দাসী—"কেনা গোলাম" নারী—থাকার দরুণ প্রত্যেক কর্ত্তাই অতি সহজে উপপত্নী ভোগ করিয়া আসিতেছে। যেদিন হইতে গোলাম-প্রথা দেখা দিয়াছে সেই দিন হইতে নারী—বিবাহিতা স্ত্রী—মোটের উপর এক-পতিত্বের'আইন মানিতে বাধ্য হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ আইনতঃ এবং মুখে মুখে এক-পত্নীক থাকিয়াই কার্য্যতঃ বহু-পত্নীক রহিয়াছে। পারিবারিক গঠন, বিবাহপদ্ধতি এবং যোনিসংসর্গের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময় সমাজে দাসত্ব-প্রথার প্রভাব তলাইয়া দেখা আবশ্যক।

স্পার্টা ও আথেন্স

পরবর্ত্তী কালের গ্রীক্ সমাজের কথা বুঝিতে হইলে ডোরীয় এবং য়োনীয় এই দুই সমাজের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতে হইবে। ডোরীয় জাতির পীঠস্থান স্পার্টা। হোমার বিবৃত রীতিনীতি অপেক্ষা স্পার্টার রীতিনীতি অনেক পুরাণো। ডোরীয় সমাজে একপত্নী-(পতি)-ত্বে দেখা দেয় নাই বলা যাইতে পারে। সেখানে চলিতেছিল জোড়-পরিবার এবং এমন কি অনেকটা প্রাচীনতম কালের দলগত বিবাহপদ্ধতি অর্থাৎ বহু-পত্নীত্ব এবং বহু পতিত্ব।

বিবাহের পর সন্তান জন্ম সম্বন্ধে কোনো শারীরিক বিঘ্ন ঘটিলে বিবাহ রদ করা হইত। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬৫০ অব্দে রাজা আনাক্সান্দ্রদাস প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান হওয়ায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। একসঙ্গে চলিতেছিল দুই পরিবার। সেই সময়ে রাজা আরিষ্টন প্রথম দুই পত্নীই নিঃসন্তান ছিল বলিয়া তাহার তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করিয়াছিল।

স্পার্টায় কয়েক ভাইয়ে মিলিয়া এক নারী ভোগ করিতে পারিত। কোনো বন্ধুর পত্নী কাহারও পছন্দ হইলে সে তাহাকে নিজ পত্নীরূপে ব্যবহার করিত। আসল স্বামী আপত্তি করিত না। স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক, স্বাধীনই হউক বা

গোলামই হউক,স্পার্টার পুরুষেরা শারীরিক শক্তিশালী যে কোনো লোককে তাহাদের স্ত্রীভোগের অধিকার দিতে অভ্যস্ত ছিল।

জার্মাণ পণ্ডিত শ্যেমন প্রণীত "গ্রীক্ প্রতিষ্ঠান" বিষয়ক গ্রন্থে যোনি-সম্ভোগ বিষয়ে আরও গভীরতর স্বাধীনতার প্রমাণ আছে। এক ব্যক্তি কোনো বিবাহিতা নারীর সঙ্গে ভোগের ইচ্ছা জানাইলে নারী তাহার স্বামীর নিকট পুরুষকে ভিড়াইয়া দিয়াছিল। প্লুটার্ক এই গল্প প্রচার করিয়াছেন। স্বামীর অজ্ঞাতে পরপুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্পার্টার নারী মহলে ঘটিত না—ঘটিবার দরকারই হইত না।

অপর দিকে স্পার্টা-সমাজের আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। এখানে পরিবারের ভিতর দাসদাসী বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না। "হেলট"রা কর্ত্তার জমিজমার উপর স্বতন্ত্র-ভাবে বসবাস করিত। কাজেই উপপত্নীর প্রথা ডোরীয় সমাজে গড়িয়া উঠে নাই।

মোটের উপর স্পার্টায় নারীর ইজ্জৎ খুব উঁচু ছিল। অন্যান্য গ্রীক্ সমাজে এই ইজ্জৎ জানা ছিল না। বস্তুতঃ স্পার্টা-নারী এবং আথেন্সের "হেতেরে" নামক বারাঙ্গনা সম্বন্ধে সেকালের গ্রীকেরা যথেষ্ট সুমত প্রকাশ করিত।

য়োনীয় সমাজের পীঠস্থান ছিল আথেন্স। এখানকার আদব-কায়দা ছিল স্পার্টা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। মেয়েরা শিখিত সূতা কাটিতে, বুনিতে এবং শেলাই করিতে। কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখিত। তাহারা একপ্রকার "অবরোধে"ই জীবন যাপন করিত। বড় জোর অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাহাদের মেলামেশা চলিত।

মেয়েদের মহল ছিল বাড়ীর ভিতরকার একটা স্বতন্ত্র বিভাগ। হয় দোতালায় না হয় পেছন দিকে থাকিত "অন্দর"। পুরুষদের বিশেষতঃ অতিথিদের সেই মহলে ছিল "প্রবেশ নিষেধ"। বস্তুতঃ পুরুষ অতিথি দেখা করিতে আসিলে আথেন্সের গৃহস্থ-নারীরা অন্দরের আড়ালে চলিয়া যাইত। ঘরের বাহিরে যাওয়া মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। রাস্তায় দাসী চলিত সঙ্গে। ঘরের ভিতর তাহাদের উপর শাসন ছিল খুব কড়া।

নাট্যকার আরিষ্টফোনিস্ বলেন, আথেন্সের মেয়েদেরকে সুশাসনে রাখিবার জন্য অন্দরে মোলোস দেশের কুকুর রাখা হইত চৌকি দিতে। কুকুরের ভয়ে কোনো পরপুরুষ অর্থাৎ অপরিচিত লোকে মেয়েদের সঙ্গে একত্র হইতে পারিত না। কাজেই মেয়েদের সতীত্ব বাঁচিয়া যাইত। এসিয়া মাইনরের য়োনীয় সমাজে হিজরা নপুংসক থাকিত মেয়েদের পাহারায়।

স্বভাবজ নপুংসক জুটানো সহজ নয়। কাজেই কৃত্রিম কৌশলে নপুংসক তৈয়ারি করিয়া লওয়া আথেনীয় সমাজে একটা ব্যবসাবিশেষ ছিল। ঐতিহাসিক হেরোদোতাস সেই ব্যবসা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল নপুংসক গ্রীসে ত কাজে লাগিতই,— গ্রীসের বাহিরেও বিদেশী সমাজে কৃত্রিম হিজরার চল ছিল।

গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদেস স্ত্রী জাতিকে "অয়কুরেমা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। শব্দটা ক্লীবলিঙ্গ। নারী "বস্তু" বিশেষ, ব্যক্তি নয় এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঘরকন্না, গৃহস্থালী ইত্যাদির জন্য এই বস্তুটা কাজে লাগে। সন্তান [illegible] ইহার প্রধান কাজ। দ্বিতীয় কাজ বাড়ীঘর [illegible] অর্থাৎ দাসীগিরি করা।

পুরুষ শারীরিক কুস্তি কসরত করিত। মেয়েদের তাহাতে কোনো যোগ দিবার এক্তিয়ার ছিল না। পুরুষেরা সভা করিত, বৈঠকে বসিত, গোষ্ঠীতে আড্ডা মারিত। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষেরা এক সঙ্গে এই সকল সভায় কোনো অনুষ্ঠান চালাইত না।

পুরুষের তাঁবে দাসী থাকিত। আথেন্সের চরম উন্নতির যুগে বেশ্যাবৃত্তি সমাজে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই পেশা কুনজরে দেখিত না। এই বেশ্যাবৃত্তির প্রভাবেই "হেতেরে" প্রথা দেখা দেয়। "হেতেরে" জগতে এক অদ্ভুত বারাঙ্গনা প্রথা। প্রাচীন দুনিয়ার আর কোথাও বারাঙ্গনা আথেন্সের মতন কলা বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিতে পারে নাই।

গ্রীক্ সমাজে স্পার্টার নারী ছিল স্বাধীনতায়, দেমাকে এবং চরিত্রে প্রসিদ্ধ। আথেন্সের "হেতেরে"রা শিল্প ও সভ্যতার সকল অঙ্গে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন না করিলে কেহ এই সকল গুণ অর্জ্জন করিতে পারিত না। এই তথ্য হইতেই আথনিয় সমাজে নারীর দুর্গতি বুঝিতে হইবে। সেখানে নারীত্ব অপেক্ষা বেশ্যাবৃত্তিই ছিল উচ্চদরের বস্তু।

আথেন্সের পারিবারিক প্রথাই পরবর্ত্তীকালে য়োনীয় সমাজের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। গ্রীসের অন্যান্য সমাজও ক্রমে আথেন্সের অনুকরণ করিতে অগ্রসর হয়। অন্দর মহলের বিধান, অন্তঃপুর, অবরোধ ইত্যাদি এই পারিবারিক প্রথার আসল কথা।

কিন্তু গ্রীক্ নারীদিগকে সর্ব্বদাই পাহারা দিয়া অন্দর-মহলে রাখা সম্ভবপর হইয়াছিল কি? কখনই না। স্বামীদিগকে

ঠকাইবার বিস্তায় তাহারা পাকিয়া উঠিয়াছিল। ঠকাইবার সুযোগও জুটিত অনেক। পুরুষেরা "হেতেরেদের" সঙ্গে প্রেমে মজিত। মেয়েরা সতী সাজিয়া গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিত না।

প্রাচীন দুনিয়ার সভ্যতম, প্রাচীন ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষশীল দেশে একপতি-(পত্নী)-ত্বের জন্মকথা এই। ব্যক্তিগত প্রেম, কোনো পুরুষের প্রতি নারীর টান অথবা নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা—ইত্যাদি বলিলে বর্ত্তমান যুগে যাহা কিছু বুঝায় এখানে তাহার নামগন্ধও নাই। বরং উল্টা বলিলেই ঠিক বুঝা যাইবে।

সাবেক কালে অর্থাৎ "উৎকর্ষের" যুগের পূর্ব্বে নর-নারীর মিলনে অন্ততঃ পক্ষে একটা স্বাভাবিক যোগাযোগ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। আবার যৌনি-সম্ভোগের আমলে যে যাহাকে চায় সে তাহাকে সহজেই পাইত এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন নয়। কিন্তু এই প্রকৃতি-সুলভ স্বাভাবিক মেলামেশা "বার্ব্বার" যুগেব শেষে লোপ পাইয়াছে। উৎকর্ষের আমলে যে যোনি-সংশ্রবেব ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে তাহাতেই মানুষ সর্ব্বপ্রথম স্বাভাবিক টানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কৃত্রিম বন্ধনের আয়োজন করিয়াছে। সেই কৃত্রিম সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ধন-দৌলত বা সম্পত্তি ভোগের তরফ হইতে। একপতি-(পত্নী)-ত্বের বিধানে পারিবারিক প্রথা আর্থিক টানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় মান্ধাতার আমলের প্রাকৃতিক যৌথ-সম্পত্তির পরাজয় ঘোষিত হইতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নিজস্বজ্ঞান, স্বত্ব ইত্যাদির ধারণায় বিজয়-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবাধ-যৌনি সংসর্গের এবং স্বাধীন প্রেমের ঠাইয়ে একপতি-(পত্নী)-ত্ব

এবং তাহার জুড়িদার নারীর গোলামী ও দুর্গতি উৎপন্ন হইয়াছে।

গ্রীকরা খোলাখুলি বলিত:—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" পরিবারের কর্ত্তা পুরুষ। সন্তান-সন্ততিরা বাপের বংশ রক্ষা করিবে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে—ইহাই বিবাহের লক্ষ্য। এই বুঝিয়াই পারিবারিক প্রথা কায়েম করা দরকার।" অধিকন্তু গ্রীক্ চিন্তায় বিবাহ, পারিবারিক জীবন, একপতি-(পত্নী)ত্ব-সবই দেবতার প্রতি কর্ত্তব্য পালনের—"দেব-ঋণের" সামিল ছিল।—দেব-ঋণ মাত্র নয় এ একটা রাষ্ট্র-ঋণ (দেশ-ঋণ) এবং পিতৃ-ঋণও—বিবেচিত হইত। এই কর্ত্তব্য-পালন অথবা ঋণ-শোধ না করিয়া কোনো গ্রীক্ স্বোয়াস্তি পাইত না। আথেন্সে বিবাহ করা আইনের বিধান ছিল—অর্থাৎ বিবাহ না করিলে সাজা হইত। অধিকন্তু সন্তান পয়দা করাও মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আইনে পরিগণিত হইয়াছিল।

বারাঙ্গনার উৎপত্তি

একপতি-পত্নী-ত্বকে স্ত্রীপুরুষের একটা আপোষ বিবেচনা করা চলে না। ইহাকে বিবাহ-পদ্ধতির উচ্চতম রূপ বলিয়া গণ্য করাও সম্ভব নয়। বরং উল্টাই ঠিক। পুরুষ-নারীর লড়াই সুরু হইয়াছে এই ব্যবস্থায়। নারীর গোলামী ত ঘটিয়াছেই।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মার্কসের সঙ্গে একত্রে আমি একটা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধটায় নিম্নলিখিত মত প্রচারিত হইয়াছে,—"জগতে সর্ব্ব প্রথম শ্রম বিভাগ দেখা দিয়াছিল স্ত্রী-পুরুষের সন্তানের জন্ম ও পালন লইয়া।" আজ তাহার সঙ্গে

জুড়িয়া দিতেছি:—"জগতে শ্রেণীগত লড়াইয়ের প্রথম ঘটনা ঘটিয়াছিল একপতি-পত্নী-ত্বের পারিবারিক কেন্দ্রে,—পুরুষ-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারই প্রথম শ্রেণীগত নির্য্যাতন।" দুনিয়ার ইতিহাসে একপতি-পত্নী-ত্ব এক বিপুল উন্নতির দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব-সমাজে প্রত্যেক সুঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলা কু আসিয়া জুটিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত একপতি-পত্নী-ত্বের সু-কু এক সঙ্গে চলিতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং গোলামী এই দুই প্রথা বাদ দিয়া উৎকর্ষের যুগের বিবাহ-পদ্ধতি বিকশিত হইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক স্তর-পরম্পরাগুলিব দিকে নজর দিলে মানুষের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতির ভিতর দলাদলি, দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতে হইবে।

জোড়-পরিবার এবং একপতি-পত্নী-ত্ব জগতে দেখা দিবার পর মান্ধাতার আমলের অবাধ-যোনি-সংসর্গ মানব-সমাজ হইতে এক-দম উঠিয়া গিয়াছে কি? না। মর্গ্যান বলেন:—"সেই অবাধ-যোনি-সংসর্গ এখনো চলিতেছে। "পুণালুয়া" মতের পরিবার আর নাই বটে। কিন্তু আধুনিক পরিবারকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে "হেতেরে" প্রথা।"

"হেতেরে" প্রথা সম্বন্ধে মর্গ্যান এক বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। একপতি-পত্নী-ত্বের প্রথায় স্বামীরা নিজ নিজ পরিবারের বাহিরের কুমারী ভোগ করিতে অভ্যস্ত। এই কুমারীরা "হেতেরে।" খাটি বেশ্যা বলিলে যাহা বুঝায় "হেতেরে" ঠিক তাহা নয়। তবে "হেতেরে" হইতে বেশ্যাবৃত্তির উৎপত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়।

মর্গ্যানের মতে "হেতেরে" প্রথা সাবেক কালের দলগত বিবাহের অর্থাৎ বহু-পত্নীত্ব এবং বহু-পতিত্বের শেষ চিহ্ন। অবাধ-যোনি-সম্ভোগের উপর নিষেধ জারি হইবার সময় সমাজের স্মৃতিকারেরা প্রাচীন বা সনাতন ধর্ম্মকে একদম তুলিয়া দিতে সাহসী হয় নাই। তাহারা "ন দোষো অমুক বয়সে," অথবা "ন দোষো অমুক স্থানে". ইত্যাদি ব্যতিরেকের বিধান করিয়াছিলেন।

দেবতার মন্দিরগুলি ছিল সেই সব বতিরেকের কেন্দ্র। অর্থাৎ দেব-সেবার উপলক্ষ্যে দেব-গৃহের চৌহদ্দির ভিতর নারীরা অবাধ-সম্ভোগের অধিকার পাইত। পুরুষেরা কুমারীদিগকে ভোগ করিবার জন্য দক্ষিণা দিত। সেই দক্ষিণা মন্দিরের তহবিলে মোহান্তের জিম্মায় থাকিত। মন্দিরগুলি—দেবতার স্থানই জগতের সর্ব্ব-প্রথম এবং সর্ব্ব-প্রাচীন বেশ্যালয়।

আর্ম্মেনিয়া দেশের আনাইতিস্ দেবতার "হিরোডুলে" দাসীরা জগতের সর্ব্ব-প্রথম বেশ্যা। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত কোরিন্থের আফ্রোদিতে-দেবীর দাসীগণ। ভারতীয় মন্দিরে "বায়াদেরে"ও সেই আদিম বেশ্যা-শ্রেণীরই বংশধর। পর্ত্তুগীজ ভাষায় "বায়াদেরে" শব্দের অর্থ নর্ত্তকী।

এই ধরণের "দেবদাসী" হওয়া প্রথম প্রথম সকল নারীরই স্বধর্ম্ম বিবেচিত হইত। পরে মন্দিরের পূজারিণীরা স্বধর্ম্ম পালনে একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। ইহারা "যথা নাম গোত্র" হিসাবে দুনিয়ার নারী-জাতির প্রতিনিধি রূপে দেবালয়ের আওতায় বেশ্যা-বৃত্তি চালাইয়া থাকে।

অন্যান্য সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীরা "হেতেরে" বৃত্তি

অবলম্বন করে। এও সেই দলগত বিবাহ পদ্ধতিরই জের। তবে বিকাশটা অন্য পথে। অবাধ-যোনি-সম্ভোগ রকমারি রূপে জগতে টিকিয়া রহিয়াছে।

"বার্ব্বার" যুগের শেষ অবস্থায় মজুরী-প্রথা দেখা দেয়। অর্থাৎ বেতন দিয়া স্বাধীন শ্রমজীবি খাটানো হইত। তখন এক সঙ্গে গোলামী এবং স্বাধীন মজুরী—দুই-ই সমাজে প্রচলিত ছিল। ঠিক এই দুই শ্রেণীর পুরুষের অনুরূপ দুই শ্রেণীর নারীও দেখা দেয়। গোলাম নারীকে কর্ত্তারা বিনা আপত্তি ওজরে ভোগ করিতে অধিকারী ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাজারের বেশ্যা নামক নারীর উৎপত্তি হয়। তাহারা বেতন-ভোগী মজুরদের মত দেহ বিক্রী করিয়া অন্ন সংস্থান করিত। উৎকর্ষের যুগের সম-সম কালে দেহ-বিক্রেতা নারী-সমাজের,—অর্থাৎ "হেতেরে"-প্রথার এক নবীন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"উৎকর্ষ" বস্তুটা একটানা সোজা সরল রেখায় উন্নতির বিন্যাস নয়। এ এক জটিলতাময় দ্বন্দ্বে-ভরা দুমুখো ধরণের জীবন বিকাশ। যে মুহূর্ত্তে এক-পতি-পত্নী-ত্বের জন্ম সেই মুহূর্ত্তেই "হেতেরে" এবং তাহার চরম পরিণতি বেশ্যাবৃত্তি জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানব-সভ্যতার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতন "হেতেরে"-প্রথা এবং বেশ্যাবৃত্তিও সমাজেরই এক সনাতন "আবিষ্কার"। মানুষেরা মান্ধাতার আমলের অবাধ-যোনি-সম্ভোগ এক দুয়ারে বন্ধ করিয়া সেইটাই আর এক দুয়ারে খুলিয়া দিয়াছে!

"হেতেরে"মি বা বেশ্যাগিরি আজকাল মুখে মুখে সকলেই নিন্দা করে বটে কিন্তু পুরুষেরা সকলেই ইহা পছন্দ করে,

বিশেষতঃ পয়সাওয়ালারা। বিপদে পড়িয়াছে মাত্র নারীরা। কলঙ্কের ষোল আনা ইহারা ভোগ করিতে বাধ্য। ইহাদের কলঙ্কের জন্য পুরুষেরা ত দায়ী বটেই কিন্তু সে কথা মনে না রাখিয়া ইহারা বেশ্যাকে সমাজে একঘরে করিয়া রাখিয়াছে। নারীর উপর পুরুষের এ এক বিচিত্র জুলুম। একমাত্র "উৎকর্ষের" যুগেই এই জুলুম সম্ভবপর হইয়াছে।

একপতি-পত্নী-ত্বের ব্যবস্থায় এই গোল এক সামাজিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ। আর এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব এই ধরণের পারিবারিক কেন্দ্রে জমিয়া উঠিয়াছে। মান্ধাতার আমলে সেই সামাজিক বিরোধ দেখা যাইত না। "উৎকর্ষে"র যুগের স্বামীরা বিবাহিতা পত্নীকে ঘরে রাখিয়া বাহিরে যাইয়া "হেতেরে"-প্রেমে মজিতেন। সেই সুযোগে পত্নীরা পরপুরুষের সঙ্গে গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হইত; প্রায় পরিবারেই এইরূপে নারীর কম পক্ষে একজন করিয়া "বাঁধা প্রেমভাজন অতিথি" দেখা যায়।

পরপুরুষে আসক্তি বর্ত্তমান নারীর এক স্বধর্ম্ম। ইহা নিন্দনীয় বটে এবং চরম মাত্রায় নিন্দিত হয়ও বটে। কিন্তু এক-পতী-পত্নী-ত্ব এবং "হেতেরে"-প্রথা যেমন "উৎকর্ষের" যুগের "সভ্য" মানবের আবিষ্কার, পরপুরুষের প্রেমও সেইরূপ বর্ত্তমান জগতের এক সুপ্রচলিত প্রতিষ্ঠান। এই তিনই পরস্পর সম্বদ্ধ। একটার সঙ্গে আর একটা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাজেই জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ত্তমান "সভ্য" সমাজে সন্তানের "জনক" সম্বন্ধে কোনো কথা জোর করিয়া বলা যায় কি? না। জননী সম্বন্ধে মান্ধাতার আমলে যেমন আজও তেমন কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু জনক কে? মান্ধাতার আমলের লোক

স্পষ্টাস্পষ্টি বলিত—"জানি না।" কিন্তু "উৎকর্ষে"র যুগে মানুষ চোখ খুলিয়া কথা বলিতে প্রস্তুত নয়। সে একটা "রফা" করিয়াছে।

রফাটা দেখিতে পাই ফরাসী আইন "কোড নেপোলিয়নে।" এই বিরাট স্মৃতি-গ্রন্থের ৩১২ নং ধারায় প্রচারিত হইয়াছে:— "বিবাহিত অবস্থায় নারীর গর্ভে সন্তান হইলে তাহার জনক বিবেচিত হইবে নারীর স্বামী।" তিন হাজার বৎসর ধরিয়া দুনিয়ায় এক-পতি-পত্নী-ত্ব চলিতেছে। তাহার চরম আবিষ্কারই এই। অর্থাৎ পরিবারের ভিতরেই "হেতেরে"মি এবং বেশ্যাবৃত্তি চলিতেছে। সেই দিকে চোখ বুজিয়া থাকাই সভ্যতার লক্ষণ এবং বুদ্ধিমানের কাজ।

সভ্যতার যুগে গোটা সমাজে যে সকল দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহার সকলগুলিই এক-পতি-পত্নী-ত্বের পারিবারিক ক্ষেত্রে মজুত। শ্রেণীগত লড়াই, মনিব-গোলামের লড়াই, সতী-বেশ্যা বিরোধ, সু-কু সবই পরিবারের ভিতর একসঙ্গে চলিতেছে। নারীকে বাঁদী করিয়া পুরুষ মানব-সমাজকে বেশী কিছু উন্নত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে না।

রোমাণ ও জার্ম্মাণ

এতক্ষণ গ্রীক্-সমাজের কথা বলা হইতেছিল। কিন্তু গ্রীক্ ছাঁচের পারিবারিক প্রথা, কড়াক্কড় ভাবে জগতের সর্ব্বত্র প্রকটিত হয় নাই। রোমের কথা ধরা যাউক। রোমাণরা গ্রীক্‌দের মতন সু-মার্জ্জিত জাতি ছিল না বটে। কিন্তু বিশ্ব-বিজয়ের গুণ লাভ করায় তাহাদের চিন্তায় দৃঢ়তা ও তীক্ষ্ণতার অভাব ছিল না।

মেয়েদের উপর জীবন-মরণের অধিকার পুরুষেরা ভোগ করিত। পরপুরুষে আসক্তি নিবারণ করিবার জন্য তাহারা নারীগণকে এই উপায়ে শাসন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। কিন্তু অপর দিকে মেয়েরা পুরুষের মতনই স্বেচ্ছায় বিবাহ রদ করিতে অধিকারী ছিল। কাজেই রোমাণ সমাজে নারীর ইজ্জৎ গ্রীক্ সমাজ অপেক্ষা বেশী থাকিবারই কথা।

প্রাচীন জার্ম্মাণেরা যখন ইতিহাসে দেখা দেয় তখন তাহারা পুরাপুরি এক-পতি-পত্নী-ত্ব গ্রহণ করে নাই। তখনও তাহাদের সমাজে জোড়-পরিবার চলিতেছিল। ল্যাটিন ঐতিহাসিক তাসিতুসের বিবরণে এই সম্বন্ধে তিনটা তথ্য জানা গিয়াছে। প্রথমতঃ জার্ম্মাণরা একটী স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত এবং স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে তাহাদের নজরও তীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু হোমড়া চোমড়া জন-নায়ক-গণ বহু-পত্নীকতা ভোগ করিত। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজের জোড়-পরিবার প্রথায়ও এইরূপ দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—জননী-বিধি তখন উঠিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পুরুষের আমল, বাপের নামে বংশ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি তখনও সমাজে বেশী দিনকার জিনিষ নয়। কারণ মায়ের ভাইকে—মামাকে জার্ম্মাণেরা তখনকার দিনে এমন কি বাপের চেয়েও বেশী আত্মীয়ই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত ছিল। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজেও এই রীতি। বস্তুতঃ, কার্ল মার্কস্ ইণ্ডিয়ান প্রথা দেখিয়াই প্রাচীন জার্ম্মাণ সভ্যতার চাবী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন।

তৃতীয়তঃ—জার্ম্মাণ নারীরা যারপরনাই সম্মানিত হইত।

জনসাধারণের কাজকর্মে তাহাদের হাত ছিল। পুরুষের প্রাধান্ত নিয়ন্ত্রিত একপতি-পত্নী-ত্বের ব্যবস্থায় এইরূপ সম্ভব নয়।

সকল তরফ হইতেই জার্ম্মাণদিগকে স্পার্টার ডোরীয় সমাজের জুড়িদার বিবেচনা করা চলে। স্পার্টার সমাজও জোড়-পরিবারের স্তর ছাড়াইয়া বেশী দূর উঠে নাই। কাজেই জার্ম্মাণরা মানব-সমাজে দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসে একদম একটা "নতুন কিছু" প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে।

রোমাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতির ভিতর মিশিয়া জার্ম্মাণরা একপতি-পত্নী-ত্বের ব্যবস্থাকে খানিকটা মোলায়েম করিয়া তুলিল। নারীর ইজ্জৎ তাহার প্রভাবে খানিকটা অন্ততঃ পক্ষে বাঁচিয়া গিয়াছে। আথেন্সে রোমে নারীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে নাই সেই স্বাধীনতার বিকাশ রোমাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর জার্ম্মাণ আওতায় ঘটিয়াছে। এই যুগেই প্রথম বর্ত্তমান জগৎ সুলভ "ব্যক্তিগত প্রেম" মানব-সমাজে প্রকটিত হয়।

জার্ম্মাণ প্রভাবে নারীর দুর্গতি কিছু কমিয়াছে এবং ব্যক্তিগত ভালবাসার যুগ দেখা দিয়াছে। এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, জার্ম্মাণ চরিত্রে কতকগুলি তথা-কথিত সদ্‌গুণ ছিল। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, জার্ম্মাণরা তখনও একপতি-পত্নী-ত্বে অভ্যস্ত হয় নাই। জোড়-পরিবারের ব্যবস্থায় যতখানি অবাধ-যোনি-সম্ভোগের সুযোগ থাকে তাহার ফলে নারীর স্বাধীনতা কথঞ্চিৎ বাঁচিয়া যায়। জোড়-পরিবারের স্বভাবগুলি রোমাণ বিধানের সমাজে মিশিবার ফলে নারীর ইজ্জৎ কিছু কিছু বাঁচিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণসাগরের দিকে যে সকল জার্ম্মাণ নরনারী বস্তি গাড়িতে-

ছিল তাহাদের সমাজে এই বিকাশ দেখা যায় না। তাহারা "ষ্টেপ" নামক লম্বা ঘাস-বহুল ময়দানে ঘোড়সওয়ারি করিতে করিতে সেখানকার অধিবাসীদের কতকগুলি কু-স্বভাব গ্রহণ করিয়াছিল। থাইফালি জাতি সম্বন্ধে আমিয়ানুষ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রোকোপের মতে হেরুলি জাতিও এইরূপ ছিল।

ব্যক্তিগত ভালবাসা একপতি-পত্নী-ত্বের ব্যবস্থায় গজিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু পুরুষ নারী উভয় পক্ষের পরস্পর প্রেমের ফলে এই পারিবারিক প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে এ কথা সত্য নহে। বরং ঠিক উল্টা। সমানে সমানে ভালবাসা এই ব্যবস্থায় বাধাই পড়িয়াছে বলিতে হইবে।

জগতের সকল দেশেই আমীর-ওমরাহ ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র সমাজে বিবাহের ব্যবস্থা পুরুষ এবং নারী আপ্‌সে আপ করে না। বাপ-মারা এই বিষয়ে অধিকারী। জোড়-পরিবারের আমলে যে নীতি ছিল পুরুষ-প্রধান একপতি-পত্নী-ত্বের আমলেও সেই নীতিই চলিয়াছে।

খাঁটি ব্যক্তিগত ভালবাসা অর্থাৎ পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষের যোনিগত টান বর্ত্তমান জগতে দেখিতে পাই কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে? মধ্যযুগের যোদ্ধা, বীর এবং "ক্ষত্রিয়" সমাজে। কিন্তু ইহাদের ভালবাসা বিবাহিত প্রেম নয়। বিবাহিত প্রেমের ব্যতিরেকই ছিল সেই সমাজের সুপ্রচলিত ব্যক্তিগত টান।

ফ্রান্সের দক্ষিণ পূব অঞ্চলের প্রোভেন্সাল সমাজ মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিশেষ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ব্যক্তিগত

প্রেমের ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। পর-পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা নারীর পিরীত ছাড়া সেই প্রেমটা আর কিছুই নয়। কবিরা সেই "পরদার গমন" আর পর-পুরুষে আসক্তিই উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন। "পরকীয়া"দের কীর্ত্তিই সেই সাহিত্যের মদ।

সেকালের কবিদিগকে "আল্‌বা" বলিত। ক্ষত্রিয়-বীর রাত্রিকালে একজন বিবাহিতা নারীর সঙ্গে প্রেম করিতেছেন। বাহিরে চৌকিদার সকাল হয় হয় সময়ে তাঁহাকে জাগাইয়া দিতেছে। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে বীর পলাইয়া যাইতেছেন! ছাড়াছাড়ির সময়টা অতি বিষাদাত্মক এই ছিল "আল্‌বা" পদাবলীর "মুদ্দা"।

উত্তর ফ্রান্সের কবিরা এবং জার্ম্মাণির গায়করাও এই ধুয়া লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এই ধরণের তিনটা গান—যদিও দিনের বেলার জন্য রচিত—এশেনবাখের গ্রন্থাবলীর ভিতর পাই। তিনি তিনটা বড় বড় জার্ম্মাণ কাব্যগাথা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আল্‌বা-পন্থী গানগুলিই সরেস!

পুরুষ-নারীর অসাম্য

আজকালকার দিনে ইয়োরোপে দুই রীতির বিবাহ চলিতেছে। ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী সমাজে বাপ-মারাই ছেলের জন্য ক'নে চুঁড়িয়া আনে। ফল দাঁড়ায়, স্বামী হয় "হেতেরে"-ভক্ত আর স্ত্রী হয় অনুরক্ত পরপুরুষে। ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিধানে বিবাহ রদ করা সম্ভব নয়। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ধর্ম্মের কর্ত্তাদের বিবেচনায় মৃত্যু হইতে মানুষকে বাঁচান যেমন অসম্ভব সেইরূপ বেশ্যাসক্তি, পরপুরুষে আসক্তি অথবা পরস্ত্রী-

গমন হইতেও নর-নারীকে আটকাইয়া রাখা অসাধ্য; কাজেই "ডাইভোর্স" মঞ্জুর না করিলেও লোকসান নাই।

ধর্ম্মসংস্কারের ফলে কোন কোন ইয়োরোপীয় সমাজে—অর্থাৎ প্রটেষ্টাণ্ট মতের খৃষ্টান সমাজে ভদ্র ঘরের ছেলেরা খানিকটা স্বাধীনভাবে পাত্রী পছন্দ করিবার সুযোগ পায়। কাজেই কিছু কিছু ব্যক্তিগত ভালবাসা এই সমাজে প্রচলিত আছে এ কথা অস্বীকার যায় না। কিন্তু আসল ভালবাসা থাকুক বা না থাকুক, পুরুষ এবং স্ত্রী লম্বা গলা করিয়া এই কথা সমাজে রটাইতে অভ্যস্ত। প্রটেষ্টাণ্টরা স্বভাবতই মিথ্যা প্রিয় এবং ভণ্ডামির অবতার।

যাহাহউক প্রটেষ্টাণ্ট সমাজে এই কারণে "হেতেরে" প্রথার রেওয়াজ কিছু কম। বিবাহিতা নারীরাও পরপুরুষে আসক্ত হয় কিছু কম। কিন্তু হাজার হইলেও বিবাহের ফলে মানুষের চরিত্র ত একদম বদলাইতে পারে না। বিবাহের পূর্ব্বে যুবা-যুবতীরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহার জের দেখা দেয়ই দেয়। তথাকথিত বিবাহিত জীবনের "স্বর্গ সুখ" যে কি অপ্রিয় বস্তু তাহা গোটা সমাজের সুখী পরিবারগুলা গুণিয়া দেখিলে স্পষ্টাস্পষ্টি বুঝা যায়।

ক্যাথলিক বিবাহের চিত্র বুঝিতে হইলে পড়া উচিত ফরাসী উপন্যাস আর প্রটেষ্টাণ্ট বিবাহের চিত্র দেখিতে পাই জার্ম্মাণ বিশেষতঃ বার্লিনী উপন্যাসে। দুই শ্রেণীর উপন্যাসেই দেখা যায় [illegible] নায়ক নায়িকা শেষ পর্য্যন্ত একজন "মনের মতনকে" [illegible] [illegible]। তবে এই পাওয়াটির মধ্যে একটা মজা আছে। [illegible]। এই যে জার্ম্মাণ নায়ক পায় সাধারণতঃ একটা মনের মতন

নারী। কিন্তু ফরাসী নায়কের কপালে জুটে তাহার স্ত্রীর পর-পুরুষে আসক্তি।

সাহিত্যে এই ধরণের বাঁধা চরিত্র বিন্যাস দেখিয়া দুই সমাজের যৌনিগত টানাটানের কথা সহজেই ধরিতে পারা যায়। জার্ম্মাণ ভণ্ডেরা ফরাসী উপন্যাসকে নীতিহীন অশ্লীল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি করে। এদিকে জার্ম্মাণ কাহিনীগুলা ফরাসী চিন্তায় অপাঠ্য। বার্লিনের সাহিত্যে "হেতেরে" প্রথা এবং পরপুরুষে আসক্তি ও "পরদার-গমন" এক দম আটপৌরে কথায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। আজকাল লেখকদের এই ঝোঁকটা কিছু কমিয়াছে।

কি ক্যাথলিক কি প্রটেষ্টাণ্ট দুই প্রথায়ই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সামাজিক লোকাচার এবং রীতিনীতি মাফিক্। নিজ নিজ পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের আদর্শ মাফিক্ যাহা কিছু ভাল মন্দ সেই বিচারই থাকে মাপকাঠি। ফলে দেখা যায় পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই ব্যভিচার। হৃদয়ের ভালবাসা থাকুক বা না থাকুক,—স্ত্রী স্বামীর এবং বিশেষ ভাবে স্বামী স্ত্রীর উপর ভোগসত্ত্ব দাবী করে। স্ত্রী বাজারের বেশ্যা হইতে এই কারণে মাত্র বিভিন্ন যে, তাহাকে ঘণ্টা হিসাবে টাকার জন্য দেহ বিক্রয় করিতে হয় না। সে চিরকালের জন্যই স্বামীর নিকট নিজকে বিকাইয়া দিয়াছে।

এই গেল পয়সাওয়ালা সম্পত্তিশালী ভদ্র সমাজের কথা। নিঃস্ব দরিদ্র সম্পত্তিহীনদের সমাজে যৌনিভোগ সম্বন্ধে এই ধরণের বাধ্য-বাধকতা তত বেশী নাই। ব্যক্তিগত যৌনির টান বর্ত্তমান জগতে যদি কোথাও থাকে তাহা কেবল গরীব নর-নারীর ভিতরই আছে। তবে আইনের হিসাবে এই সকল যৌনি-সংস্রব বিধি-সঙ্গত কি না সে কথা স্বতন্ত্র।

নির্ধন সমাজে যোনি-গত স্বাধীনতার উৎপত্তি হইল কোথা হইতে? ইহাদের ভিতর সম্পত্তি, ধনদৌলত, পুঁজি ইত্যাদি নাই বলিয়া। এই সব রক্ষা করিবার জন্যই জগতে পুরুষ-বিধি এবং একপতি-পত্নী-ত্ব দেখা দিয়াছিল। এইগুলি যেখানে নাই অথবা যেখানে এ সবের প্রভাব কম সেখানে পুরুষের অত্যাচার, নারীর দুর্গতি এবং যোনি-সংসর্গে বিধি-নিষেধের প্রকোপও নাই অথবা কম।

অধিকন্তু বর্ত্তমান জগতে ফ্যাক্টরি-শিল্পের প্রভাবে মেয়েরা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া কাজকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই ঘরের মমতা, বাস্তু-ভিটার আধিপত্য, পুরুষের প্রতাপ এবং একপতি-পত্নী ত্বও মজুর মহলে গজিতে পারে নাই।

কাজেই দেখিতে পাই, "পর-দার-গমন" এবং পর-পুরুষে আসক্তি নামক তথ্য নির্ধন সমাজে বিরল। সম্পত্তিহীন নর নারীরা যথাসম্ভব আপসে আপ স্বাধীনভাবে অবাধ-যোনি-সংসর্গের নিয়ম পালন করিয়া চলিতেছে। ইহাদের বিবাহ ভাঙা অতি সহজেই সাধিত হয়। নারীর পক্ষেও ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন নয়।

আজকালকার আইনে নারীকে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যেক বিবাহেই বরকন্যা উভয়পক্ষেরই স্বাধীন পছন্দ আবশ্যক। তাহা ছাড়া বিবাহিত জীবনেও স্ত্রী-স্বামীর দায়িত্ব এবং অধিকার সমান। এই সকল কথা বর্ত্তমান জগতের সকল আইনেই স্পষ্ট দেখা যায়।

কিন্তু এই ধরণের আইন থাকা স্বত্বেও বাস্তবিক পক্ষে স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছে কি? মজুর জীবনের

কথাগুলি আলোচনা করিলে বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। আইনকারকেরা বলেন,—মজুরেরা স্বাধীনভাবে মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করিতে অধিকারী। কাগজে কলমে কর্ম্মদাতা আর কর্ম্মী স্ব স্ব প্রধান সন্দেহ নাই। আইনের হিসাবে এই যে স্বাধীনতা দেখা যাইতেছে আর্থিক হিসাবে সেই স্বাধীনতা আছে কি? কখনই না। পুঁজিজীবি এবং অন্নদাতার সঙ্গে শ্রমজীবী খোলা বাজারে দর কষকষি করিয়া নিজের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে কোনো মতেই সমর্থ হয় না। পেটের দায়ে মজুরেরা ধনপতিদিগের গোলামী করিতে বাধ্য।

ঠিক এই ধরণের গোলামীই বিবাহের বাজারে চলিতেছে। আইনে যাহা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ প্রথম স্বীকার্য্য প্রকৃত বাস্তব জীবনে তাহার টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। ধরা যাউক যেন, আইন অনুসারে পাত্র এবং পাত্রী স্বাধীনতম রূপেই নিজ বিবাহের ব্যবস্থা করিবার অধিকারী। কিন্তু আর্থিক অবস্থাগুলা কিরূপ? একটুকু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিব যে, বিবাহ বিষয়ক তথাকথিত স্বাধীনতার কিম্মৎ একদামড়িও নয়।

জার্ম্মাণিতে এবং ফ্রান্সে সন্তানসন্ততিরা জন্মের অধিকারেই কিছু কিছু পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া থাকে। তাহাদিগকে এই ধনে বঞ্চিত করিবার কোনো আইন নাই। বেশ কথা। জার্ম্মাণ এবং ফরাসী সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় কিরূপে? আইন বলিতেছে—"বর এবং কন্যা পরস্পর নিজের মত হইলেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবে।" কিন্তু বাপমার পছন্দ না হইলে তাহারা নিজের খেয়াল বজায় রাখিতে পারে কি? কোনো মতেই না। তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তি

হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। কাজেই বাপ-মার ইচ্ছা, আজ্ঞা, অনুমতিই শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী এবং জার্ম্মাণ সমাজে বিবাহ নিয়ন্ত্রিত করে।

ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় কি দেখিতে পাই? এই দুই দেশে ছেলেমেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে বাপমার মতের বা ইচ্ছার অপেক্ষা করিতে হয় না। কাজেই বিবাহ আইনতঃ স্বাধীন। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বাছাই করাও বাপমার পক্ষে স্বাধীন অধিকার। ছেলেমেয়েরা বিগড়াইয়া যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিলে বাপমারাও যে কোনো লোককে ধনদৌলত দিয়া দিতে পারে।

"ত্যেজ্য পুত্র" সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। যেখানেই ধনদৌলত, সম্পত্তি, পুঁজি, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সেখানেই বিবাহ সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা একটা কথার কথা মাত্র। অর্থাৎ নিজের পছন্দসই স্ত্রীভোগ করা এবং নিজের পছন্দসই স্বামীভোগ করা ধন-দৌলতের বর্ত্তমান আইনে কোনো পুরুষ-নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়।

বিবাহের স্বাধীনতাটাই একমাত্র "ভুয়ো" জিনিষ নয়। বর্ত্তমান জগতের আইনে নাকি পুরুষকে নারীর সমানই অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বেশী কিছু দেওয়া হয় নাই। পুরুষ-নারীর এই তথাকথিত সাম্যটাও আর এক ভুয়োমাল। আজ কালকার আইনে নারী কোনো মতেই পুরুষের সমান নয়।

এই অসাম্য একদিনের সৃষ্টি নয়। যুগ যুগান্তর ধরিয়া পুরুষ-নারীর অসাম্য চলিতেছে। আর্থিক হিসাবে নারী যে দিন হইতে পুরুষের তাঁবে আসিয়াছে সেই দিন হইতে সমাজে এবং রাষ্ট্রে

নারীকে পুরুষের অপেক্ষা হীন অবস্থায় থাকিতে হইতেছে। আইনের অসাম্য আর্থিক দুর্গতির ফল।

মান্ধাতার আমলের জাতিগত যৌথ জীবনে পুরুষরা আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিত, আর মেয়েরা লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার জিম্মায় থাকিত। আহার্য্য সংগ্রহ করা আর গণ্ডা গণ্ডা লোকের খাওয়াদাওয়ার জিম্মায় থাকা দুই-ই সমান দরের সরকারী বা সামাজিক কাজ বিবেচিত হইত। নারীর কাজ কোন অংশেই হীন বিবেচিত হইত না। এই সব গোটা জাতির পক্ষে বিশেষ দরকারীই ছিল।

কিন্তু পরবর্ত্তী সমাজ বন্ধনের যুগে সেই সাম্য উঠিয়া গিয়াছে। ঘরবাড়ীর তদবীর, খাওয়াদাওয়ার জিম্মায় থাকা ইত্যাদি কাজ একপতি-পত্নী-ত্বের যুগে আর দেশের কাজ, জাতির কাজ, সমাজের কাজ ইত্যাদির মর্য্যাদা পায় না। এইগুলা একটা পরিবারগত খতর-খাটা কাজ মাত্র। সামাজিক হিসাবে এই সবের দাম নাই। এ দিকে খাঁটি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা দলগত কাজে নারীর কোনো ঠাঁই-ই নাই। নারী ব্যক্তিগত পরিবারের দাসী ছাড়া আর কিছু নয়। পারিবারিক কাজে আর সামাজিক কাজে প্রভেদ একপতি-পত্নী-ত্বের এক মস্ত লক্ষণ।

তবে বর্ত্তমান যুগেও নারী সামাজিক কাজ হইতে একদম বঞ্চিত হয় নাই। সে ফ্যাক্টরির মজুর মহলে। যে সকল নারী ফ্যাক্টরিতে মজুরি করে তাহারা সেই সাবেক কালের মতন অনেকটা 'দেশের কাজই' করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু তখন আবার তাহাদিগকে পারিবারিক জীব বলা চলে না। অর্থাৎ যদি তাহারা পরিবারের স্বধর্ম্ম পালন করিতে ইচ্ছা করে তাহা

হইলে তাহারা কারখানায় নকরি পায় না। আবার কারখানায় নকরি করিতে হইলে পারিবারিক জীবনে ইস্তাফা দিতে হইবে। কারখানায় এবং পরিবারে বিরোধ বর্ত্তমান জগতের এক বড় কথা।

শিল্প কারখানার মতন ব্যাঙ্ক, আফিস, ব্যবসায় সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলাও পরিবারের বিরোধী। অর্থাৎ যে সকল নারী ব্যাঙ্কের কেরাণী অথবা আদালতের উকীল তাহারা পরিবারের স্বধর্ম্ম পালন করিতে বঞ্চিত হয়। তাহারাও মজুর-নারীদের মতন কতকটা মান্ধাতার আমলের সামাজিক কাজই করিতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পরিবার নামক কেন্দ্রের অধিকারে বঞ্চিত হইতে বাধ্য।

দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান যুগে মজুর-নারী, মেয়ে-উকিল, স্ত্রী-চিকিৎসক, নারী-কেরাণী ইত্যাদি শ্রেণীর মেয়েরা আর্থিক হিসাবে স্বাধীন কিন্তু একপতি-পত্নী-ত্ব নামক বস্তু ইহাদের জীবনে একপ্রকার জুটে না।

একপতি-পত্নী-ত্বের ব্যবস্থা নারীর অবস্থা মজুর-নারী ইত্যাদি স্বাধীন মেয়েদের উল্টা। এই কেন্দ্রে স্বামী উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করে। "ভর্ত্তা" "ভার্য্যা"র সম্বন্ধই পরিবারের গোড়ার কথা। অর্থাৎ স্বামী মালিক, স্ত্রী দাসী। আজকাল-কার ফ্যাক্টরির দৃষ্টান্তে বলা যাইতে পারে যে পরিবার একটা কারখানা বিশেষ। এই কারখানার মজুরি করে নারী আর মজুরকে নিয়োগ করে স্বামী। এই অবস্থায় বিবাহিত জীবনের আইনে পুরুষ এবং স্বামীর সমান অধিকার এই কথা প্রচার করিয়া কি ফল? আইন যাহাই বলুক না কেন, আর্থিক হিসাবে নারী পুরুষের গোলাম হইয়া রহিয়াছে।

নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হইল, এ কথা বলা সম্ভব কখন? যখন নারী পুরুষের মতন জাতিগত, সামাজিক বা সরকারী সকল প্রকার কাজে স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করিতে অধিকারী। তাহার পূর্ব্বে নয়। কিন্তু সেইরূপ আর্থিক অবস্থায় সামাজিক জীবন কিরূপ থাকিবে? একপতি-পত্নী-ত্ব থাকিবে না। এই ধরণের পরিবার যত দিন মানব-সমাজে থাকিবে ততদিন নারী পুরুষের সমান হইতে পারিবে না। পুরুষ-নারীর সাম্য এবং একপতি-পত্নী-ত্ব পরস্পর বিরোধী।

সমাজ বিপ্লব

মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ায় তিন প্রকার পারিবারিক প্রথা দেখা যাইতেছে। "স্যাভেজ" বা "সহজ" যুগে দলগত বিবাহ অর্থাৎ বহু-পত্নীত্ব এবং বহু-পতিত্ব ছিল পরিবারের ভিত্তি। পরবর্ত্তী "বার্ব্বার" বা গোড়াপত্তনের যুগে জোড় পরিবার বিকাশ লাভ করে। শেষ পর্য্যন্ত উৎকর্ষের যুগে দেখা দিয়াছে একপতি-পত্নী-ত্ব। তবে ইহার সঙ্গে চলিতেছে পর-দার-গমন এবং পর-পুরুষে আসক্তি ও বেশ্যাবৃত্তি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগের সন্ধিকালে গোলাম-নারীর উপর পুরুষের যোনি-ভোগ দাবী করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু-পত্নীত্বও চলিয়াছে।

বিবাহ-পদ্ধতির ইতিহাসে দেহ-ভোগের ক্ষেত্রটা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে; সঙ্কোচটা ঘটিয়াছে মাত্র নারীর পক্ষে, পুরুষের পক্ষে নয়। বস্তুতঃ আজকালকার দিনেও পুরুষেরা সেই মান্ধাতার আমলের মতনই দলগত বিবাহ

অর্থাৎ বহু-পত্নী-ত্ব ভোগ করিয়া থাকে। নারীর পক্ষে আজ যাহা মহাপাপ বা দোষ পুরুষের পক্ষে তাহা বিল্‌কুল দূষণীয় নয়, বরং এমন কি অনেকটা বাহাদুরির কথা।

"হেতেরে"-প্রথা আজকালকার পুঁজি-পতি-শাসিত আর্থিক সভ্যতার দিনে জঘন্য গণিকাবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। গণিকা-বৃত্তিও দিন দিন দুর্নীতির চরম কোঠায় আসিয়া ঠেকিতেছে। এই গণিকাবৃত্তির প্রভাবে নারী অপেক্ষা পুরুষ বেশী কলুষিত হইতেছে। যে নারী এই বৃত্তি অবলম্বন করে একমাত্র তাহারই চরিত্রহানি ঘটে। গোটা নারী জাতির তাহাতে বেশি কিছু আসে যায় না। কিন্তু সমাজে গণিকা থাকার ফলে পুরুষ মাত্রই নীতি-ভ্রষ্ট হইতে থাকে।

আজকাল ইয়োরোপে বিবাহ "কথা" দিবার পর বর এবং কন্যা বহুকাল ধরিয়া বিনা বিবাহে কাটায়। এই প্রথায় বাস্তবিক পক্ষে অবিবাহিত পুরুষ-নারীকে অবাধ-দৈহিক সম্ভোগের সুযোগ দেওয়া হয়। সমাজ এইরূপে একটা "হেতেরে"মী বা কুমারীভোগের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। দেশশুদ্ধ লোকে তাহার বিরুদ্ধে একপ্রকার কোনো প্রতিবাদ করে না।

দুনিয়ায় একটা সমাজ-বিপ্লব আসিতেছে। তাহার ফলে একপতি-পত্নী-ত্বের সঙ্গে সঙ্গে গণিকাবৃত্তির কারণস্বরূপ আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলা আগাগোড়া বদ্‌লাইয়া যাইবে।

একপতি-পত্নী-ত্ব জগতে দেখা দিয়াছিল কেন ? পুরুষের হাতে ধনদৌলত পুঁজি হইবার ফলে। পুরুষ নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিনা সন্দেহে চিনিয়া তাহাদিগকে নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া দিবার জন্যই নারীকে এক-পতিত্বে বাধ্য করিয়াছে।

ধন-দৌলতের অধিকার এবং উত্তরাধিকার চিরকাল এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে না। গোটা সমাজ, জাতি বা দেশ ধনদৌলতের অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত করিয়া বসিবে। ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারের হিস্যা যারপরনাই কমিতে থাকিবে। এই অবস্থায় পরিবারের রূপ বা গড়নও বদলাইতে বাধ্য।

কিন্তু একপতি-পত্নী-ত্ব বদলাইবে কি? এই বিষয়ে সন্দেহ উঠিতে পারে। কেহ কেহ বলেন,—"না, বদলাইবেই যে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। বরং বদলাইবে না এইরূপই বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। একপতি-পত্নী-ত্ব সর্ব্বাঙ্গীন রূপেই হয়ত ফুটিয়া উঠিবে। ধনদৌলত যদি ব্যক্তির হাত হইতে গোটা দেশের হাতে সরিয়া আসে তাহা হইলে সমাজে মাহিয়ানাজীবি শ্রমবিক্রেতা নামক কোনো শ্রেণী থাকিবে না। তাহা হইলে দেহ বিক্রয়ের জন্য নারীর দল অর্থাৎ গণিকাশ্রেণীও সমাজে দেখা যাইবে না। গণিকাবৃত্তি যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে পুরুষেরাও অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া এক-পত্নী-ত্বেই সন্তুষ্ট থাকিবে। বস্তুতঃ তাহা হইলে নারীর পক্ষে একটা মাত্র স্বামীর মতন পুরুষের পক্ষেও একটা মাত্র স্ত্রীর বিধান কথার কথা মাত্র থাকিবে না। একপতি-পত্নী-ত্ব একটা সত্যিকার বাস্তবে পরিণত হইবে।"

গোটা সমাজ যদি ধনদৌলতের অধিকারী এবং উত্তরাধিকারী বিবেচিত হইতে থাকে তাহা হইলে পুরুষের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। নারীর চরিত্র এবং কার্য্যকলাপেও পরিবর্ত্তন দেখা দিবে। পরিবার সমাজের এবং জীবনযাত্রার আর্থিক কেন্দ্র থাকিবে না। ঘরকন্না অনেকটা সামাজিক বা সরকারী

অনুষ্ঠানে পরিণত হইবে। ছেলেপুলে মানুষ করা জনক-জননী মাত্রের কর্ত্তব্য না হইয়া গোটা দেশের সমবেত ধর্ম্মরূপে দেখা দিবে। জারজ এবং বিবাহজ উভয় প্রকার সন্তানই সমাজের পক্ষে সমান সমাদৃত হইতে থাকিবে। তাহার ফলে কোনো নারী অত্যধিক ভালবাসার প্রভাবে কোনো পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিলে সমাজে তাহার কলঙ্ক রটিবে না।

কুমারী-ভোগ, সতীত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাপদ্ধতিতে বিপ্লব আসিবে। অবাধ-দৈহিক-সম্ভোগ আবার দেখা দিবে। গণিকাবৃত্তি উঠিয়া যাইবামাত্র মানব-সমাজের পারিবারিক জীবনে এক বিচিত্র স্বাধীনতার যুগ প্রকটিত হইবে।

যোনির টান

সেই সময়ে ব্যক্তিগত যোনির টান নামক শক্তি তাহার যথোচিত কর্ম্মক্ষেত্র পাইবে। এই শক্তি সেই "বার্ব্বার" যুগের অন্তিমকালে অতি সামান্যরূপে প্রথম দেখা দিয়াছিল। কিন্তু গোটা তথাকথিত একপতি-পত্নী-ত্বের যুগে সেটা ধামাচাপা হইয়া লোপ হইয়াছিল। আর্থিক বিপ্লব ঘটিবার পর এই শক্তি মানব-চরিত্রকে নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কারণ করিয়া তুলিবে।

মধ্যযুগের পূর্ব্বে ব্যক্তিগত দৈহিক-প্রেম ছিলই না বলা চলে। ইয়োরোপীয় সমাজের কথা বলা হইতেছে। তখনও অঙ্গ-লাবণ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ করা, ভাল লাগা ইত্যাদি প্রভাব পুরুষ-নারীর মেলামেশায় কম বিস্তর দেখা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান

পাশ্চাত্য মানব ব্যক্তিগত ভালবাসা বলিলে যে বস্তু বুঝে সে সাবেক কালে ছিল না।

(১)

প্রাচীন ইয়োরোপে বাপমারা ছেলেমেয়ের বিবাহ ঠিক করিয়া দিত। পাত্রপাত্রী পরস্পরে চিনিত না। তাহাদের ভালবাসা সুরু হইত বিবাহের পূর্ব্বে নয়, পরে। বস্তুতঃ সেটা পরস্পর ভাল লাগা বা পছন্দ করার ফল মোটেই নয়। সে ছিল একটা সামাজিক কর্ত্তব্য বিশেষ। দুটা মানুষ যখন যেন তেন প্রকারেন এক ঠাঁইয়ে জুটিয়াছে তখন তাহারা একসঙ্গে থাকিতে বাধ্য। ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত চিত্ত স্ফূর্ত্তি পাক্ বা না পাক্। সেদিকে নর-নারীর মেজাজ থাকিতই না।

খেলিত না একদম এরূপ বলা চলে না। সমাজের বাহিরে ছিল খাঁটী ব্যক্তিগত দৈহিক টানের ক্ষেত্র। প্রাচীন কবিগণ মেষপালক ও চাষীশ্রেণীর লোকের প্রেমের কথা গাহিয়া গিয়াছেন। থেওক্রিতোস এবং মোশুস ইত্যাদি কবির সাহিত্যে সেই প্রেম কাহিনী পড়া যায়। কিন্তু এই সকল লোক ছিল গোলাম জাতীয়। স্বাধীন নাগরিক বা ভদ্র সমাজের ভিতর তাহাদের ঠাঁই ছিল না।

খাঁটী ভদ্র-সমাজে ব্যক্তিগত ভালবাসা দেখা যায় "হেতেরে" প্রথার সম্পর্কে—তাহাও আবার আথেন্সের গৌরব যুগে নয়। আথেন্সে যখন ভাঙন লাগিয়াছে এবং রোমে যখন গণতন্ত্রের পর রাজতন্ত্র কায়েম হইয়াছে সেই সময়ে নব নব সামাজিক প্রতিষ্ঠান কম বেশী দেখা দেয়। তাহার ফলে পুরাণো গোলাম

স্বাধীনতা পায়। দেশের ভিতর বহু বিদেশী লোকের সমাগমও হইতে থাকে। এই সময়কার "হেতেরে" সমাজে গ্রীক্ এবং রোমান পুরুষেরা দেহগত টানের সুযোগ কিছু কিছু পাইয়াছিল।

স্বাধীন পুরুষের গোলাম-নারীর ভালবাসা মাঝে মাঝে দেখা যাইত। কিন্তু তাহাও পর-দার-গমন বা পর-পুরুষে আসক্তি। আসল ব্যক্তিগত দৈহিক টান বলিলে যাহা বুঝা যায় গ্রীক্ রোমানরা তাহা জানিত না। সেই যুগের কবি আনাক্রেয়ন প্রেম-সাহিত্যে নামজাদা। এমন কি ইনিও তাঁহার প্রিয়তমার নারীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কবিত্ব চালান নাই।

প্রাচীন ইয়োরোপের এরস বা কামদেবতা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিগ্রহ মাত্র। কিন্তু একমাত্র ইন্দ্রিয়ারামই বর্ত্তমান যুগের প্রেম নয়। পরস্পর পরস্পরকে চাওয়াই বর্ত্তমান আদর্শের পুরুষ-নারীর মিলনের গোড়ার কথা। এই হিসাবে পুরুষ এবং নারী উভয়ে স্বাধীন। কিন্তু সাবেককালে এরসদেবতার অর্থাৎ নারীর মত একপ্রকার লওয়াই হইত না।

অধিকন্তু বর্ত্তমান আদর্শে এই টান অতি নিবিড় এবং অনেক দিন থাকে। পুরুষ নিজের নারী ছাড়িয়া এবং নারী তাহার পুরুষ ছাড়িয়া থাকা সহ্য করিতে পারে না। বিরহ এই যুগে এক বিপুল দুর্য্যোগ। এক জন অপরকে পাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রাচীন ইয়োরোপে এরূপ ঘটিত না। ঘটিত মাত্র গণিকা লইয়া।

তাহা ছাড়া বর্ত্তমান ইয়োরোপে দৈহিক-সংস্রব বিচার করা হয় একদম নয়া মাপকাঠি অনুসারে। প্রশ্নটা কেবল এ নয় যে :—"এই সংযোগটা আইন-সঙ্গত না বে-আইনি ?" আসল

কথা এই—"পুরুষ এবং নারী উভয়ে স্বাধীনভাবে পরস্পরকে চাহিয়াছিল কিনা?"

এখন কথা এই যে বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমাজের এই আদর্শ কাজে পরিণত হইতেছে কতখানি? নেহাৎ কম। "ভদ্র সমাজে" পয়সাওয়ালা শ্রেণীর ভিতর এই নয়া আদর্শ বা মাপকাঠি মুখে মুখে চলে মাত্র এইটুক পর্য্যন্ত বলা চলে। ইহার বেশি বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে কোনো মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

(২)

যোনি-গত টানের ইতিহাসে প্রাচীন ইয়োরোপের দান কিছুই নয়। "হেতেরে" প্রথার উপর সেকালের লোক উঠিতে পারে নাই। মধ্যযুগের লোকেরা তাহার উপর পর-দার-গমন এবং পর-পুরুষে আসক্তি জুড়িয়া দিয়াছিল মাত্র। বীর-যুগের প্রেম সঙ্গীতে তাহার পরিচয় পাই। বিবাহিত জীবনের ব্যতিরেক ছিল তাহাদের দেহ-গত টানের উৎস। কিন্তু দেহ-গত টানের ফলে পুরুষ নারীর পরস্পর পছন্দসই যে বিবাহ হয় সেই টান এবং সেই বিবাহ মধ্যযুগের সমাজে আবিষ্কৃত হয় নাই।

তরল-মতি রোমান সমাজের ত কথাই নাই, গম্ভীর প্রকৃতি জার্ম্মাণ জাতির ভিতরই বা কি দেখিতে পাই? "নিবেলুঙ" সাহিত্যের এক নায়িকা ক্রিম্‌হিল্ড গোপনে জীগফ্রিড্‌কে ভালবাসে। জীগফ্রিডও ক্রিমহিল্ডকে ভালবাসে। কিন্তু ক্রিম্‌হিল্ডের অভিভাবক গুন্টর বলিতেছে যে সে তাহার জন্য এক বীর পছন্দ করিয়া রাখিয়াছে। সেই "পাত্রের" নাম পর্য্যন্ত করা গুন্টর আবশ্যক বোধ করে নাই। মৃক্রিহিল্ড

কি জবাব দিল? নায়িকা বলিতেছে—"আমার মতামত লইবার কোন দরকার নাই। তোমার হুকুম আমার শিরোধার্য্য। তুমি যাহাকে আমার স্বামী রূপে পছন্দ করিয়া দিবে সেই আমার স্বামী হইবে।" অর্থাৎ নিজ টানের কথা নায়িকার মাথায় আসে নাই। একদম অজানা অচেনা পুরুষকেও সে বরণ করিতে রাজি।

অন্যান্য বীর-সাহিত্যেও এই দস্তুর। তবে এক আইরিশ কাহিনীতে দেখিতে পাই যে, তিন বীর এক নায়িকা গুরুণকে "দেখিতে" আসিয়াছে। এইক্ষেত্রে নায়িকা তিনজনের দুই জনকে বিদায় দিয়া একজনকে বাছিয়া লইল।

কিন্তু মোটের উপর এই ধরণের স্বয়ংবর মধ্যযুগের ইয়োরোপে বিরল। যুবরাজের জন্য পাত্রী ঢুঁড়িবার কাজে বাপ-মারাই অধিকারী। তাহাদের মৃত্যু হইলে যুবরাজ নিজে নিজের পত্নী বাছাই করিতে পারে বটে। কিন্তু এই বাছাই স্বাধীন নয়। দরবারের আমীর-ওমরাহ্ ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের মঞ্জুর হইলে তবে যুবরাজ বিবাহ করিত।

বড় ঘরের বিবাহ একটা মামুলি সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র ছিল না। রাজ-রাজরা, নবাব-জমিদারের পত্নী বাছাই একটা দস্তুর মতন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা। ব্যক্তিগত ভালবাসা, দৈহিক-টান, পরস্পর পছন্দ হওয়া ইত্যাদি কথা এই সকল বিবাহের প্রসঙ্গে উঠিতই না। বংশের ইজ্জৎ, বংশের দিগ্‌বিজয়, রাজ্য বিস্তার, জমিদারী বাড়ানো ইত্যাদির চাপে প্রেম মাহাত্ম্য মাথা তুলিতে পারিত না।

নাগরিকদের জীবনও এইরূপই ছিল। মধ্যযুগের মধ্যবিত্ত

এবং ধনজীবি সমাজে "শ্রেণী" বা শিল্পীদিগের "গিল্ড" প্রধান স্থান অধিকার করিত। "গিল্ড"গুলির নিয়ম কানুন ছিল বড় কঠোর। "জাত পাত" বিচার চলিত অত্যধিক। ইহাদের অধিকার এবং ক্ষমতা বিষয়ক অনুশাসনগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়,—এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। অধিকন্তু শিল্পীদের ভিতরও উচ্চ নীচ ভেদ করা হইত খুব বিস্তৃত এবং গভীর ভাবে। কারিগর এবং কর্ম্মী, ওস্তাদ এবং সাগরেত, ইত্যাদি শিল্প সংসারের স্তরগুলা বিশেষ কঠোরতার সহিত রক্ষিত হইত। এক ব্যবসায় বা শিল্প হিসাবে নাগরিকগণের ভিতর পার্থক্য এবং বিশিষ্টতা, তাহার উপর বয়স, বিদ্যা, কর্ম্ম-তৎপরতা, ওস্তাদি ইত্যাদির হিসাবে বিভিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্য মধ্য যুগের নাগরিক জীবনে বহুবিধ অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সকল অনৈক্য এবং স্বতন্ত্রতার ফল বিবাহের লেন দেনেও যথেষ্ট দেখা যাইত। যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো নারীকে দেহের টানে অথবা ভাল লাগে বলিয়া বিবাহ করিতে পারিত না। প্রত্যেক শ্রেণী তাহার অধিকার ভেদ মানিতে বাধ্য থাকিত। কাজেই বিধি-নিষেধের আওতা ছাড়াইয়া কোনো লোক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিত না। জাতি-ভেদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, একমাত্র কতকগুলা বাঁধা ঘর বা "মেল" হইতেই বর-কন্যা বাছাই সম্ভবপর হইত। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত প্রেমের পরিবর্তে বংশের ইজ্জৎই পারিবারিক বন্ধনের কারণ হইত।

মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ ছিল

বিবাহের রীতি। বর এবং কন্যা পরস্পরকে চিনুক না চিনুক এবং ভাল বাসুক বা না বাসুক তাহারা বাপমা আত্মীয়-স্বজনের মতানুসারে ঘর করিতে বাধ্য হইত। সেই অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের দলগত বিবাহের যুগে যেরূপ ছিল ইয়োরোপীয় সমাজে মধ্য যুগের লোকেরা তাহার উপর নূতন কিছু কায়েম করিতে পারে নাই।

প্রাচীনতম প্রথায় শিশুর জন্ম হইবামাত্র সে একটা গোটা দলের স্বামী কিম্বা স্ত্রী। পরবর্ত্তীকালের দলগত বিবাহেও নিয়মটা ছিল এইরূপই,—তবে পাত্র-পাত্রীর ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইতে থাকে মাত্র। জোড় পরিবারের ব্যবস্থায় জননীরা দুই তরফ হইতে "কথা দিয়া" রাখিত। ইহারা কথা দিবার সময় গোষ্ঠীতে যাহাতে মেয়ে-জামাইয়ের প্রতিপত্তি বাড়ে একমাত্র অথবা প্রধানতঃ এই দিকটা আলোচনা করিয়াই ছেলে মেয়েদের বিবাহ ঠিক করিত।

এই প্রতিপত্তির কথাই—ধন-সম্পদে ক্ষমতালাভ করিবার প্রবৃত্তিই পরবর্ত্তী যুগে ব্যক্তিগত ধনদৌলতের আমলে জনক-জননীদের পাইয়া বসিয়াছে। পুরুষ-বিধি স্বত্বাধিকার ও উত্তরাধিকারের আইন—এই সবের প্রভাবে বিবাহ প্রবলভাবে একটা আর্থিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। খোলাখোলি কেনা-বেচার আকারে বিবাহ আর অনুষ্ঠিত হয় না বটে কিন্তু প্রত্যেক বরের এবং প্রত্যেক কন্যার এক একটা বাজার-দর আছে। এই বাজার-দরটা ব্যক্তির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না। তাহার তহবিল কত বড় এই তথ্যই পাত্র-পাত্রীর দর নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে।

পুরুষ এবং নারীর পরস্পর ভাল লাগা যে বিবাহের কারণ হইতে পারে এ কথা একটা গল্প, উপন্যাস বা নাটকের কাহিনী মাত্র। বড় ঘরে, স্বচ্ছল ঘরে, ধনদৌলত-ওয়ালা সমাজে এই বস্তু দেখা যায় না। মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত মানব-সমাজ সম্বন্ধে এই মত প্রচার করা সম্ভব।

(৩)

আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জগতে নানা দিকে নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক লেন-দেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য যার-পর-নাই প্রসার লাভ করিয়াছে। ধনজীবী পুঁজি-পতি ইত্যাদির প্রভাব সমাজে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে মানবজীবনের নানা কর্ম্মক্ষেত্রেই ব্যবসায়ের নিয়মকানুন-কায়েম করা হইয়াছে। বিবাহ-পদ্ধতিতেও এইরূপ দেখা যায়। তাহার ফলে বিবাহ একটা "স্বাধীন চুক্তি রূপে বিবৃত হইতে সুরু করিয়াছে।

ব্যবসায়ের চোখে দুনিয়ার সব জিনিসই বিনিময়ের মাল মাত্র। এই চোখ দিয়া মানুষ জগৎকে দেখিতে সুরু করিবা মাত্র পুরাণো ধারণাগুলা বদলাইতে থাকে। সাবেক কালের রীতি-নীতি, সনাতন ধর্ম্ম ইত্যাদি বস্তু সবই নবরূপে দেখা দেয়। বিবাহও আর জনক-জননীর কর্ত্তামির ক্ষেত্র না থাকিয়া বর-কন্যার 'আপ্‌সে আপ' বাছিয়া লওয়া কাণ্ড বিবেচিত হইয়াছে।

বিলাতি সমাজতত্ত্ববিৎ মেইন বলেন:—"মান্ধাতার আমলে আর বর্ত্তমান যুগে তফাৎ এই যে সাবেক কালের লোকেরা স্থিতি, সনাতনী রীতি বা যা আছে তাই ঠিক এই নিয়মের

বিধানে জীবনযাত্রা চালাইত আর আজকালের নরনারী পুরাণো রীতিনীতির বা বংশমর্য্যাদার দোহাই না দিয়া স্বাধীন ভাবে জীবনযাপনের সর্ত্ত বাছিয়া লয়।" এই স্থিতির নাম সর্ত্ত সম্বন্ধে "কমুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টে" ("ধনসাম্যের মোসাবিদা") নামক প্রবন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। এই আবিষ্কারের ভিতর সত্য আছে অনেক।

একটা চুক্তি বা সর্ত্ত করিতে পারে কাহারা? যাহারা স্বাধীন এবং পরস্পর সমান। ধনপতি শাসিত সমাজ প্রথম হইতেই এই ধরণের স্বাধীন এবং পরস্পর সাম্যশালী জীব সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। প্রথম প্রথম সেই সৃষ্টির উপর একটা ধর্ম্মের আগল ছিল।

তখন চলিতেছিল খৃষ্টান জগতে ধর্ম্মসংস্কারের যুগ। জার্ম্মাণির লুথার এবং ফ্রান্সের ক্যাল্‌ভা উভয়েই প্রচার করিয়াছিলেন:—"স্বেচ্ছায় যাহা মানুষ করে একমাত্র তাহার জন্যই সে দায়ী। কাজেই কোনো লোককে জোর জবরদস্তি করিয়া একটা দুর্নীতিমূলক কাজ করাইবার ব্যবস্থায় বাধা দেওয়া মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য বিশেষ।"

বিবাহের বেলায় এ মতটা খাটিত কেমন? "বুর্জ্জোআ" সমাজে বিবাহ ছিল অন্যান্য ব্যবসায়ের অনুষ্ঠানের মতনই একটা চুক্তির জিনিষ। চুক্তিটা স্বাধীনও বটে। কিন্তু এই তথাকথিত চুক্তি এবং স্বাধীনতার "ভিতরকার কথা" কি? কানাঘুষা না করিয়াও সকলেই টের পাইত বরকন্যার মতামতের পশ্চাতে কোন্ কোন্ ব্যক্তির ইসারা, অঙ্গুলিসঙ্কেত এবং চোখ রাঙানি কাজ করিয়াছে।

কিন্তু ব্যবসাদারীর যুগে যখন সর্ব্বত্র চলিতেছিল আইনগত স্বাধীনতা তখন যোনিসম্ভোগ সম্বন্ধে স্বাধীনতাটা শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত থাকিবে ইহা যুবকযুবতীর ধারণায় দাঁড়াইতে পারে নাই। অধিকন্তু ধর্ম্মে তখন পাপের বিরুদ্ধে লড়াই বহুসংখ্যক নরনারীকে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিজয়ী করিয়াছে। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-জ্ঞান, স্বাধীন-চিন্তা, স্বতন্ত্রতা যখন গির্জ্জাকেও ভাঙিয়া ফেলিতে পারিয়াছে তখন জীবনযাত্রার নিজ কর্ম্মে একটা মৌখিক আইনগত স্বাধীনতা লইয়া নরনারী সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত না।

এই দিকেও ভাঙন দেখা দিয়াছিল। তখন চলিতেছিল বস্তুতঃ জগৎ ভরিয়াই একটা মহাভাঙনের যুগ। পুরাণো দুনিয়ার সীমানাগুলা উঠিয়া গিয়াছিল। নবীন গোলার্দ্ধ আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং দেশদেশান্তরে অহরহ গতিবিধির প্রভাবে মানুষ সাবেককালের বিধিনিষেধ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং রীতিনীতিগুলাকে নেহাৎ সঙ্কীর্ণ এবং ক্ষুদ্র বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। যাহারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে মেক্সিকোয় এবং পটোসিতে সোনারূপার খাদের সন্ধানে বিশ্বপর্য্যটন করিতে বাহির হইয়াছিল তাহারা কি আর সনাতন শীল, শিষ্টাচার বাপমার আব্‌দার ইত্যাদি সাবেক কালের স্বধর্ম্মগুলার তোআক্কা রাখিতে পারে? কাজেই বিবাহের বন্ধনে স্বাধীনতা, স্বেচ্ছায় চুক্তি, যোনির টান ইত্যাদি ক্রমে ক্রমেও বাস্তব সত্যে পরিণত হইতেছিল।

কমসেকম প্রটেষ্টাণ্ট নরনারীর সমাজে এই বিপ্লব দেখা দিয়াছিল বলা চলে। বিবাহটা যে একমাত্র পুরুষের অধিকার

নয়, ইহাতে নারীর অধিকার ও ইচ্ছা ধর্মসংস্কারের যুগের পূর্ব্বে এই তথ্য বাস্তবজীবনে আবিষ্কৃত হয় নাই।

কিন্তু সম্পত্তির টানকে যোনির টান কোনো মতেই পরাস্ত করিতে পারে নাই। রাজরাজড়াদের মহলে, ধনী ব্যবসায়ী মহলে, এক কথায় সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র সমাজে যোনির টানে বা স্বাধীন চুক্তির প্রভাবে বিবাহ রহিয়া গিয়াছে ব্যতিরেক। এখানে ধনদৌলতের প্রভাবে বিবাহই নিয়ম। অপর দিকে, বড়ই মজার কথা—নিঃস্ব ধনদৌলতহীন নরনারীরাই জানে আসল স্বাধীন সর্ত্তের বিবাহ কি বস্তু। যোনির টানে বিবাহ একমাত্র গরীব সমাজেই নিয়ম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধনীনির্ধনের এক প্রভেদ এই যে "মানবের অধিকার"—পুরুষের অধিকার এবং নারীর অধিকার—বলিলে যাহা কিছু বুঝায় তাহার প্রায় সবগুলাই ধনীর একচেটিয়া। কিন্তু প্রেমের অধিকার নামক যে মানবাধিকার তাহা কেবল নির্ধনরাই চাখে।

বিবাহে পুরাপুরি স্বাধীনতা কায়েম করিতে হইলে সমাজ হইতে ব্যক্তিগত ধনদৌলতের আধিপত্য তুলিয়া দিতে হইবে। টাকাপয়সার দৌরাত্ম্য যতদিন আছে ততদিন যোনির টান জগতে মাথা তুলিতে পারিবে না।

ভবিষ্যতের পরিবার

বাখোফেন বলিয়াছেন:—"দলগত বিবাহ তুলিয়া দিয়া জোড়পরিবার কায়েম করিবার প্রয়াসে নারীর কৃতিত্বই প্রধানভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।" পরন্তু পরবর্ত্তী যুগে জোড়পরিবার

ভাঙিয়া একপতি-(পত্নী)-ত্ব কায়েম করিবার জন্ম পুরুষের আত্মম্ভরিতাই দায়ী। পুরুষ নারীকে নিজের বশে রাখিয়া তাহাকে যথাসম্ভব একেলা ভোগ করিবার জন্মই সে জোড়-পরিবার প্রথা তুলিয়া দিয়াছে। পুরুষ অবশ্য নিজের তরফ হইতে যথেচ্ছরূপে বহু নারী ভোগের ক্ষমতা বিদায় দেয় নাই।

এখন যদি নারীকে কোনো মতে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহা হইলে সে পুরুষকে বহু-পত্নীক হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে। নারী তখন সত্যসত্যই পুরুষের সমান হইতে পারিবে। ইহাতে নারীর পক্ষে বহু-পুরুষ ভোগের লোভ বাড়িবে না। কেননা বর্ত্তমান অবস্থায়ই দেখা গিয়াছে যে নারী সাধারণতঃ একটা পুরুষ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। লাভ হইবে এই যে, পুরুষ আজকালকার মতন একাধিক নারীর সঙ্গে সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া খাঁটি এক-পত্নীক হইতে বাধ্য হইবে।

আজকালকার পারিবারিক ব্যবস্থায় পুরুষের একাধিপত্য প্রবল। তখন এই পুরুষতন্ত্র উঠিয়া যাইবে। অধিকন্তু আজকাল বিবাহ ভাঙা এক প্রকার অসম্ভব কাণ্ড। বিবাহ একদম অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বরূপ বিবেচিত হয়। নারী আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিলে বিবাহ ভাঙা বেশী কঠিন থাকিবে না।

বিবাহের বন্ধন যে অচ্ছেদ্য এই ধারণাটা মানব-সমাজে গজিয়াছে কি করিয়া? প্রথম কারণ এক পতি-(পত্নী)-ত্বের আমলের পুরুষাধিপত্য এবং নারীর আর্থিক পরনির্ভরতা। ধনদৌলত সম্বন্ধে পুরুষের উপর নারীর এই যে গলগ্রহ থাকা এই তথ্যটা আবার ধর্ম্মের দোহাইয়ের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছে।

বুঝিয়া না বুঝিয়া জগতের নরনারী স্ত্রী-স্বামীর সম্বন্ধ কে একটা তথাকথিত আধ্যাত্মিক কিছু সমঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই কারণে বিবাহ ভাঙিয়া ফেলা বর্ত্তমান সমাজে একটা অতি ভয়ানক কাণ্ডকারখানা বিবেচিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যোনির টানে বিবাহই যদি বিবাহরূপে সম্মানিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে থাকে তখন যতদিন পুরুষ-নারীতে পরস্পর ভাললাগার সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন বিবাহ অটুট থাকিবে। কিন্তু এই ধরণের ব্যক্তিতে যোনির টান এক এক পুরুষের বা নারীর পক্ষে এক এক প্রকার। বিশেষতঃ পুরুষেরা এই হিসাবে নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। কেহ বেশিদিন কেহ কমদিন কোনো এক নারীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারে। কিন্তু যখনই এইরূপ সহবাসের প্রবৃত্তি কমিতে থাকে তখনই পরিবারটা ভাঙিয়া ফেলা পুরুষ এবং নারী উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। নারীর আর্থিক স্বাধীনতার যুগে তাহাতে সমাজের কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং ডাইভোর্স নামক কলঙ্কময় স্ত্রীবর্জ্জন বা স্বামীবর্জ্জনের মোকদ্দমা হইতে দুনিয়া উদ্ধার পাইবে।

ধনদৌলতে স্বাধীনতা আসিলে সমাজ এই উপায়ে নানা দিকে নানা দুর্গতি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আজকালকার সমাজব্যাপী বহু কু একে একে উঠিয়া যাইতে থাকিবে। জগৎ একদম নতুন চরিত্রের পুরুষের এবং নতুন চরিত্রের নারীর আবাসভূমিতে পরিণত হইবে। টাকার জোরে পুরুষ আর নারীর যোনি কিনিতে সমর্থ হইবে না। নারীরাও আর ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কোনো পুরুষের সঙ্গ লইবে না।

অধিকন্তু আর্থিক দুরবস্থার ভয়ে ইহারা নিজেদের পছন্দসই পুরুষের সঙ্গে সহবাস করা হইতে বিরত হইবে না। জগতে একটা নতুন নীতি, নতুন মাপাকাঠি, নতুন লোকমত তৈয়ারী হইতে থাকিবে।

এইখানে আবার মর্গ্যানের মত উদ্ধৃত করা যাউক। তিনি বলিয়াছেন :—মানবজাতির সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ইতিহাসে পরপর চার প্রকার পারিবারিক প্রথা দেখা গেল। আজকাল "উৎকর্ষ" বা সভ্যতার আমলে একপতি-পত্নী-ত্ব চলিতেছে। কাজেই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক,—এই প্রথাটাই বা কতদিন থাকিবে? এইটা কি চিরস্থায়ী হইতে পারে? ইত্যাদি। "উৎকর্ষের" আমল স্থুরু হওয়া হইতে আজ পর্য্যন্ত এই প্রথাটা নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সমাজ যেমন যেমন বদ্‌লাইয়াছে একপতি-পত্নী-ত্বও তেমন তেমন বদ্‌লাইয়াছে। এই বদ্‌লানোয় উন্নতিই প্রকটিত হইয়াছে। কাজেই বিশ্বাস করা চলে যে, ভবিষ্যতেও আরও নয়া নয়া রূপ দেখা দিবে, এবং সেই সকল রকমওয়ারি পারিবারিক প্রথায় মানবজীবনের উন্নতিরই নানা ধাপ খুলিয়া যাইবে। পুরুষ এবং নারীর সাম্য একপতি-পত্নী-ত্বের চরম উন্নতি লক্ষণ হইবে। কিন্তু একপতি-পত্নী-ত্ব যদি মানব-সমাজের নয়া চাইদা পূরণ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে একদম অভিনব রূপের পরিবার জগতে আসিবে। তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা সম্প্রতি অসাধ্য।"

তৃতীয় অধ্যায়

ইরোকোআদের গোষ্ঠী প্রথা

"গেন্‌স্‌"

কুটুম্ববাচক শব্দ ও আত্মীয়তার সম্বন্ধ আলোচনা করিতে করিতে ইয়াঙ্কি পণ্ডিত মর্গ্যান সাবেক কালের পারিবারিক প্রথাগুলা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। এই ধরণেরই আর এক আবিষ্কারের জন্য মর্গ্যান নৃতত্ত্ববিদ্যার আসরে নাম করিয়াছেন। মানব-সমাজে সুপ্রচলিত গোষ্ঠী বা জ্ঞাতিপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ এই দ্বিতীয় আবিষ্কারের অন্তর্গত।

আমেরিকার "ইণ্ডিয়ান" সমাজে যৌন-কেন্দ্রগুলা এক একটা জানোআরের নামে অভিহিত হয়। এইগুলা মর্গ্যানের মতে গ্রীক্‌দের "গেনেআ" এবং রোমাণদের "গেন্তেস" হইতে অভিন্ন। ইণ্ডিয়ান রূপগুলাই গ্রাক্‌-রোমাণ রূপ অপেক্ষা পুরাণো। গ্রীক্‌ রোমাণ প্রথা ইণ্ডিয়ান হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে সমাজ "গেন্‌স্‌", "ফ্রাত্রী" এবং "ট্রাইব" বা "জাতি" এই তিন স্তরে পর পর সাজানো ছিল। ইণ্ডিয়ান সমাজের স্তরবিন্যাসও অবিকল এইরূপ। মর্গ্যান আরও বলেন যে, "উৎকর্ষের" যুগে পদার্পণ করা পর্য্যন্ত দুনিয়ার সকল "বার্ব্বার" জাতিই "গেন্‌স্‌" প্রথার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

এই আবিষ্কার সাধিত হইবামাত্র প্রাচীন গ্রীস ও রোমের

বহু কঠিন ও জটীল প্রশ্ন বুঝিতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু খাঁটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে আদিম মানব কোন্ পথে কি উপায়ে বিকাশ লাভ করিয়াছিল সেই বিষয়েও ধারণা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদেরা এতদিন প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে "গা-জুরি" করিয়া যে-সে মত বাজারে চালাইতেছিলেন। মর্গ্যানের সিদ্ধান্তে সেই সব এক নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দেও মর্গ্যান তাঁহার আবিষ্কারগুলা প্রচার করিতে পারেন নাই। তাহার পর তিনি যে সব গবেষণা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই সমাজবিজ্ঞানের রাজ্যে একটা যুগান্তর সাধিত হইয়াছে।

মর্গ্যান "গেন্‌স্" নামক ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করিয়া ইণ্ডিয়ানদের যৌন বা বিবাহকেন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন। গ্রীক্ "গেনোস্" এবং ল্যাটিন "গেন্‌স্" আর্য্য ধাতু গণ (জন) হইতে উৎপন্ন। গণ (জন) ধাতুর অর্থ উৎপন্ন করা। "গেনোস্," "গেন্‌স্", সংস্কৃত "জন", গথিক "কুনি," প্রাচীন"নর্স" এবং অ্যাংলো-স্যাকসন্ "কিন," ইংরেজি "কিন," মিড্‌ল হাই জার্ম্মাণ "কিয়েন্" এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি একরূপ। প্রত্যেক শব্দেই উৎপত্তি, বংশ ইত্যাদি বুঝায়। ল্যাটিন এবং গ্রীক্ শব্দের দ্বারা বিশেষভাবে এইরূপ এক যৌনকেন্দ্র বুঝান হইত যাহার লোকেরা কোনো এক পূর্ব্বপুরুষের সন্তান বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিত। এই কেন্দ্রের নরনারীরা কতকগুলা ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতি পালন করিয়া অন্যান্য কেন্দ্রের লোকজন হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যত্ন লইত। "গেন্‌স্" এবং

"গেনোসের" উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মর্গ্যানের পূর্ব্বে ঐতিহাসিকেরা এক প্রকার অজ্ঞ ছিলেন। "গেন্‌স্"কে জ্ঞাতি বা গোষ্ঠী ধরিয়া লইতেছি।

"পুনালুয়া" প্রথার পরিবার আলোচনা করিলে "গেন্‌স্" সম্বন্ধে কতকগুলা মূলতথ্য পাওয়া যায়। এই প্রথায় "পুনালুয়া" অর্থাৎ "নিকট আত্মীয়"দের ভিতর পরস্পর বিবাহ চলিত। "পুনালুয়া"রা আপন মায়ের পেটের ভাই-বোন নয়, নিকট আত্মীয় মাত্র। তখন ভাইয়ে বোনে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সেই অবস্থায় বাপের নাম জানা ছিল না। মায়ের নামে চলিত পরিবার এবং বংশলতিকা। কোনো জননীর বংশধর হিসাবে যে সকল নরনারী এক কেন্দ্র গড়িয়া তুলিত, তাহারাই হইত "গেন্‌সের" লোক। মেয়েদের জন্য স্বামী আসিত অন্যান্য কেন্দ্র হইতে। কাজেই পৌত্রপৌত্রীরা "গেন্‌সের" লোক বিবেচিত হইত না। ইহারা অন্যান্য "গেন্‌সে"র লোক। কিন্তু মেয়েদের সন্তানেরা নিজ "গেন্‌সে"রই ব্যক্তি বিবেচিত হইত।

গোষ্ঠী-শাসন

ইরোকোআ সমাজের সেনেকা "জাতি" আট গোষ্ঠী বা জ্ঞাতিকেন্দ্রে বিভক্ত। প্রত্যেকের নাম আলাদা। জানোআর হিসাবে নামকরণ হয়। প্রথম জ্ঞাতিকেন্দ্রের নাম নেকড়ে বাঘ, দ্বিতীয়ের নাম ভল্লুক, তৃতীয়ের নাম কচ্ছপ, চতুর্থের নাম বীভার, (চতুষ্পদ উভচর জীব। ইঁদুর জাতীয় স্তন্যপায়ী। এ জানোআরের লোম পাশ্চাত্যের পোষাকে ব্যবহার করে।) অপর চারটা জানোআর বা গোষ্ঠীর নাম হরিণ, স্নাইপ (লম্বা

ঠোঁট ওয়ালা জলাশয় চারী পাখী,) হেরণ (পাখী) এবং বাজ (পাখী)। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই কতকগুলা "ধর্ম্ম" আছে।

প্রথমতঃ, শান্তির সময় গোষ্ঠী কর্ত্তৃক "সাখেম" (নায়ক) বাছাই করা হয়। লড়াইয়ের সময়ও এক স্বতন্ত্র নেতা নির্ব্বাচিত হয়। "সাখেম" গোষ্ঠীরই একজন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এই পদ একপ্রকার বংশানুক্রমিক। কিন্তু লড়াইয়ের নায়ক গোষ্ঠীর বাহির হইতে নির্ব্বাচিত করা সম্ভব। এই পদে অনেক সময় কোনো লোক বহাল না থাকিলেও চলে, কিন্তু "সাখেমে"র পদ কখনই খালি থাকিতে পারে না।

"সাখেম" বংশানুক্রমেই নির্ব্বাচিত হয় বটে। কিন্তু পুত্র তাহার পিতার গদিতে বসিতে পায় না। কেননা পুত্র তাহার জননীর গোষ্ঠীর লোক। "জননীবিধির" নিয়মে ভাই কিম্বা ভাগ্‌নেই উত্তরাধিকারী।

মেয়ে পুরুষ উভয়েই "সাখেম" বাছাইয়ে ভোট দেয়। কিন্তু কোনো এক গোষ্ঠী একাকী তাহার গোষ্ঠী-নায়ক নির্ব্বাচনে অধিকারী নয়। অপর সাত গোষ্ঠী মত দিলে তবে "সাখেমে"র বাছাই ইরোকোআ-ফেডারেশ্যন বা "যুক্তরাষ্ট্রে"র বড় সভায় মঞ্জুর হয়।

"সাখেমে"র এক্তিয়ার প্রধানতঃ নৈতিক ধরণের। জোর জবরদস্তির কোনো সুযোগ তাঁহার তাঁবে নাই। সেনেকা "জাতি"র সভায় তাঁহার ঠাঁই আছে। অধিকন্তু সর্ব্ব"জাতি" সমন্বিত গোটা ইরোকোআ-ফেডারাল সভায়ও তাঁহার বসিবার ক্ষমতা আছে।

লড়াইয়ের নায়ক লড়াই ছাড়া অন্য কোনো অধিকার ভোগ করে না।

দ্বিতীয়তঃ, গোষ্ঠী যখন তখন খুশী অনুসারে দুই নায়ককেই বরখাস্ত করিতে পারে। মেয়ে পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করে। বরখাস্ত হইবার পর ইহারা সমাজে অন্যান্য পুরুষের মতন মামুলি যোদ্ধা অথবা অন্য কিছু রূপে জীবন চালাইতে থাকে। আর এক কথা, নরনারীদের মতের বিরুদ্ধেও "জাতি"সভা অর্থাৎ আটগোষ্ঠী-সমন্বিত সেনেকা-পরিষৎ কোনো গোষ্ঠীর নায়কদিগকে বরখাস্ত করিতে অধিকারী।

তৃতীয়তঃ, গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর-বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের বিধানই গোষ্ঠীর বন্ধন-রজ্জু। নিয়মটা "নেতি"-মূলক বটে, কিন্তু এই "নিষেধাত্মক" নিয়মেই রক্ত-সম্বন্ধের "অস্তিত্ব" সমাজের উপর তাহার ক্ষমতা দেখাইতেছে। ইহার জোরেই রক্তের টান অনুসারে জ্ঞাতিকেন্দ্র গড়িয়া উঠে।

এই তথ্যটা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মর্গ্যান যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে "সাম্বেজ" এবং "বার্ব্বার" নরনারীদের বিবাহ-প্রথা কোনো পর্য্যটক এবং গবেষকই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই সকল সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্র সম্বন্ধে অস্পষ্ট এবং গোঁজা-মিলপূর্ণ বৃত্তান্ত দিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেন এই সকল সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলার ভিতর পরস্পর বিবাহ হয় না। কিন্তু এই তথ্যের অর্থ বুঝা কঠিন। স্কটল্যাণ্ডের নৃতত্ত্ববিৎ ম্যাক্লেনান নেপোলিয়ানি যথেচ্ছাচারের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন :—"জাতিগুলা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীকে এক্সোগেমাস বলে। অর্থাৎ

ইহার পরস্পরবিবাহ নিষিদ্ধ। অপর এণ্ডোগেমাস বলে। এখানে কেন্দ্রের ভিতরকার নরনারী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়।"

এই ধরণের হ-য-ব-র-ল সৃষ্টি করিয়া ম্যাক্লেনান আর এক অদ্ভুত আবিষ্কারে মাতিয়া গিয়াছিলেন। "এক্সোগেমি বা (বহির্ব্বিবাহ) পুরাণো কি "এণ্ডোগেমি" (অর্থাৎ অন্তর্ব্বিবাহ) পুরাণো এই আলোচনায় তাঁহার দিন কাটিয়াছে। রক্তসংশ্রবের জোরে গোষ্ঠী কায়েম হয়, সুতরাং গোষ্ঠীর ভিতর নরনারীর বিবাহ অসম্ভব, মর্গ্যান যেই এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন তখনই ম্যাক্লেনানের অদ্ভুত মতগুলা চাপা পড়িয়া গেল: ইরোকোআদের ভিতর নিষেধ বিধানটা বেশ জারি।

চতুর্থতঃ, লোক মারা পড়িলে তাহাদের সম্পত্তি গোষ্ঠীর অন্যান্য ব্যক্তির হাতে আসে। গোষ্ঠীর বাহিরে কেহ এই ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় ভাই, বোন এবং মামারা। মেয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিজ ছেলেপুলে এবং বোন, কিন্তু ভাইয়েরা নয়। স্বামীর ধনে স্ত্রীর অধিকার নাই, স্ত্রীর ধনেও স্বামীর অধিকার নাই। আবার ছেলেপুলেরা জনকের সম্পত্তি ভোগ করিতে অধিকারী নয়।

পঞ্চমতঃ, গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ কোনো বিদেশী যদি তাহাদের কোনো এক জনের লোক্সান্ করে তাহা হইলে গোটা গোষ্ঠী প্রতিহিংসার ধর্ম্মে মাতিয়া উঠে। লোক্সান্ মাত্রই গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত নয়। গোটা ইরোকোআ সমাজে "রক্তহিংসা" সুপ্রচলিত। বিদেশীর হাতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে গোষ্ঠী সেই বিদেশীর প্রাণ সংহার করিতে অধিকারী। যদি

দোষী ব্যক্তির গোষ্ঠী আপোসে মাপ চায় অথবা ক্ষতি পূরণ করিতে রাজি হয়, তাহা হইলে কোনো কোনো সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী তাহাতেই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে শান্ত না হইলে গোষ্ঠী এক বা একাধিক লোক বহাল করিয়া সেই দোষীকে যমালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। যদি দোষী এই উপায়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার গোষ্ঠী হইতে কোনো নালিশ চলিতে পারে না। খুনের সাজা খুন,—এই নীতি সকল গোষ্ঠীই মানিয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীরই কতকগুলা বাঁধা নাম আছে। এই নামকরণ একচেটিয়া। অর্থাৎ অন্যান্য গোষ্ঠীতে কোনো ব্যক্তি এই সকল নামে পরিচিত হইতে পারে না। কাজেই একটা নাম শুনিবামাত্র তাহার "গুষ্টির খবর" বলিয়া দেওয়া সম্ভব। নামের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা দাবীদাওয়াও গোষ্ঠীগত।

সপ্তমতঃ, বিদেশীকে নিজের করিয়া লওয়া গোষ্ঠীর এক্তিয়ারের অন্তর্গত। একবার কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলে বিদেশীরা গোটা "জাতির" লোকই বিবেচিত হয়। লড়াইয়ের বন্দী সকলকেই খুন করা হয় না। যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা এই প্রণালীতে গোষ্ঠীর পোষ্যপুত্র বিশেষ। এই ধরণের বহু পোষ্য সেনেকা "জাতির" অন্তর্গত হিসাবে "গোষ্ঠীর" এক্তিয়ার ভোগ করে। পোষ্যগ্রহণ করিবার জন্য গোষ্ঠীর কোনো লোককে বলিতে হয়;—"আমি অমুককে ভাই বা বোন বলিয়া গ্রহণ করিলাম।" মেয়েরা পোষ্যগ্রহণ করিবার সময় বলে;—"অমুক বিদেশী আজ হইতে আমার সন্তান।" পোষ্যগ্রহণ কাণ্ড একটা বড় গোছের ঘটাসমন্বিত উৎসববিশেষ।

গোষ্ঠীতে লোক কমিতে থাকিলে এই উপায়েই লোকসংখ্যা বাড়ানো হইয়া থাকে। এক গোষ্ঠী হইতে অপর গোষ্ঠীতে পোষ্য লওয়ার রেওয়াজ অনেক দেখা গিয়াছে। ইরোকোআদের ভিতর "জাতি"-সভার প্রকাশ্য বৈঠকে ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত "পোষ্য-যজ্ঞ" অনুষ্ঠিত হয়।

অষ্টমতঃ, ধর্ম্মকর্ম্ম নামে কতকগুলি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান ইণ্ডিয়ান সমাজে দেখা যায় না। গোষ্ঠীর সংশ্রবেই ইহাদের ধর্ম্মোৎসব-জাতীয় সকল কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে "সাখেম" এবং লড়াইনায়ক পুরোহিতের কাজ করে। ইহাদিগকে তখন ধর্ম্মরক্ষক বলা হয়। বৎসরে ছয়টা মহোৎসব ইরোকোআদের পঞ্জিকায় ঠাঁই পাইয়াছে।

নবমতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক একটা সার্ব্বজনিক কবরের ঠাঁই আছে। নিউইয়র্ক প্রদেশে শ্বেতাঙ্গ নরনারীরা ইরোকোআদের সকল জায়গাই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কাজেই আজকাল আর ইহাদের স্বতন্ত্র গোরস্থান দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। ইরোকোআদের নিকট-আত্মীয় তুস্কারোরা এবং অন্যান্য সমাজে আজও গোষ্ঠীগত সার্ব্বজনিক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল ইহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে পরিণত। তথাপি গোরস্থানের ভিতর প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য নিজ নিজ কবরের সারি নির্দ্দিষ্ট আছে। জননীকে তাহার সন্তানসন্ততির সারিতেই কবর দেওয়া হয়। কিন্তু জনকের ঠাঁই অন্যত্র। ইরোকোআ সমাজে গোটা গোষ্ঠী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সাহায্য করে।

দশমতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর একটা করিয়া সভা বা পরিষৎ থাকে। প্রবীণ বয়সের যে কোনো পুরুষ এবং নারী এই সভায়

বসিতে পারে। প্রত্যেকের অধিকারও সমান। "সাখেম," লড়াই-নায়ক এবং ধর্ম্মরক্ষক তিনজাতীয় কর্ম্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠী-সভার কাজ। প্রতিহিংসা লওয়া এবং পোষ্যগ্রহণ করাও এই সভায় আলোচিত হয়। গোষ্ঠীর সকল কাজেই সভার কর্ত্তৃত্ব বিরাজমান।

এই দশ দফা হইতে বেশ বুঝা যায় কেন মর্গ্যান ইণ্ডিয়ান সমাজকে সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল বিবেচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সমান। "সাখেম" ইত্যাদি নায়কেরাও কোনো বিষয়ে "হাতীঘোড়া" নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাধীনতার সহায় এবং সংরক্ষক।

গোষ্ঠী যখন এই রূপ ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্রের নিয়মে গঠিত, তখন গোষ্ঠী-সমন্বিত "জাতি" এবং জাতি-সমন্বিত "ফেডোরেশ্যন" ও সাম্যমূলক গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মর্গ্যান গোষ্ঠীর স্বধর্ম্মগুলা আলোচনা করিতে গিয়াই ইরোকোআ এবং অন্যান্য সমাজের "যুক্তরাষ্ট্রের" বনিয়াদ্ দখল করিতে পারিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান-সমাজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মকর্ত্তৃত্বের গোড়ার কথা গোষ্ঠীর জীবন।

উত্তর আমেরিকা যে সময় ইয়োরোপের আবিষ্কারে আসে, তখন সেখানকার সকল অধিবাসীই "জননীবিধির" নিয়মে গোষ্ঠীর বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। কেবলমাত্র ডাকোটা সমাজে গোষ্ঠী প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু ওজিবাওয়া, ওমাহা এবং যুকাটানের "মায়া" সমাজে মেয়ের ঠাঁইয়ে পুরুষের উত্তরাধিকার দেখা দিয়াছিল।

ফ্রাত্রী

কোনো কোনো "জাতি" পাঁচ ছয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ইহাদের তিন, চার বা পাঁচটায় মিলিয়া এক একটা সমাজ-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিত। এই ধরণের গোষ্ঠী-সমবায়কে মর্গ্যান প্রাচীন গ্রীক্ প্রথার অনুরূপ বিবেচনা করিয়াছেন। এই গোষ্ঠী-সমবায়কে ইনি গ্রীক "ফ্রাত্রী" শব্দে অভিহিতও করিয়াছেন। ইরোকোআদের সেনেকা "জাতির" আট গোষ্ঠী। এই আট গোষ্ঠী দুই ফ্রাত্রীর অন্তর্গত। প্রত্যেক ফ্রাত্রীতে চারটা করিয়া গোষ্ঠী ছিল।

এই ফ্রাত্রীগুলার উৎপত্তি হইল কি করিয়া? সাবেক কালে ফ্রাত্রী স্বয়ংই একটা সম্পূর্ণ জাতি বিবেচিত হইত। প্রত্যেক ফ্রাত্রীতে অন্ততঃ দুইটা করিয়া গোষ্ঠী থাকা আবশ্যক হইত কেননা তাহা না হইলে বিবাহের বরকন্যা জুটিত না। মনে রাখিতে হইবে যে, কোনো এক গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ।

"জাতিটা" লোকসংখ্যায় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীও দুই বা ততোধিক টুক্‌রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তখন এক একটা সাবেক গোষ্ঠী ফ্রাত্রীতে পরিণত হইত। ফ্রাত্রীর সঙ্গে গোষ্ঠীর রক্তসম্বন্ধ অতি নিকট।

সেনেকা এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান-সমাজে ফ্রাত্রীর অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলা পরস্পর ভাই স্বরূপ। অপরাপর ফ্রাত্রীর গোষ্ঠীর সঙ্গে এই সব গোষ্ঠীর সম্বন্ধ খুড়তুত, জ্যেঠতুত বা মাসতুত, পিসতুত ভাইয়ের মতন। এই কারণে প্রথম প্রথম সেনেকারা ফ্রাত্রীর

ভিতর বিবাহের আদান প্রদান নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু পরে একমাত্র গোষ্ঠীর ভিতর এই নিষেধ আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ভল্লুক এবং হরিণ এই দুই গোষ্ঠীকে স্নেনেকারা সর্ব্ব প্রাচীন বিবেচনা করে। ইহাদের লোকপরম্পরা অনুসারে অন্যান্য গোষ্ঠী এই দুই গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গোষ্ঠীগুলা কোনো কোনো সময় "নির্ব্বংশ"ও হইয়াছে; তখন কোনো ফ্রাত্রী হইতে একটা গোটা গোষ্ঠী আসিয়া তাহার ঠাঁই পূরণ করিয়াছে। এই কারণে গোষ্ঠীর নাম দেখিয়া অতি সহজে তাহার সঙ্গে ফ্রাত্রীগুলার এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্বন্ধ বুঝা যায় না। সর্ব্বত্রই কিছু কিছু জটিলতা সৃষ্ট হইয়াছে।

ইরোকোআদের ফ্রাত্রীকে কোনো কোনো বিষয়ে সমাজ-কেন্দ্র বিবেচনা করিতে হইবে। ধর্ম্ম-কেন্দ্র রূপেও ইহার কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

১। বল খেলার বেলায় ফ্রাত্রীতে ফ্রাত্রীতে টক্কর চলে. প্রত্যেকেই নিজ নিজ সেরা খেলোআর পাঠায়। দুই দলের অন্যান্য লোকেরা দুই দিকে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ খেলোআর দিগকে উৎসাহিত করে। খেলার উপর বাজীও চলে।

২। "জাতি"-সভায় প্রত্যেক ফ্রাত্রীর "সাখেম" এবং লড়াই-নায়কেরা পরস্পর উল্টাদিকে মুখামুখি হইয়া বসে। বক্তারা দুইদিকে ফিরিয়া দুই স্বতন্ত্র দলের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া থাকে.

৩। কোনো লোক খুন হইলে গোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ফ্রাত্রীর অন্যান্য গোষ্ঠীর নিকট আবেদন করে। ফ্রাত্রীর বৈঠক ডাকিয়া শল্লা করে। পরে খুনীর ফ্রাত্রীকে ক্ষতিপূরণের জন্য তলব করা হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বাদানুবাদ চলে না। মামলা

মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় ফ্রাত্রীতে ফ্রাত্রীতে। এই ক্ষেত্রে ফ্রাত্রীকে সাবেক কালের "জাতির" জেরই বিবেচনা করা উচিত।

৪। গোষ্ঠীতে কোনো নামজাদা লোক মারা পড়িলে নিজ ফ্রাত্রীর নরনারীরা শোকের ভার বহন করে মাত্র। কিন্তু কবর দেওয়া এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অন্যান্য কাজের জন্য "জাতির" অপর ফ্রাত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করে। "সাখেমে"র মৃত্যু হইলে জাতিকে এবং ইরোকোআ যুক্ত-সভাকে খবর দেওয়ার ভারও এই অপর ফ্রাত্রীর হাতে।

৫। "সাখেম" নির্বাচনের বেলায়ও একমাত্র নিজ ফ্রাত্রীর মতামতই চরম নয়। অপর ফ্রাত্রী আপত্তি করিলে বাছাই রদ্ হইতে পারে।

৬। ধর্মকর্মের কাণ্ডেও প্রত্যেক ফ্রাত্রী নিজস্ব রক্ষা করিয়া চলে। সেনেকা-সমাজে ধর্ম লইয়া কিছু কিছু গুহ্য কারবার আছে। এই সকল কারবার দুই সমিতির অধীনে পরিচালিত হয়। যে-সে লোক এই সব সমিতিতে ঠাঁই পায় না। নানা প্রকার তুক্‌তাকের চল আছে। তদনুসারে সভ্য বাছাই হয়। কিন্তু প্রত্যেক ফ্রাত্রী এক একটা সমিতির অধিকারী। সেনেকাদের আট গোষ্ঠীর দুই ফ্রাত্রীর জন্য দুই সমিতি আছে।

৭। ৎলাস্কালার চার কোণে চার বংশ দিক রক্ষার ভার লইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় এই রীতি দেখা গিয়াছে। এই চার বংশকে যদি চার ফ্রাত্রী বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, গ্রীক্ সমাজের মতন ইণ্ডিয়ান-সমাজেও ফ্রাত্রী ছিল সামরিক জীবনের কেন্দ্র। জার্ম্মাণ-সমাজেও এই ধরণের সামরিক কেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক

বংশই নিজ পোষাকে সাজিয়া, নিজ নিশান লইয়া স্বতন্ত্র দলে লড়িতে যাইত। প্রত্যেক নায়কই ছিল স্বতন্ত্র।

"জাতি" (ট্রাইব)

একাধিক গোষ্ঠীর মিলনে হয় ফ্রাত্রী। সেইরূপ একাধিক ফ্রাত্রীর সমবায়ে "ট্রাইব" বা "জাতি" গড়িয়া উঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে,---বিশেষতঃ যেখানে লোক-সংখ্যা নেহাৎ কমিয়া আসিয়াছে,—মধ্যের কেন্দ্রটা অর্থাৎ ফ্রাত্রী আজকাল আর দেখা যায় না।

ইণ্ডিয়ান-সমাজে "ট্রাইব" (জাতি) কাহাকে বলিব? প্রত্যেক গোষ্ঠী এবং ফ্রাত্রীর মতন প্রত্যেক "জাতি"রও কতকগুলা "সামান্য লক্ষণ" আছে। এইগুলিকে জাতির "স্বধর্মের" অন্তর্গত বিবেচনা করিতে হইবে।

১। প্রত্যেক "জাতি" একটা স্বতন্ত্র জনপদের অধিকারী। ইহার একটা বিশিষ্ট নামও আছে। জনপদ সুবিস্তৃত। শিকার এবং মাছ ধরার সুযোগও জমিজমার অন্তর্গত। জাতিগত জনপদ বা "দেশের" লাগাও জমিন কাহারও সম্পত্তি নয়। এই "খোলা মাঠের" সাহায্যে পরবর্ত্তী জাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয়। অনধিকৃত "উদাসীনীকৃত" জমিনটার আয়তন কখনও ছোট, কখনও বা বেশ বড়। জাতি দুইটা যদি ভাষায় লাগলাগি হয়, তাহা হইলে অল্প মাত্র "খোলামাঠের" রেওয়াজ থাকে। কিন্তু দুইএর ভাষায় যদি কোন প্রকার সংশ্রব না থাকে তাহা হইলে "উদাসীন" জমিনের বিস্তৃতি খুব বেশি।

ইণ্ডিয়ান-সমাজের এই জাতিগত বা দেশগত পার্থক্যের

নিয়ম প্রাচীন জার্ম্মাণ সমাজেও দেখা গিয়াছে। বনভূমিগুলা ছিল জার্ম্মাণদের সীমানা বিশেষ। সীজার বলেন, সুয়েভিরা তাহাদের স্বদেশকে মরুভূমি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। ডেনিশ এবং জার্ম্মাণ জাতিদ্বয়ের পার্থক্য সাধিত হইত "ইজার্ণহোল্ট" এর দ্বারা। ইহাকে ডেনিশ ভাষায় "য়ার্ণবেড" বলে। স্যাক্সনদের সীমানা ছিল "জ্যাক্সেন হ্বাল্ড" (স্যাক্সন্ বল)। শ্লাভজাতি হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণরা "ব্রাণিবর' কায়েম করিয়াছিল। এই শ্লাভ শব্দ আজকালকার "ব্রাণ্ডেনবুর্গ" প্রদেশের মূলে দেখিতে পাইতেছি।

এই ধরণের সীমানার ভিতরকার সকল জমিজমা জাতির সমবেত সম্পত্তি। অন্যান্য জাতিরা সেই জাতির অধিকার স্বীকার করিয়া চলে। এই ভূমি অন্যান্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে না বাড়া পর্য্যন্ত স্বভুমির সীমানা কাঠায় বিঘায় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও চলে। কিন্তু চৌহদ্দি নির্দ্দেশ করার দরকার লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ই হয়।

জাতিগুলার নামকরণ কেন হয় বলা কঠিন। নরনারীরা নিজে বাছিয়া একটা নাম গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। নাম একটা আকস্মিক অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনাবিশেষ। কোনো কোনো সময়ে নিজেরা হয়ত একটা নাম বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিবেশী জাতি তাহাকে অন্য এক নামে ডাকে। জার্ম্মাণদের নামও তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী কেল্টজাতির দেওয়া।

২। প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া স্বতন্ত্র ভাষা আছে। ভাষা এবং জাতি আয়তনে সমবিস্তৃত। যতদূর স্বভাষা, ততদূর

স্বজাতি। আমেরিকার পুরাণো ভাষা ভাঙিয়া নয়া নয়া ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া জাতিও দেখা দিয়াছে। এইরূপে নব নব ভাষা ও জাতি র উৎপত্তি আজও চলিতেছে। কখনো কখনো দুই দুর্ব্বল জাতি সম্মিলিত হইয়া একটা জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ব্যবস্থায় উভয়েই নিজ নিজ ভাষার ব্যবহার রক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। গড়পড়তা ২০০০ হাজার নরনারী এক একটা ইণ্ডিয়ান ভাষায় কথা বলে। অর্থাৎ এতগুলা লোক এক একটা জাতির অন্তর্গত। চেরোকীরা গুণ্তিতে ২৬০০০। অন্য কোনো ভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেশি নয়।

৩। প্রত্যেক জাতি নিজ ফ্রাত্রীর অনুমোদিত এবং গোষ্ঠীর নির্ব্বাচিত "সাখেম" এবং লড়াই-নায়ক কে প্রকাশ্য সভায় গদিতে বসাইবার অধিকারী।

৪। গোষ্ঠীর মতের বিরুদ্ধে জাতি ইচ্ছা করিলে এই নায়কগণকে বরখাস্ত করিতেও পারে। গোষ্ঠী-নায়কেরা সকলেই "জাতি-সভার" সভ্য। কাজেই তাহাদের উপর জাতির এক্তিয়ার থাকা অস্বাভাবিক নয়। জাতিগুলা আবার এক বৃহত্তর কেন্দ্রের (ফেডারেশ্যনের) অন্তর্গত। কাজেই ফেডার্যাল-সভাও ইচ্ছা করিলে গোষ্ঠীনায়কগণকে বরখাস্ত করিতে পারে।

৫। প্রত্যেক জাতি কতকগুলা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মকর্ম্ম মানিয়া চলে। অন্যান্য "বার্ব্বার"দের মতনই ইণ্ডিয়ানরাও ধার্ম্মিক জাতি। তাহাদের দেবদেবী-তত্ত্ব এবং রীতিনীতিগুলা সম্বন্ধে সবে মাত্র গবেষণা সুরু হইয়াছে। মানুষের আকারে তাহারা দেবদেবীর কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিমা গড়িবার যুগ

পর্য্যন্ত ইহারা উঠিতে পারে নাই। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের আরাধনা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার কথা। সর্ব্বভূতে ঐশীশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পথে ইহারা ধাপে ধাপে উঠিতেছে। নাচগান, খেলাধূলা সমন্বিত মহোচ্ছবের সঙ্গে প্রত্যেক জাতি ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত। নাচ এই সকল পালা-পার্ব্বণের বিশেষত্ব। ধর্ম্মকর্ম্মে প্রত্যেক জাতি নিজ স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া চলে।

৬। সার্ব্বজনিক কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া সভা থাকে। এই সভায় বসে জাতির অন্তর্গত গোষ্ঠীনায়কেরা। ইহারাই খাঁটি প্রতিনিধি,—কেন না ইহাদের যখন তখন বরখাস্ত করা সম্ভব। সভার কাজকর্ম্ম চলে খোলা বাজারে। অর্থাৎ জাতির যে কোনো লোক—মেয়েরাও—সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগ দিতে অধিকারী। কিন্তু বিচার এবং ব্যবস্থা করিবার এক্তিয়ার একমাত্র সভারই। প্রত্যেক বিধান "সর্ব্বসম্মতি"ক্রমে জারি হওয়া চাই। জার্ম্মাণদের "মার্ক"-সভায়ও এইরূপ "সর্ব্বসম্মিতি"র নিয়ম ছিল। "বিদেশী" অর্থাৎ অন্যান্য জাতির সঙ্গে—"পররাষ্ট্র" বিষয়ে—সভার কাজগুলা প্রধান ঠাঁই অধিকার করে। বিদেশীদের দূত গ্রহণ করা এবং লড়াই বা সন্ধি ঘোষণা করাও সভার কাজ। স্বেচ্ছাসেবকরাই লড়ায়ের প্রধান ফৌজ।

যে যে জাতির সঙ্গে মিত্রতার সন্ধি কায়েম হয় নাই, তাহাদের সঙ্গে জাতিমাত্রেরই লড়াইয়ের নীতি চলিতে পারে। এই ধরণের শত্রুদের বিরুদ্ধে নামজাদা যোদ্ধারা লড়াইয়ের কাজকর্ম্মে ভার লয়। পল্টনের সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য

ইহারা "লড়াইয়ের নাচ" সুরু করিয়া দেয়। যে যে এই নাচে যোগ দেয় তাহারাই স্বেচ্ছাসেবক। যাহা নাচে যোগ, তাঁহা দলগঠন এবং রণযাত্রা। অপরপক্ষেও স্বয়ংসেবকেরাই "স্বদেশ" রক্ষার ভার লয়। লড়াইয়ের যাত্রার সময় এবং লড়াই হইতে ফিরিবার সময় দেশ সুদ্ধ হৈ হৈ রৈ রৈ এবং মহোচ্ছোব চলে।

এমন কি "জাতিসভার" অনুমতি না লইয়াই স্বয়ংসেবকেরা এই ধরণের লড়াই বাধাইতে পারে। তাসিতুষ-বিবৃত জার্ম্মাণ সমাজেও এই ধরণের স্বয়ংসেবকনিয়ন্ত্রিত লড়াইয়ের নিয়ম দেখিতে পাই। কিন্তু জার্ম্মাণদের ভিতর স্বয়ংসেবকের দল স্থায়ী সংগঠনের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। শান্তির সময়ও এই দল বজায় থাকিত।

বিপুল সেনাবাহিনী এই বিধানে দেখা যায় না। দূরদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উপলক্ষেও ইণ্ডিয়ানরা অল্পসংখ্যক ফৌজের দলই কায়েম করিতে অভ্যস্ত। প্রত্যেক দল নিজ নিজ নেতার হুকুম তামিল করে। এই সকল নেতারা একত্রে মিলিয়া রণনীতি এবং লড়াইয়ের কৌশল সম্বন্ধে শলা করে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ রাইণের আলেমানি জার্ম্মাণরাও এই প্রণালীতেই লড়াইয়ের ব্যবস্থা করিত।

৭। কোনো কোনো জাতির মাথায় একজন নায়ক দেখিতে পাই। তাঁহার ক্ষমতা অবশ্য যথেষ্ট সঙ্কুচিত। সাধারণতঃ এই ব্যক্তি অন্যতম "সাখেম"। "জাতিসভা" বসিয়া ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জাতি-নায়ক কাজ সামলাইতে অধিকারী। মোটের উপর ইহাকে "স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষ" বিবেচনা করা বলিতে

পারে। উচ্চতম লড়ায়-নায়কই পরবর্ত্তী কালে স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

সংযুক্ত-জাতি

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ভিতর একাধিক জাতি সম্মিলিত হইয়া এক একটা লীগ বা জাতিসমবায় বা "সংযুক্ত-জাতি" গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই ধরণের "সংযুক্ত-জাতি"ই ইণ্ডিয়ান সমাজ বিন্যাসে চরমতম কেন্দ্র।

অল্পসংখ্যক লোকের জাতিগুলা পরস্পর লড়াই করিয়া মরিত। ইহাদের অধীনে জমি থাকিত অনেক। পরস্পরের ভিতর ব্যবধানও স্থানহিসাবে যথেষ্ট। এই সকল অসুবিধা এড়াইবার জন্য মাঝে মাঝে আত্মীয় বা কুটুম্ব শ্রেণীর জাতিরা লীগ গড়িয়া তুলিতে ঝুঁকিত। কিন্তু লীগগুলা বেশিদিন টিকিত না। আবার দুর্য্যোগ চলিয়া গেলেই জাতিরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়িত। শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই কোনো কোনো জাতি লীগ ভাঙ্গিয়া দিবার পরও আবার এক লীগ কায়েম করিয়াছে। ইরোকোআরা ইণ্ডিয়ানদের "সংযুক্ত-জাতি" গঠনের প্রয়াসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মিসিসিপি দরিয়ার পশ্চিমে ইরোকোআদের আদিম বাসস্থান। ইহারা বোধ হয় বিশাল ডাকোটা সমাজেরই এক অংশ। নানা জনপদে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে ইহারা বর্ত্তমান নিউ-ইয়র্ক প্রদেশে আসিয়া আড্ডা গাড়ে। ইরোকোআদের পাঁচ জাতি:—সেনেকা, কায়ুগা, ও নোণ্ডাগা, ও নাইডা এবং মোহক।

মাছ এবং হরিণের মাংস ইরোকোআদের প্রধান খাদ্য। আদিম ধরণের বাগান হইতে শাকসব্জীও আসে। ইহাদের পল্লীগুলা খুঁটার বেড়া দিয়া দুর্গাকারে সুরক্ষিত। ইহাদের লোক সংখ্যা বিশ হাজার। কোনো কোনো "গোষ্ঠী" পাঁচ জাতির প্রত্যেকটাই বিদ্যমান। ইহাদের সকলের ভাষা প্রায় এক ভাষারই বিভিন্ন শাখা স্বরূপ। "দেশগুলা"ও পরস্পর লাগা।

পুরাণো ইণ্ডিয়ানদিগকে খেদাইয়া দিয়া ইরোকোআ ইণ্ডিয়ানরা নিউইয়র্কের জনপদে জনপদে জুড়িয়া বসিয়াছিল। শত্রুদের উপর বিজয় লাভের ফলে ইহাদের দখল অধিকার হইয়াছে। এই কারণে,—বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—পাঁচ বিজয়ী জাতি "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" এক লীগ বা মিত্রসঙ্ঘে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরোকোআ "সংযুক্ত-রাষ্ট্রের" চরম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাদের তাঁবে ছিল বিপুল জনপদ। বহু নরনারী ইহাদের করদাতায় পরিণতও হইয়াছিল।

মেক্‌সিকো, নিউমেক্‌সিকো এবং পেরু এই তিন দেশের ইণ্ডিয়ানরা "বার্ব্বার" যুগের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু আমেরিকার অন্যান্য আদিমবাসীরা কোনো দিন "বার্ব্বার" অবস্থার নিম্নতর কোঠা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। নিউইয়র্ক প্রদেশের ইরোকোআ "সংযুক্ত-রাষ্ট্র" এই সকল নিম্নতর "বার্ব্বার" সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

ইরোকোআদের "সংযুক্ত-রাষ্ট্রে" নিম্নলিখিত বিধানের পরিচয় পাই :—

১। সমরকক্ষ পাঁচ "জাতি" চিরকালের জন্য মিত্রসঙ্ঘে

পরিণত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক জাতি পুরাপুরি স্বাধীন। জাতিগুলার ভিতর পরস্পর সাম্যও সুরক্ষিত। রক্তের ঐক্যই এই যুক্তজাতির গোড়ার কথা। তিনটা জাতিকে জনকস্থানীয় বিবেচনা করা হইত। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া ডাকিত। অপর দুই জাতি ছিল সন্তানস্থানীয়। ইহারাও পরস্পর ভাই স্বরূপ।

প্রত্যেক জাতির ভিতরকার "গোষ্ঠী"গুলার ভিতরও রক্তের টান বেশ স্পষ্ট। সর্ব্বপ্রধান তিনটা গোষ্ঠী পাঁচ জাতির প্রত্যেকটায়ই জীবিত ছিল। গোষ্ঠীর লোকেরা (বিভিন্ন "জাতির" অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও) পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত। আর তিনটা গোষ্ঠীর লোকজন মাত্র তিনটা জাতির ভিতর জীবিত ছিল। ইহারাও পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত।

ভাষার ঐক্যও পাঁচ জাতিকে এক পূর্ব্বপুরুষের এবং এক রক্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। ইরোকোআ যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তির দুর্ব্বলতার কোনো কারণ ছিল না।

২। "সংযুক্ত-রাষ্ট্রের" জন্য ছিল সংযুক্ত-সভা বা পরিষৎ। এই ফেডার‍্যাল সভায় বসিত পঞ্চাশজন "সাখেম"। ইহাদের ক্ষমতা এবং ইজ্জৎ সমান সমান। যুক্তজাতি-সম্পর্কিত অর্থাৎ ফেডার‍্যাল সকল কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধেই এই পরিষদের অধিকার।

৩। যুক্তজাতি-সম্পর্কিত কাজ কর্ম্মের জন্য প্রত্যেক জাতিকে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীকে দায়িত্ব লইতে হইত। সেই সকল দায়িত্বের কাজে সংযুক্ত-পরিষৎ পঞ্চাশ "সাখেম"কে বহাল করিত। বস্তুতঃ ফেডার‍্যাল নামে এই পঞ্চাশটা পদ নয়া কায়েম করা হইয়াছিল। পদগুলার জন্য কর্ম্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠীর

অধিকার। গোষ্ঠী দ্বারা ইহাদিগকে বরখাস্ত করাও সম্ভব; কিন্তু সংযুক্ত-সভা মঞ্জুর না করিলে কোনো "সাখেম" সংযুক্ত কাজের গদিতে বসিতে পারিত না।

৪। সংযুক্ত-পরিষদের কর্ম্মচারীস্বরূপ এই "সাখেম"রা নিজ নিজ জাতির "সাখেম"ও থাকিত। নিজ নিজ "জাতি-সভায়"ও ইহাদের আসন ছিল।

৫। সংযুক্ত-পরিষদের সকল বিধানে "সর্ব্বসম্মতি" আবশ্যক।

৬। প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র দলবদ্ধ ভাবে মত দিত। অর্থাৎ "জাতি-সভার" লোকেরা সংযুক্ত-সভায় বসিয়া আলাদা আলাদা যার যেরূপ খুশী ভোট দিতে পারিত না।

৭। যে কোনো জাতি সংযুক্ত-সভার বৈঠক বসাইতে অধিকারী ছিল। আপন খেয়ালে সংযুক্ত-সভা নিজের বৈঠক ভাঙিতে পারিত না।

৮। সংযুক্ত-পরিষৎ খোলা বাজারে কাজ চালাইত। ইরোকোআ সমাজের যে কোনো লোক সভায় উপস্থিত থাকিতে অধিকারী ছিল এবং আলোচনায় যোগ দিতেও পারিত। কিন্তু ভোট দিবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র পরিষদের সভ্যদের।

৯। ইরোকোআ যুক্ত-রাষ্ট্রের মাথায় কোনো নায়ক বা স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল না।

১০। লড়াইয়ের জন্য দুই জন নায়কের ব্যবস্থা ছিল। উভয়ের ক্ষমতা এবং কাজকর্ম্ম একরূপ ও সমান। স্পার্টায় এই ধরণেরই দুই রাজাকে এবং রোমে দুই কন্‌সালকে শাসন পদ্ধতির প্রধান অঙ্গস্বরূপ দেখিতে পাই।

এই গেল ইরোকোআদের রাষ্ট্র শাসনের রীতি। চার শ' বৎসর ধরিয়া ইহারা এই পদ্ধতি অনুসারে সার্ব্বজনিক কাজকর্ম্ম চালাইয়া আসিয়াছে। আজও এই শাসন পদ্ধতিই চলিতেছে।

সেকাল ও একাল

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইরোকোআদের জীবন যাত্রায় খাঁটি "রাষ্ট্র" নামক কোনো বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছিল কি? মর্গ্যানের মতে ইরোকোআদের শাসন ব্যবস্থাগুলাকে "সমাজ" সঙ্ঘের বা সামাজিক কেন্দ্রের নিয়ম কানুনই বিবেচনা করাই উচিত। এই সমাজের লোকেরা রাষ্ট্র নামক সঙ্ঘ বা কেন্দ্র চিনিত না। রাষ্ট্র বলিলে "দণ্ড" দিবার ক্ষমতাওয়ালা একটা সঙ্ঘ বুঝায়। এই সঙ্ঘ সমাজের জনসমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু সেইরূপ দণ্ডধরের ধারণা ইরোকোআদের জন্মে নাই।

প্রাচীন জার্ম্মাণ "মার্ক" বা পল্লীস্বরাজের প্রতিষ্ঠানগুলা বর্ণনা করিতে যাইয়া পণ্ডিত মাওবারও এইরূপই বলিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় জার্ম্মাণরা সমাজশাসনের অধীনে জীবন ধারণ করিত; রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান তাহাদের জানা ছিল না। সামাজিক কেন্দ্রগুলা হইতেই রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রও গড়িয়া উঠিতে পারিত সন্দেহ নাই, পরে গড়িয়া উঠিয়াছিলও। এই কারণে মাওবার প্রাচীনতম পল্লীপ্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডধরের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশও স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন।

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটা জাতি ক্রমশঃ বিশাল মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এক একটা জাতি ভাঙিয়া চুরিয়া

নানা স্ব স্ব প্রধান জাতিতে পরিণত হয়। ভাষাও ভাঙিতে ভাঙিতে একদম স্বতন্ত্র নতুন নতুন বহু ভাষার সৃষ্টি করে। পরবর্ত্তী কালে সেইগুলার ঐক্য ত দূরের কথা, পরস্পর সম্বন্ধও বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। এক একটা গোষ্ঠীও নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইতে থাকে। সাবেক গোষ্ঠীগুলাকে ফ্রাত্রীরূপে বজায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতম গোষ্ঠীদের নাম এমন কি সুদূর-বিস্তৃত পরস্পরবিচ্ছিন্ন জাতির ভিতরও প্রচলিত। নেকড়ে এবং ভল্লুক ইণ্ডিয়ান সমাজের বহু জাতির ভিতরই গোষ্ঠীর নাম জোগাইতেছে। আর ইরোকোআদের যে শাসন প্রণালী বিবৃত হইল তাহা এক প্রকার প্রায় সকল ইণ্ডিয়ান সম্বন্ধেই খাটে। এইমাত্র প্রভেদ যে, কোনো কোনো জাতি উচ্চতম ফেডারাল বা "সংযুক্ত-জাতি" গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

এই সমাজ-শাসনের গোড়ার কথাই গোষ্ঠী। এই গোড়া হইতে ফ্রাত্রী এবং ফ্রাত্রী হইতে জাতি নামক সমাজ-কেন্দ্রের উৎপত্তি। প্রত্যেক কেন্দ্রই রক্তের ঐক্যে গঠিত,—তবে ধাপের পর ধাপে ঐক্যটা কথঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। প্রত্যেক কেন্দ্রই স্বরাট্ এবং তিন কেন্দ্রের পরিপূর্ণ জনসমাজ মানবজীবনের সকল কর্ত্তব্য পালনেই পূরাপূরি সমর্থ। সার্ব্বজনিক কাজের জন্য এই তিন প্রকার সমরক্তজ সমাজকেন্দ্রের অতিরিক্ত আর কোনো কেন্দ্র বা সঙ্ঘ আবশ্যক হয় না।

জগতের যেখানে যেখানে "গেন্‌স্" বা গোষ্ঠী নামক রক্ত-কেন্দ্র বা বিবাহ ও পারিবারিক কেন্দ্র দেখিতে পাই সেইখানেই গোষ্ঠী-ফ্রাত্রী-জাতি সমন্বিত তিন কেন্দ্রে পরিপূর্ণ জনসমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে বিচারে ভুল হইবে না। প্রাচীন গ্রীক্ এবং

রোমাণ সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ঐতিহাসিকগণের নিকট পাইয়াছি। সেইগুলা সবই এই ইণ্ডিয়ানদের শাসন প্রণালীর অনুরূপ। যেখানে যেখানে গ্রীক্ ও রোমাণ জীবন বিষয়ক তথ্য কম মিলে, সেই সকল ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান সমাজের নজির দেখিলেই প্রাচীনতম ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে পারিবে।

কি অপূর্ব্ব সুন্দর সরল এই গোষ্ঠী প্রথা! কোন ফৌজ, বরকন্দাজ, পাহারাওয়ালা, নবাব, আমীর, জমিদার, রাজা-বাদ্‌শাহ্, কোতোয়াল, হাকিম, জজ, জেল, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদির দরকার হয় না। অথচ সকল কাজই চলিতেছে সিল্কিলমিছিল।

ঝগড়াঝাঁটি সবই গোটা কেন্দ্রের—গোষ্ঠীর ফ্রাত্রীর অথবা জাতির শালিশীতে মীমাংসা করা হয়। রক্ত-প্রতিহিংসার বিধান আছে বটে, কিন্তু সে প্রায় এক প্রকার ব্যতিরেক বিশেষ—চরম অবস্থার ব্যবস্থা মাত্র। আজকালকার প্রাণদণ্ড তাহারই আধুনিক রূপ। বর্ত্তমান যুগের "সভ্যতা" মাফিক্ সকল প্রকার সু-কু ইহার সঙ্গে জড়িত।

বর্ত্তমান কালের জটিল আমলাতন্ত্র এই সমাজে অপরিচিত। অথচ তাহার বিধানে আজকালের চেয়ে বেশি পরিমাণ সার্ব্বজনিক কাজ সাম্‌লানো হইয়া থাকে। বাস্তুভিটায় একাধিক পরিবার সমবেত ভাবে বসবাস করে। জমিজমা গোটা জাতির সম্পত্তি। তবে বাগানগুলাকে বাস্তুভিটার সামিল বিবেচনা করা হয় মাত্র। অর্থাৎ সাময়িক ভাবে এই জাতিগত সম্পত্তির উপর পরিবারের ভোগস্বত্ব থাকে।

মামলার বিচারে দুই দলই খোলসাভাবে সামনাসামনি নিষ্পত্তি করিতে অভ্যস্ত। যুগযুগান্তরের গতানুগতিক সনাতন নিয়মগুলাই বিচার কার্য্যে আইনবিশেষ। নির্ধন বা অভাবগ্রস্ত নামক কোন শ্রেণী এই সমাজে নাই। বুড়া, রোগী এবং অকর্ম্মণ্য নরনারীর জন্য যৌথ সম্পত্তি হইতে ব্যবস্থা করা হয়। ব্যক্তিমাত্রেই স্বাধীন এবং পরস্পর সমান। মেয়েদের স্বাধীনতাও অজানা জিনিষ হয়। গোলামের উৎপত্তি হয় নাই। পরাধীন বলিয়াও কোনো জাতি এখানে দেখা যায় না।

১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইরোকোআরা "ঈরী" এবং আর এক "উদাসীন" জাতিকে হারাইয়া নিজেদের সঙ্গে সমান ভাবে "সংযুক্ত-জাতি"র সামিল করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। পরাজিতেরা এই সংযোগ বিধানে আপত্তি করায় তাহাদিগকে তাহাদের মুল্লুক হইতে খেদাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগকে গোলামে পরিণত করিবার অথবা বিজিত জাতি রূপে নিজ তাঁবে রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

এই সমাজের নরনারী কি খাসা! যে সকল শেতাঙ্গ পর্যটক ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহারা ইহাদের আন্তরিকতা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবত্তা এবং সৎসাহস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

সাহসিকতার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগের জীবনেও অনেক পাওয়া গিয়াছে। জুলু এবং নিউবিয়ান জাতির লোকেরা বিনা বন্দুকে একমাত্র বল্লমের সাহায্যে ইয়োরোপীয় সৈন্যদিগকে কাবু করিতে পারিয়াছে। ইংরেজ পল্টন ইহাদের রণনৈপুণ্যে অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য

হইয়াছে। ইংরেজরা বলে যে, এক এক কাফির চব্বিশ ঘণ্টায় ঘোড়ার চেয়ে বেশি চলিতে সমর্থ।

সেকালের নরনারী ছিল এইরূপ। বর্ত্তমান যুগের ধনী-নির্ধনশ্রেণী-বিভক্ত সমাজের মজুর চাষীরা, "বার্ব্বার" যুগের গোষ্ঠীশাসিত স্বাধীন ব্যক্তিদের তুলনায়, যারপরনাই নগন্য। দু'য়ে প্রভেদ বিপুল।

কিন্তু এইখানেই সেই গোষ্ঠী-সভ্যতার সীমানা। ইণ্ডিয়ানরা জাতি-কেন্দ্রের উপরে উঠিতে পারে নাই। সন্ধির ফলে যে যে ক্ষেত্রে লীগ বা "সংযুক্ত-জাতি" গড়িয়া উঠিয়াছিল সে সকল ক্ষেত্রে একটা উচ্চতর কেন্দ্রের অধীনে শান্তি ও শৃঙ্খলা চলিত। কিন্তু অপরাপর জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিত মাত্র খাদ্যখাদকের। জাতির বাহিরে, অতএব গোষ্ঠীর বাহিরে, অতএব শত্রু—এই ছিল "নীতি-শাস্ত্র"। আর শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে পাশবিক নির্দ্দয়তার যথেচ্ছ ব্যবহার চলিত।

প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়া প্রচুর পরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে ইণ্ডিয়ানরা শিখে নাই। এই জন্যই সুবিস্তৃত মহাদেশের অতি সামান্যমাত্র জনপদে অল্প সংখ্যক নরনারীর বিকাশ সাধিত হইতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের জীবনের উপর প্রকৃতি অতি ভীষণভাবে দখল বসাইয়াছিল। জগতের যা কিছু সবই তাহাদের চিন্তায় গুহ্য, রহস্যময়, পবিত্র। এমন কি গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী, জাতি ইত্যাদি সমাজ-কেন্দ্রগুলাও যেন প্রকৃতির গড়া প্রতিষ্ঠান, অতএব প্রণম্য, সকল অবস্থায়ই স্বীকার্য্য। এইরূপ ছিল তাহাদের চিন্তাপদ্ধতি, ইহাই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি।

"বার্ব্বার" যুগের গোষ্ঠীশাসিত জনসমাজগুলা সর্ব্বত্রই এইরূপ

প্রকৃতির দাস। কোনো একটা জাতিকে অপর কোনো জাতি হইতে সহজে পৃথক করা সম্ভব নয়। শিশুর মতন প্রত্যেকের নাড়ীই আদিম প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। সেই সমাজ জগতের সর্ব্বত্রই ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু গোষ্ঠী-প্রথার পরিবর্ত্তে "সভ্যতার" জগতে আসিয়াছে কি বস্তু? ধনী নির্ধন প্রভেদ, অর্থ-পৈশাচিকতা, পরনিপীড়ন এবং সমবেত সামাজিক ধন দৌলতের উপর তুইচারদশজনের প্রভুত্ব। সেকালে আর একালে কি প্রভেদ? গোষ্ঠী-সমবায় বনাম "শ্রেণী"-বিরোধ।

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রীক্ সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা

মান্ধাতার আমলের গ্রীক্ নরনারী

প্রাচীন গ্রীসে নানা জাতি বসবাস করিয়াছে। গ্রীক, পেলাসগিয়ান ইত্যাদি নামে এই সকল জাতি অভিহিত। বোধ হয় ইহারা সকলে একই জাতির বিভিন্ন শাখা বা বংশধর।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজে যে ধরণের শাসন-প্রণালী দেখা যায় মান্ধাতার আমলের গ্রীক্-সমাজেও সেই প্রথাই প্রচলিত ছিল। গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী, জাতি এবং "সংযুক্ত-জাতি" বা জাতি-সঙ্ঘ এই চার প্রকার পর পর উচ্চতর কেন্দ্রে তাহাদের সার্ব্বজনিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত।

এই চার কেন্দ্রের কোনো কোনোটা কোনো কোনো গ্রীক্ সমাজে হয়ত বা ফুটিয়া উঠে নাই। কিংবা ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না। জেরীয় সমাজে ফ্রাত্রী দেখিতে পাই না। অনেক ক্ষেত্রেই "সংযুক্ত-জাতি" বা জাতি-সঙ্ঘ নামে ফেডার্যাল কেন্দ্র গড়িতে পারে নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই গোষ্ঠী-প্রথার চল ছিল।

গ্রীকেরা যখন ইতিহাসের দুয়ারে পা দেয় তখন তাহারা সাবেক কালের "স্যাভেজ" এবং "বার্ব্বার" স্তর ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। "উৎকর্ষের" যুগে তখন তাহাদের জীবন যাত্রা

প্রবেশ করিতেছিল। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজের সর্বোচ্চ কোঠায় আর এই সকল গ্রীক্ সমাজে বেশ বড় দুই ধাপ তফাৎ। "বীরযুগের" গ্রীকেরা ইরোকোআদের চেয়ে এই দুই ধাপ উঁচুতে অবস্থিত ছিল।

এই কারণে ইরোকোআদের আদিম ধরণের গোষ্ঠী-প্রথা গ্রীক্ সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। দলগত যৌন-সম্বন্ধ বা বিবাহ গ্রীসে এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছিল। "জননী-বিধি"র ঠাইয়ে পুরুষাধিপত্য পাকাপাকি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিগত ধনদৌলত বা নিজ স্বত্ব সজোরে মাথা তুলিতেছিল।

স্বত্বের নিয়মে,—উত্তরাধিকার লইয়া একটা নূতন ঢঙ দেখিতে পাই। পুরুষ-বিধি অনুসারে সম্পত্তিশালিনীর ধনদৌলত তাহার স্বামীর প্রাপ্য। অর্থাৎ কন্যার গোষ্ঠী হইতে সম্পত্তি অপর এক গোষ্ঠীতে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই নিয়ম পছন্দসই ছিল না। গোষ্ঠীর একতিয়ার বজায় রাখিবার জন্য নিয়ম করা হইয়াছিল যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে নিজ গোষ্ঠী হইতেই স্বামী গ্রহণ করিতে হইবে।

এইখানে গোষ্ঠী-প্রথার গোড়ার কথাই চাপা পড়িয়াছিল। কেননা গোষ্ঠীর সনাতন বিধানে নরনারীদের ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্পত্তির নববিধানের খাতিরে যৌন সম্বন্ধে বিপ্লব সাধন করিতে নরনারীরা কুণ্ঠিত হয় নাই।

গ্রোটের গ্রন্থে গোষ্ঠী-লক্ষণ

আটিকা প্রদেশের (আথেনিয় সমাজের) গোষ্ঠী-প্রথা আলোচনা করিতে যাইয়া ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রোট্ তাঁহার

প্রসিদ্ধ "গ্রীসের ইতিহাস" গ্রন্থে যে সমাজ-বন্ধন বিবৃত করিয়াছেন তাহার চিত্র নিম্নরূপ।

১। কতকগুলা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। গোষ্ঠীর প্রবর্ত্তক স্বরূপ কোনো পূর্ব্বপুরুষকে দেবতা বিবেচনা করা হইত। এই দেবতাকে এক বিশিষ্ট নামে পূজা করিবার ব্যবস্থা ছিল। পুরোহিত, পূজার আয়োজন ইত্যাদি সবই গোষ্ঠীর পক্ষে সার্ব্বজনিক।

২। গোষ্ঠীর জন্য এক সার্ব্বজনিক গোরস্থান থাকিত (দেমোস্থেনিসের "ইউবুলিদেস্" দ্রষ্টব্য।)

৩। গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরস্পর উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি ভোগ করিবার যোগ্য বিবেচিত হইত।

৪। অত্যাচার উপদ্রব ইত্যাদির সময় গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরস্পর সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিত।

৫। অভিভাবকহীন মেয়েদের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর ভিতর জনগণের পরস্পর বিবাহ বিধিসঙ্গত কর্ত্তব্য বিবেচিত হইত।

৬। গোষ্ঠীর অধীনে খানিকটা সার্ব্বজনিক সম্পত্তি থাকিত। এই সম্পত্তির জন্য একজন সার্ব্বজনিক তত্ত্বাবধায়কও বহাল হইত।

একাধিক গোষ্ঠীর মিলনে ফ্রাত্রীর উদ্ভব হইত। কিন্তু ফ্রাত্রীর বন্ধনগুলা বিশেষ রূপে শক্ত ছিল না। তবে কতকগুলা ধর্ম্ম এবং সামাজিক কাজকর্ম্মে ঐক্য রক্ষিত হইত। বিশেষতঃ ফ্রাত্রীর কোনো ব্যক্তি কোনো উপায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে এবং অপরের হাতে মারা পড়িলে তাহার প্রতিহিংসা লওয়া গোটা ফ্রাত্রীর কর্ত্তব্য থাকিত।

জাতির অন্তর্গত ফ্রাত্রীগুলা সকলে মিলিয়া কতকগুলা ধর্মসংক্রান্ত পালা পার্ব্বণ রক্ষা করিত। এইগুলা জাতি-নায়ক "ফিলোবাসিলিউস্" কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। এই নায়ককে "ইউপাত্রিফেস্" বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী হইতে বাছাই করিবার ব্যবস্থা ছিল।

এই পর্য্যন্ত গেল গ্রোটের কথা। এইখানে মার্ক্স্ টিপ্পনী কাটিয়া বলিতেছেন:—"স্যাহ্বেজ (যথা ইরোকোআদের) রীতিনীতি গ্রীক্ গোষ্ঠীর ধরণ-ধারণে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।" এই মতের সপক্ষে আরও প্রমাণ আছে।

গ্রীক্ গোষ্ঠীর অন্যান্য লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

৭। বংশ এবং উত্তরাধিকার বাপের নামে চলিত।

৮। গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। একমাত্র ব্যতিরেক ঘটিত যখন কোনো মেয়ের উত্তরাধিকারে ধনদৌলত প্রচুর আসিত। এই অবস্থায় মেয়েকে নিজ গোষ্ঠী হইতে পাত্র খুঁজিতে হইত। কিন্তু এই ব্যতিরেক হইতেই সাধারণ নিয়মটা বুঝা যাইতেছে।

বিবাহের সাধারণ নিয়ম অন্যান্য রীতি হইতেও বুঝা যায়। কোনো নারী বিবাহের পর নিজ অর্থাৎ বাপের বাড়ীর ধর্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর গোষ্ঠীর রীতিনীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিত। স্বামীর ফ্রাত্রীতেই নারীর নাম লেখানো ছিল সাধারণ দস্তুর। স্বগোষ্ঠীর বাহিরেই যে বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য এই কথা "দিকায়ার্কস্" এবং "চারিক্লেস্" ইত্যাদি গ্রন্থে স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়।

৯। গোষ্ঠীতে "বিদেশীকে" পোষ্যরূপে নিজের করিয়া

লইবার নিয়ম ছিল। সার্ব্বজনিক ঘটা করিয়া কোনো কোনো পরিবারকে এইরূপ পোষ্য গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত। কিন্তু পোষ্য-প্রথার রেওয়াজ সু-বিস্তৃত ছিল না।

১০। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করিয়া "আর্কন" বা নায়ক থাকিত। নায়ক বাছাই এবং বরখাস্ত করা গোষ্ঠীর তাঁবে ছিল। বাপের পর ছেলে এই পদের অধিকারী হইত বলিয়া কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। "বার্ব্বার" যুগের শেষ পর্য্যন্ত বংশ-পরম্পরায় নায়কত্বের উত্তরাধিকার বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। তখনকার দিনে ধনানিধনের অধিকার যখন সমান ছিল তখন কোনো এক পরিবারে গোষ্ঠী-নায়কত্ব একচেটিয়া হওয়া অস্বাভাবিক।

পরিবার-কেন্দ্র গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের মূল নয়

গ্রোটের ত কথাই নাই, নীবুর, মম্‌সেন ইত্যাদি জার্ম্মাণ গ্রীক ঐতিহাসিকগণও গোষ্ঠী-প্রথায় ফেল মারিয়াছেন। ইহারা এইটা একদম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সকলেই প্রাচীন গ্রীক সমাজের মোটা কথাগুলা তথ্য হিসাবে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। গোষ্ঠীকে ইহারা কতকগুলা পরিবারের দল বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আসল কথা পরিবার গোষ্ঠী-প্রথার কেন্দ্র বা গোড়ার জিনিষ নয়। প্রত্যেক পরিবারে দুই বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তি,—পুরুষ এবং স্ত্রী,—সমবেত হইত। কাজেই পারিবারিক কেন্দ্র আধাআধি পুরুষের গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আধাআধি স্ত্রীর গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। রাষ্ট্রের শাসন-বিষয়ক আইনে পরিবারের কোন ঠাঁই ছিল না।

বস্তুতঃ আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার কোথায়ও "পাবলিক ল" অর্থাৎ রাষ্ট্র-শাসন সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থায় পরিবার নামক কেন্দ্রের কোনো ঠাঁই নাই। "প্রাইভেট্ ল" অর্থাৎ প্রজা বা নাগরিক জীবন বিষয়ক আইনে পরিবারের দাবীদাওয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে মাত্র।

এইখানেই উনবিংশ শতাব্দীর নামজাদা ঐতিহাসিকগণের মস্ত ভুল প্রমাণিত হইতেছে। ইঁহারা পরিবারকে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল সমঝিয়া ছিলেন। অধিকন্তু এই পারিবারিক প্রথাকেও তাঁহারা এক-পতি-(পত্নী) রূপে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই অবৈজ্ঞানিক মত পণ্ডিত মহলে চলিয়া আসিতেছে।

মার্কস্ পণ্ডিতগণের ভুল দেখাইয়া বলিতেছেন:—"গ্রোট্ মহাশয়ের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, গোষ্ঠী-প্রথাটা গ্রীকেরা তাহাদের দেবদেবীতত্ত্বের জন্মকাল পর্য্যন্ত পেছনে লইয়া গিয়া ঠেকাইয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রথা তাহারও আরও পশ্চাতে জন্মিয়াছিল। দেব-দেবীদের জন্মকথা এবং দেবদেবী-বিষয়ক "পুরাণ" সাহিত্য সবই গোষ্ঠীদের গড়া মাল।"

গ্রোটের ভুল

মর্গ্যানের মতে গ্রোট্ একজন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বটে এই কারণে গ্রোটের সাক্ষ্যই মর্গ্যানের আলোচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রোট্ বলেন:—"আটিকার প্রত্যেক গোষ্ঠীর নাম-করণ তাহার প্রবর্ত্তক পূর্ব্বপুরুষের নাম হইতে অনুষ্ঠিত হইত আথেনিয় স্মৃতিকার সোলোনের আমলে পূর্ব্বে এবং পরেও

গোষ্ঠীর লোকেরা উইল না করিয়া মরিলে তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত গোষ্ঠী। কোনো ব্যক্তি খুন হইলে খুনীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে অধিকারী ছিল প্রথমে তাহার আত্মীয়বর্গ, পরে গোষ্ঠীর লোক এবং ফ্রাত্রী। প্রাচীনতম আথেনিয় নীতিশাস্ত্রের সকল বিধানই গোষ্ঠী এবং ফ্রাত্রী কেন্দ্রের জীবন কথাই পরিস্ফুট করিতেছে।"

মার্ক্‌স্ বলেন:—"একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান স্বরূপ যে এই গোষ্ঠী তাহার তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা পাঠশালার পণ্ডিতমর্শ্নদের বাতে কুলায় নাই। ইহারা ত প্রথমেই এই উৎপত্তির কাহিনীকে অলীক গল্প ধরিয়া লইয়াছিলেন; তারপর পরস্পর সম্বন্ধহীন ভিন্ন ভিন্ন পরিবারগুলা কেমন করিয়া গোষ্ঠী সূত্রে আবদ্ধ হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পণ্ডিতমহাশয়েরা গলদঘর্ম্ম হইয়াছেন।"

কিন্তু গোষ্ঠী-প্রথাকে কোনো না কোনো উপায়ে ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। ব্যাখ্যা করিবার কোনো পথ না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা নানা বাক্‌বিতণ্ডার পর "নযযৌ নতস্থৌ" রূপে মন্তব্য ঝাড়িয়াছেন:—"হাঁ, গোষ্ঠী একটা নিরেট সত্য বস্তুই বটে। তবে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে একটা তথ কথিত আদি-পুরুষের দোহাই দেওয়া হয় সে একদম গাঁজাখুরি গল্প মাত্র।"

গ্রোটের চরম কথা এই:—"বস্তুতঃ এই আদি পুরুষ হইতে গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনাই শুনিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র সার্ব্বজনিক পালাপার্ব্বণ, মহোচ্ছোব ইত্যাদি উপলক্ষ্যেই এই তথ্য জনগণের ভিতর আত্মপ্রকাশ করে।"

মার্ক্‌সের টিপ্পনী টিট্‌কারি

গ্রোটের অকৃতকার্য্যতাকে ঠাট্টা করিয়া মার্ক্‌স্ গোষ্ঠী-প্রথার গুরুত্ব পণ্ডিত-সমাজে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রোট্ বলিতেছেন :—"ছোটখাটো গোষ্ঠীগুলাও নামজাদা গোষ্ঠীদের মতনই কতকগুলা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। একজন আদি পূর্ব্বপুরুষ হইতে নিজেদের উদ্ভব সম্বন্ধেও ইহারা নামজাদাদের মতনই দৃঢ় ধারণা পোষণ করে।"

মার্ক্‌সের টিট্‌কারি :—"বড়ই বিস্ময়জনক! কি বলেন, গ্রোট্ মশাই?" "অঁ্যা! সে কি? এমন কি নেহাৎ অপ্রসিদ্ধ গোষ্ঠীগুলার ধারণাও এইরূপ! বড়ই আশ্চর্য্যের কথা!"

গ্রোটের বক্তব্য :—"সকল গোষ্ঠীরই বনিয়াদ্ এবং আদর্শ একরূপ।"

মার্ক্‌সের ঠাট্টা :—"আজ্ঞে! গ্রোট্ মশাই, এ নেহাৎ আদর্শ মাত্র নয়। গোষ্ঠী সম্বন্ধে খাঁটি আধিভৌতিক, বাস্তব বা বস্তুতান্ত্রিক তথ্যই এই।"

মর্গ্যানও গ্রোটের সমালোচনায় এইরূপই বলিয়াছেন। মার্ক্‌স্ এই উপলক্ষ্যে আবার বলিতেছেন :—"গোষ্ঠী ধরণের রক্তের ঐক্যের কথা অন্যান্য সমাজের মতন গ্রীক্-সমাজেও পরস্পরের আত্মীয়তা দৃঢ় বন্ধনে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নরনারীরা শৈশব হইতেই এই নিকট সম্বন্ধের কথা শিখিয়া রাখিত।"

"পরে যখন এক-পতি-পত্নী-ক পরিবার দেখা দেয় তখন এই আত্মীয়তার স্তরগুলা আর লোকের মনে ছিল না। তবে গোষ্ঠী-

গত নামের ইজ্জৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে বংশলতিকার কিম্বৎ কেহই তুলিতে পারিত না।"

"এই অবস্থায় গ্রোট্ এবং নীবুর ইত্যাদি ঐতিহাসিকগণের পন্থা অনুসরণ করিয়া গোষ্ঠীর ভিতরকার আত্মীয়তাগুলা অস্বীকার করা অথবা এইগুলাকে একটা আজগুবি কল্পনাপ্রসূত বা মনগড়া কুটুম্ব সম্বন্ধ বিবেচনা করা একমাত্র কল্পনা-প্রবণ বিজ্ঞানবীর অথবা কেতাবকীটের পক্ষেই সাজে! অতি পুরাণো কালের আদি-পুরুষের কথা এক-পতি-পত্নীকত্বের আমলে গোষ্ঠির লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতমূর্খেরা আগাগোড়া সকল তথ্যই ভুয়ো বা কাল্পনিক সমঝিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

ফ্রাত্রী ও জাতি

গ্রীকদের ফ্রাত্রী ইরোকোআ এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান ফ্রাত্রীর মতনই কতকগুলা গোষ্ঠীর সমবায়ে গড়া জননী-গোষ্ঠী স্বরূপ ছিল। একই পূর্ব্বপুরুষ হইতে সকলগুলার উৎপত্তির ইতিহাস ফ্রাত্রী সম্বন্ধেও পরিস্ফুট হইত। গ্রোট্ বলেন:—"হেকাতেয়াস ফ্রাত্রীর সকল সমসাময়িক নরনারী ষোল পুরুষ উর্দ্ধে অবস্থিত কোনো আদি-দেবতার বংশধর। এই কারণে এই ফ্রাত্রীর অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলা পরস্পর ভাই বিশেষ।"

হোমারের কাব্যে নেস্তর আগামেম্নকে পরামর্শ দিতেছেন:— "ফৌজগুলাকে ফ্রাত্রী ও জাতি হিসাবে সাজাও। ফ্রাত্রীরা পরস্পর এক সঙ্গে থাকিবে আবার জাতিরাও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে।"

ফ্রাত্রীর অন্তর্গত কোনো ব্যক্তি "বিদেশী"র হাতে মারা

পড়িলে গোটা ফ্রাত্রী তাহার "রক্ত-হিংসা" লইতে বাধ্য। এই ছিল সাবেক কালের গ্রীক্ নীতি। অধিকন্তু ধর্ম্মকর্ম্মের কারবারেও ফ্রাত্রী কতকগুলা সার্ব্বজনিক প্রথা মানিয়া চলিত। প্রাচীনতম "আর্য্য" প্রকৃতি-পূজার বিবিধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গ্রীক্ সমাজের গোষ্ঠী এবং ফ্রাত্রীদের কৃতিত্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল

ফ্রাত্রীর মাথায় এক নায়ক থাকিত। তাহার নাম "ফ্রাত্রিয়ার্খোস্"। ফরাসী পণ্ডিত দ' কুঁনাশ্ বলেন:—"ফ্রাত্রী সভাসমিতি করিয়া বিধিনিষেধ জারি করিত। এইগুলা মানিয়া চলা ফ্রাত্রীর অন্তর্গত লোকজনের কর্ত্তব্য বিবেচিত হইত।" পরবর্ত্তী কালে যখন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে তখন গ্রীকেরা তাহাদের গোষ্ঠীগুলাকে সার্ব্বজনিক শাসন বিষয়ে একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু তখনও ফ্রাত্রীর তাবে কতকগুলা সরকারী অধিকার বজায় ছিল।

গ্রীক-সমাজে কতকগুলা ফ্রাত্রীর সমবায়ে জাতির উৎপত্তি হইত। আটিকার ছিল চার জাতি। প্রত্যেক তিন ফ্রাত্রীতে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক ফ্রাত্রীর গোষ্ঠী সংখ্যা ত্রিশ। এই ধরণের অঙ্ক কষিয়া সংখ্যা ঠিক করিয়া দল বাঁধাবাঁধি হইতে মনে হয় যে, আথেনিয় নরনারী কৃত্রিম উপায়ে সজ্ঞানে প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের সমাজ-বিন্যাসে পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছিল। ঠিক কখন এবং কেন এইরূপ সাধিত হইয়াছিল ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রীক্দের জীবনস্মৃতি ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া "বীরযুগের" ঊর্দ্ধে গিয়া ঠেকে নাই।

গ্রীক্দের দেশ ছিল অতি ক্ষুদ্র। লোকেরা বসবাস করিত অতিশয় ঘেঁশাঘেঁশি ভাবে। কাজেই ইহাদের ভিতর ভাষার

প্রভেদ অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই সকল হিসাবে গ্রীক্‌দের অবস্থা আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমেরিকার মতন মহাদেশে সহজেই বিভিন্নতার সৃষ্টি হইত। কিন্তু এমন কি গ্রীসেও প্রধানতঃ ভাষার ঐক্যেই সমাজে ঐক্য দেখা যাইত। গ্রীক্ ভাষাভাষী জাতিগুলা পরস্পর সামাজিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইত। আটিকা প্রদেশের ভাষা কালে গ্রীক্‌-গদ্য-সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়।

হোমারের মহাকাব্যে "ট্রাইব" বা জাতিগুলাকে "নেশ্যনে" বা জাতিসমবায়ে পরিণত দেখিতে পাই। কিন্তু তখনও প্রত্যেক গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি নিজ নিজ বিশেষত্বগুলা বর্জ্জন করে নাই। দেওয়াল-ঘেরা নগরে তাহারা জীবনযাপন করিত। পশুচারণ, কৃষিকর্ম্ম এবং হস্তশিল্পের দ্বারা ধনোৎপাদন সাধিত হইত। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যাও বাড়িতেছিল। সম্পত্তির বিতরণে একটা অসাম্য উপস্থিত হইতেছিল। তাহার ফলে বড়লোক, গরীবলোক, সম্ভ্রান্তশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী ইত্যাদি জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছিল।

হোমার-সাহিত্যের "নেশ্যন"গুলা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিতে অভ্যস্ত ছিল। লড়াইয়ের উদ্দেশ্য এক,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপদসমূহ নিজ নিজ তাঁবে আনা। যুদ্ধের বন্দীরা গোলামে পরিণত হইত।

হোমার-সাহিত্যের "জাতি"-শাসন

সেকালের শাসন-প্রণালী মোটের উপর নিম্নরূপ :—

১। প্রত্যেক জাতির সার্ব্বজনিক সভা থাকিত। সভার

নাম "বুলে।" প্রথম প্রথম প্রত্যেক গোষ্ঠী-নায়ক (আর্কন) জাতি-সভায় বসিতে পাইত। পরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় গোষ্ঠী-নায়কদের ভিতর বাছাই করিয়া কয়েকজনকে সভায় ঠাঁই দেওয়া হইত।

বাছাইয়ের ফলে ধনী, সম্ভ্রান্ত, বা কুলীন শ্রেণীর প্রতিপত্তি সমাজে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। "বীরযুগে"র জাতি-সভাকে দিয়োনিসিওস খোলাখুলি "ক্রাতিস্তয়্" অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদের বৈঠক-রূপে বিবৃত করিয়াছেন।

সকল বিষয়ে এই সভার মতই চরম বিবেচিত হইত। এস্খিলসের নাট্যে থিব্স্ দেশের সভায় নির্দ্ধারিত হয় যে, এতেওক্লেসের শবকে সগৌরবে কবর দেওয়া হইবে। কিন্তু সেই সভার বিচারেই পলিনিকেসের দেহ সম্বন্ধে কুকুরে খাওয়ার রায় দেওয়া হয়।

গ্রীক্-সমাজে "রাষ্ট্র" গড়িয়া উঠিবার পর জাতি-সভা "সেনেট" প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল।

২। প্রত্যেক জাতিই সার্ব্বজনিক আলোচনার ব্যবস্থা করিত। এই জন্যও সভার রেওয়াজ ছিল। এইরূপ সভাকে "আগোরা" বলিত। আমেরিকার ইরোকোআ সমাজে নরনারীরা যে-কোনো কেন্দ্রের বিধিসঙ্গত সভায় উপস্থিত হইয়া বাদানুবাদে যোগ দিতে পারিত। হোমারের গ্রীক্-সমাজে এইরূপ যোগদান পাকাপাকি প্রতিষ্ঠানের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। সাবেক কালের জার্ম্মাণ-সমাজেও এই ধরণের সর্ব্বজন-সভা দেখিতে পাই।

"বুলে"ই এই "আগোরা"র বৈঠক ডাকিত। মজলিশে যে কোন লোক মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী ছিল।

এস্খিলসের "নিবেদক" নাট্যে দেখিতে পাই যে জনগণ হাত তুলিয়া ভোট দিতেছে। জয়ধ্বনি করিয়া ভোট দিবার ব্যবস্থাও ছিল। "আগোরার" সিদ্ধান্তই ছিল শেষ সিদ্ধান্ত।

জার্মাণ পণ্ডিত শ্যেমান-প্রণীত "গ্রীসের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে" জানিতে পারি যে,—কোনো বিষয় আলোচনা করিবার সময় জনগণের স্বাধীনতা পুরা মাত্রায় বজায় থাকিত। জোর জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও কোনো মত গ্রহণ করাইবার কোনো প্রকার ব্যবস্থা হোমারীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ তখনকার দিনে প্রত্যেক লোকই ছিল যোদ্ধা। কাজেই এইরূপ সমাজে জনগণের অতিরিক্ত এমন কোনো কেন্দ্র ছিল না যাহার দ্বারা তাহাদিগকে কাবু করা সম্ভব হইতে পারিত। সাম্যমূলক গণতন্ত্র ষোল কলায় পূর্ণ ছিল। এই কথা মনে রাখিয়া "বুলে" এবং "বাসিলিউস্" বা জাতি-নায়কের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে মত প্রচার করিতে হইবে।

১। প্রত্যেক জাতির রণ-নায়ক থাকিত। তাহার নাম "বাসিলিউস্"। মার্ক্স্ বলেন,—"ইয়োরোপের বিজ্ঞানসেবীরা অধিকাংশই রাজরাজড়াদের পোষ্য অর্থাৎ অন্নভোজী গোলাম বিশেষ। কাজেই ইহারা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রীক্-সমাজের "বাসিলিউস্"কে "রাজা" বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইয়াঙ্কি পণ্ডিত মর্গ্যান রিপাব্লিক বা গণতন্ত্রের নাগরিক। তাঁহার মতে ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ গ্রীক্ "বাসিলিউস্" সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন।

মর্গ্যান বলিতেছেন:—"গ্লাড্ষ্টোন 'যুদ্ধেরস্তস্ মুন্দি' গ্রন্থে "বীরযুগে"র গ্রীক্ নায়কগণকে একদম রাজরাজড়া, আমীরওমরাহ

রূপে দাঁড় করাইয়াছেন।—যেন ইহারা আজকালকার 'জেণ্ট্‌ল্‌মেন' নামধারী বাবু-সমাজ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রথম সন্তান বা জ্যেষ্ঠ পুত্রের দাবীদাওয়া বিষয়ক বিধান সম্বন্ধে পাকা প্রমাণ না পাইয়া হতাশ হইতে বাধ্য হইয়াছেন।"

ইরোকোআ এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান-সমাজে "সাখেম" এবং রণ নায়কগণ নির্বাচিত হইত। সকল সার্ব্বজনিক পদেই গোষ্ঠীর লোকেরা বাছাই করিয়া কর্ম্মচারী বহাল করিত। গোষ্ঠীর ভিতরেই বংশানুক্রমে পদগুলা অধিকৃত হইত। সাধারণতঃ ভাই বা ভাগ্‌নে উত্তরাধিকারসূত্রে পদের অধিকারী ছিল। বিশেষ কোনো কারণ না ঘটিলে নায়ক-নিয়োগের এই নিয়ম ভঙ্গ করা হইত না।

"বাসিলিউস্" ও "রাজ"-পদ

গ্রীসে দেখিতেছি "বাসিলিউসে"র পদে পুত্রেরই অধিকার ছিল। ইহাতে অনুমান করা চলে যে,—সার্ব্বজনিক বাছাইয়ের ফলে পুত্রেরই কপালে উত্তরাধিকার জুটিত। জনগণের ভোট ছাড়া কখনো কেহ এই পদ অধিকার করিতে সমর্থ হইত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বংশানুক্রমে নেতৃত্ব বা নৃপত্বের গোড়ায় এই ধরণের সার্ব্বজনিক বাছাইয়ের রীতি গ্রীক্ সমাজে লক্ষ্য করিতে হইবে।

(১)

কম্‌সেকম্ "বুলে" এবং "আগোরা" এই দুই প্রতিষ্ঠানের সম্মতি "বাসিলিউস্" নির্ব্বাচনের সময় অবশ্য গ্রহণীয় ছিল।

প্রাচীন রোমের "রেক্স্" (বা "রাজা") ও এই ধরণেই নির্ব্বাচনের অধীন জননায়ক বিশেষ। বংশগত রাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল,—পরবর্ত্তী কালে।

"ইলিয়াদ" নামক গ্রীক্ মহাকাব্যে আগামেম্নন সকল গ্রীক্ জাতির অধীশ্বর নন। ভিন্ন ভিন্ন স্ব স্ব প্রধান সেনাদলের সংযুক্ত নায়ক রূপে তিনি শত্রুর নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। গ্রীক্দের মধ্যে যখন দলাদলির প্রভাবে ঝগড়া দেখা দিয়াছিল তখন ওদিসিউস্ বলিতেছিলেন :—"বহু ব্যক্তির শাসনই যত অনিষ্টের মূল। কোনো একজনকে শাসনকর্ত্তা ও নায়ক সাব্যস্ত করা হউক।" ওদিসিউস্ শাসন প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন নাই। তিনি সকল গ্রীক্ জাতিকে কোনো এক নির্দ্দিষ্ট সেনাপতির হুকুম তামিল করিতে উপদেশ দিতেছিলেন মাত্র।

ট্রয় নগরের সম্মুখে যে সকল গ্রীক্কে দেখিতে পাই তাহারা সকলেই যোদ্ধা। সকলেই রণবেশে সজ্জিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত। কিন্তু এই লড়াইয়ের সময়েও সেকালের গ্রীকেরা সাম্য, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলিতেছিল। "আগোরা"র মজলিসে সমানে সমানে কথাবার্ত্তার পরিচয় পাই। লড়াইয়ে পাওয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগবাটোআরা সম্বন্ধে আগামেম্ননের এক্তিয়ার একদম নাই বলিলেই চলে। সকল ক্ষেত্রেই আখিলেস "আকেআনদের পুত্রগণে"র অর্থাৎ সমগ্র জনসাধারণের হাতে এই এক্তিয়ার দিয়াছেন দেখিতে পাই।

(২)

আগামেম্ননকে "জিউসের (বা মহাদেবের) বংশধর" অথবা "জিউসের প্রতিপালিত" ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই কারণে ইহাকে "মহতী দেবতা হেষা" বুঝিতে হইবে না। কারণ প্রত্যেক গ্রীক্ গোষ্ঠীই এইরূপে কোনো না কোনো দেবতার সন্তান বিবেচিত হইত। অবশ্য "জাতি"-নায়কের গোষ্ঠী কোনো বড় রকমের দেবতা (যথা জিউস্) হইতে উৎপন্ন এইরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল।

দেবতা হইতে উৎপন্ন হওয়া গ্রীক্-সমাজে একটা বিশেষ কিছু নয়। এমন কি শূকর-পালক ইউমেঅস্ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাবিহীন লোকেরাও "দেবসম্ভূত" ("দিয়োই" বা "থেয়োই") বিবেচিত হইত। "ওদিসি" গ্রন্থ "ইলিয়াদ" হইতে নবীনতর। এমন কি এই মহাকাব্যেও এই ধরণের দেবতা হইতে উৎপত্তির কাহিনী অতি মামুলি কথা। মুলিতস্ নামক নকীব এবং দেমোদোকোস্ নামক অন্ধগায়ককেও "ওদিসি" গ্রন্থে "হেরোস্" বা বীর রূপে বিবৃত করা হইয়াছে।

"রাজা" কাহাকে বলে?

কার্ল মার্ক্স্ প্রাচীনতম গ্রীক্ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—"হোমার-বিবৃত রাষ্ট্রকে তথাকথিত রাজতন্ত্র রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এইরূপ করা ভুল। "বাসিলিয়া"য় বিধানে নায়ক রণক্ষেত্রে অনেকটা সর্ব্বেসর্ব্বা সন্দেহ নাই কিন্তু "বুলে" এবং সার্ব্বজনিক সভা এই দুই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কোনো মতেই কম নয়। কাজেই "বাসিলিয়া"কে সামরিক গণতন্ত্র বিবেচনা করিলেই সেকালের সমাজ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

(১)

"বাসিলিউস্" একমাত্র সেনানায়ক ছিল এরূপ জানিবার কারণ নাই। ধর্ম্মসংক্রান্ত পুরোহিতের কাজ এবং বিচারপতির কাজও তাহার এলাকার অন্তর্গত। বিচারবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলা সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়মকানুন দেখিতে পাই না। কিন্তু "জাতি" বা "জাতি-সমবায়" নামক যুক্ত দরবারের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে "বাসিলিউসে"র গুরুতাগিরি অনিবার্য্য।

সাধারণ শাসনসংক্রান্ত কাজকর্ম্মে "বাসিলিউসে"র এলাকা ছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু "বুলের" অধিবেশনে তাঁহার ঠাঁই থাকা অসম্ভব নয়।

"বাসিলিউস্" শব্দের তর্জ্জমায় আধুনিক ইয়োরোপীয়ানরা "রাজা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। এই তর্জ্জমা নেহাৎ ভ্রমাত্মক নয়। একটা গোষ্ঠীর সর্দ্দার বলিলে যাহা বুঝা যায় রাজা-বাচক শব্দের ধাতুও সেই অর্থই প্রকাশ করে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের সমাজেও রাষ্ট্রে রাজপদের অধিকারীর যে ঠাঁই প্রাচীন গ্রীসের "বাসিলিউস্" নামক জননায়কের সেই ঠাঁই বুঝিতে গেলে মহা গোলে পড়িতে হইবে।

গ্রীক্ ঐতিহাসিক যুসিদিদিস্ "বাসিলিয়া"কে "পাত্রীকে" অর্থাৎ গোষ্ঠী-সম্ভূত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কর্ত্তব্য ছিল। দার্শনিক আরিস্ততলও "বাসিলিয়া"কে স্বাধীন জনগণের "নেতৃত্ব" বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় "বাসিলিউস্" ছিল সেনাপতি, বিচারক এবং পুরোহিত। কাজেই আধুনিক হিসাবের "শাসন কার্য্য" "বাসিলিউসের" একতিয়ারে ছিল না বুঝিতে হইবে।

(২)

আধুনিক পণ্ডিতেরা গ্রীক্-সমাজের "বাসিলিউস্"-পদ বুঝিতে ভুল করিয়াছিলেন। প্রাচীন মেক্‌সিকোর আজ্‌তেক রণ-সর্দ্দার সম্বন্ধেও ইঁহারা ঠিক এইরূপ ভুলই করিয়াছেন। আজ্‌তেক রণ-সর্দ্দার ইঁহাদের তর্জ্জমায় রাজা বিশেষ। মর্গ্যান এই বিষয়ে ভুল ধরাইয়া দিয়াছেন। ভুলটার জন্য প্রধানতঃ স্পেনিষ পর্য্যটক ও সেনাপতিরাই দায়ী। ইহারা আজ্‌তেকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলা সম্বন্ধে কতকগুলা ভ্রমাত্মক মত রটাইয়াছিল।

মর্গ্যান বলেন—"মেক্‌সিকোর আজ্‌তেকরা "বার্ব্বার' সভ্যতার মধ্যম স্তরে অবস্থিত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্‌সিকো প্রদেশের পুয়েব্লো নামক ইণ্ডিয়ান অপেক্ষা আজ্‌তেক জাতি উচ্চতর কোঠায় উঠিয়াছিল। স্পেনিষ লেখকদের বিবরণগুলা হইতে আজগুবি কাহিনী, অসৎ এবং গাঁজাখুরি গল্প বাদ দিয়া সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে,—আজ্‌তেকরা তিনটা জাতির সমবায়ে একটা সংযুক্ত-জাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সংযুক্ত-জাতির অধীনে কতকগুলা করদ-জাতি বসবাস করিত। সংযুক্ত-জাতির শাসন-কর্ত্তা ছিল এক ফেডারাল বা সংযুক্ত-দরবার। লড়াইয়ের জন্য এক ফেডারাল সেনাপতিও বহাল থাকিত। এই সেনাপতিকেই স্পেনের পর্য্যটক-লেখকেরা সম্রাট্ খেতাবে ভূষিত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

হোমারীয়-সমাজ "প্রাক্-রাষ্ট্রীয়" জীবন-কেন্দ্র

"বীরযুগে"র গ্রীক্-সমাজে সাবেক কালের গোষ্ঠী-প্রথা

বেশ সজীবই দেখিতে পাইতেছি। তবে ইহার ধ্বংস-সাধক শক্তিগুলার গোড়াও পাকড়াও করিতে পারিতেছি। "পুরুষ-বিধি," পিতৃস্বত্বে পুত্রকন্যাগণের অধিকার, এবং পরিবারের তাঁবে সম্পত্তিসঞ্চয়,—এই সকল ব্যবস্থার ফলে গোষ্ঠীর একতিয়ার ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ধন-সম্পত্তির অসাম্যের দরুণ পরিবারে পরিবারে ছোটবড়, উচ্চনীচ ইত্যাদি ভেদ জন্মিতেছিল।

এই ভেদই বংশগত কৌলীন্য বা আভিজাত্য এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উৎপত্তি ঘটাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দাসত্ব বা গোলামী দেখা দেয়। প্রথমতঃ, লড়াইয়ের বন্দীরা গোলামে পরিণত হয়। পরে গোটা জাতি বা গোষ্ঠীগুলাও দাস-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে দাঙ্গা চলিত জাতিতে জাতিতে। ক্রমে এই দাঙ্গা-প্রিয়তা পার্শ্ববর্ত্তী সমাজের সম্পত্তি লুটপাট করিয়া নিজ দখলে আনিবার প্রয়াসে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে থাকে। "বিদেশী"দের পশু, দাস এবং ধনদৌলত কাড়িয়া খাওয়া গ্রীক্-সমাজের স্বভাবে পরিণত হইতেছিল। ধনের "লালচ্" গ্রীক্ জাতিকে গোষ্ঠী-প্রথার উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী করিয়াছিল। কিন্তু তখনও গোষ্ঠীর দোহাই দিয়াই পরজাতি-লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হইত।

প্রাচীনতম গ্রীক্-সমাজেই গোষ্ঠী-প্রথা ভাঙিবার অনুকূল শক্তির উৎপত্তি দেখিতে পাই। কেবল একটা জিনিষের তখনও অভাব ছিল। ধনসাম্যের বিধান ভাঙিয়া লোকেরা ব্যক্তিগত ও পরিবারগত ধনদৌলতের ব্যবস্থা কায়েম করিতেছিল। কিন্তু এই নবীন সম্পত্তিকে সাবেক কালের

গোষ্ঠী-ধর্মের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ম কোনো প্রতিষ্ঠান তখনও কায়েম হয় নাই।

এই "নবীন সম্পত্তি"কে "মান্ধাতার আমলে" অতি জঘন্যই বিবেচনা করা হইত। এক্ষণে ইহাকে পবিত্র, ধর্ম-সঙ্গত, ন্যায্য এবং মানব-সমাজের উন্নতি-সাপেক্ষরূপে প্রচারিত করিবার জন্য একটা "পাঁতির" দরকার হইতেছিল। সেই "পাঁতি" হেমার-বিবৃত সমাজে পরিষ্কাররূপে দেখা দেয় নাই।

অধিকন্তু তখনকার দিনে নিত্য নতুন রকমের ধনদৌলত দেখা দিতেছিল। সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন ঠাঁইয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে পুঞ্জিভূত হইতেছিল। এই সকল রকমারি সম্পত্তি এবং পুঁজিকে সমগ্র সমাজে "সনাতন" এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সভ্যতামূলক ও স্বীকার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি তখনও ঘটিয়া উঠে নাই।

এক কথায় ধনগত অসাম্য অর্থাৎ শ্রেণী-ভেদ এবং নির্ধনের উপর ধনবানের পোদ্দারি এই সকল নীতির দ্বারা শাসিত সমাজকে চিরস্থায়ী করিবার যন্ত্র বা কৌশল তখনও দেখা যায় না। কিন্তু সেই যন্ত্র দেখা দেয় দেয় হইয়াছিল। সেই যন্ত্র বা কৌশলকেই বলে "রাষ্ট্র"।

পঞ্চম অধ্যায়

আথেনিয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি

গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া-চুরিয়া মানব-জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীর কোনো কোনো অঙ্গ একদম তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অঙ্গগুলার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন মাত্র সাধন করা দরকার হইয়াছিল।

গোষ্ঠী হইতে খাঁটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটাইতে অনেক কাল লাগিয়াছে। সাবেক কালে জনগণ গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি, এই তিন কেন্দ্রে অনেকটা স্ব স্ব প্রধান ভাবে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিল। এই সকল কেন্দ্র তুলিয়া দিয়া তাহাদের ঠাঁইয়ে রাষ্ট্রকে বসাইয়া মানব-সমাজ এক নতুন অভ্যাসের জন্ম দিয়াছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্বে "স্বদেশ" রক্ষা করিবার ক্ষমতা আসা জগতে এক বিপুল বিপ্লব বিশেষ। এই ক্ষমতা এক্ষণে "বিদেশী" শত্রুদের বিরুদ্ধে কায়েম হইতে পারে এমন নয়। স্বদেশের জনসাধারণকে দাবিয়া রাখিবার জন্যও এই রাষ্ট্রগত সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলার জন্ম ও শৈশব প্রাচীন আথেন্সের ঘটনাবলীতে অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। আথেনিয় সমাজের প্রত্নতত্ত্ব এই কারণে নৃতত্ত্ববিদ্যায় বিশেষ কাজে লাগে। মর্গ্যান গোষ্ঠী হইতে রাষ্ট্রের জন্ম বুঝাইবার জন্য আথেনিয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই স্তর-পরম্পরা এবং

রূপান্তর বা ক্রমবিকাশের বৃত্তান্তে আর্থিক অর্থাৎ ধনদৌলত বিষয়ক তথ্যগুলা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সেই দিকে মর্গ্যানের দৃষ্টি বেশি ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনায় সেই অভাব পূরণ করা হইতেছে।

"বীরযুগ"

প্রাচীনতম অর্থাৎ "বীরযুগে"র কথা ধরা যাউক। তখনকার দিনে আথেনিয়গণ চার "জাতি"তে বিভক্ত ছিল। আটিকা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই চার জাতি বসবাস করিত। জাতিগুলা বিভক্ত ছিল বার ফ্রাত্রীতে। ফ্রাত্রীগুলাও সেক্রোপস জনপদের ভিন্ন ভিন্ন বার নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। "বীরযুগে"র অন্যত্র যেমন—আটিকায়ও "আগোরা" নামক সার্ব্বজনিক সভা এবং "বুলে" নামক পরিষৎ এই দুই প্রতিষ্ঠান জনগণের শাসন চালাইত। "বাসিলিউস্" নামক লড়াই-নায়ক ছিল শাসন-পদ্ধতির তৃতীয় অঙ্গ।

যতদূর পর্য্যন্ত লিখিত ইতিহাসের নজির ঠেকানো যায়, ততদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে, জমিজমা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব রূপে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। "বার্ব্বার" সভ্যতার উর্দ্ধতম স্তরে ধনদৌলত এবং শিল্পবাণিজ্য যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল। শস্য, মদ এবং তেল ছিল প্রধান দ্রব্য। ঈজিয়ান সাগরের বাণিজ্য ফিনিসিয় জাতির তাঁব হইতে আথেনিয়দের হাতে আসিয়া পড়িতেছিল।

ভূমি-সম্পত্তির কেনাবেচা চলিত বেশ স্বাধীনভাবে। কৃষি এবং শিল্প এই দুই ভিন্ন ভিন্ন পথে ধনসৃষ্টি হইত প্রচুর পরিমাণে।

তাহার উপর ব্যবসায় এবং নৌচালন এই দুই পথও আর্থিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নরনারীরা সুখ-স্বচ্ছন্দতা এবং সম্পদ বাড়াইবার নানা কৌশল কাজে লাগাইতে লাগাইতে শ্রমবিভাগ-নীতির নিয়মে অনেকটা বিশেষজ্ঞ বা ওস্তাদের দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। লোকজনের মধ্যে লেনদেন, দ্রব্য-বিনিময়, কর্ম্মের আদান-প্রদান বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলতঃ সাবেক কালের গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি নামক তিনটা স্ব স্ব প্রধান কেন্দ্রের সীমানাগুলা ভাঙিয়া যাইতেছিল।

এই সীমানা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর মেশামেশি অনিবার্য্য। এমন কি এই তিন কেন্দ্রের বহির্ভূত (অতএব সেকালের বিচারে "বিদেশী") বহু লোক কেন্দ্রগুলার অন্তর্গত এবং স্বগ্রামের বাসিন্দারূপে "সনাতন" আথেনিয়-সমাজের সামিল হইতেছিল।

কিন্তু এই নবাগত নরনারীদিগকে তখনও পুরাপুরি "স্বদেশী" বা স্বসমাজের লোক বলিয়া স্বীকার করা হইত না। গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি নিজ নিজ শাসন-কার্য্যে এই সকল "অতিথি-নাগরিক"দিগকে কোনো এক্তিয়ার দিত না। ইহারা তখনও সনাতন কেন্দ্রের পূরা অধিকারী বিবেচিত হইত না।

কাজেই একটা হ-য-ব-র-ল এবং সামাজিক গোঁজামিল চলিতেছিল। গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠাতে ষোল আনা শৃঙ্খলা বজায় রাখা আর সম্ভবপর হয় নাই। "বীরযুগে"ই গোষ্ঠী-প্রথায় ভাঙন দেখা দিয়াছিল। "ধর্ম্মস্য গ্লানি" এবং "অভ্যুত্থান-মধর্ম্মস্য" প্রকট হইতেছিল। এই অবস্থায়ই "যুগপ্রবর্ত্তক" থিসিউস্ দেখা দেন। তাঁহার নামে একটা শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন আথেন্সের "স্বধর্ম্মে" এই এক বড় কথা।

থিসিউস্‌-সংহিতা

থিসিউসের বিধানে একটা কেন্দ্রীকৃত শাসন-ব্যবস্থা রুজু হয়। এতদিন জাতিগুলা স্ব স্ব প্রধান ভাবে যে সকল কাজকর্ম্ম করিতেছিল, তাহার অনেকগুলা এই কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের তাঁবে আসিল। আথেন্স একটা সমষ্টিতে—বৃহত্তম সমষ্টিতে পরিণত হইল।

আমেরিকার ইরোকোআ বা অন্যান্য ইণ্ডিয়ান-সমাজে এই ধরণের "শাসন"-ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। এইখানেই আথেনিয় এবং ইণ্ডিয়ান-সমাজে ক্রমবিকাশের প্রভেদ। ইণ্ডিয়ান-সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলা মিলিয়া একটা ফেডারাল বা সংযুক্ত-জাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল সত্য। কিন্তু থিসিউসের বিধানে একটা সংযুক্ত-জাতি মাত্র গড়িয়া উঠে নাই। ইহার ফলে একটা ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীকৃত উচ্চনীচ-স্তরশীল "শাসন-সমষ্টি" উৎপন্ন হইতে পারিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আইন বা "ধর্ম্ম" সম্বন্ধেও যুগান্তর দেখা দেয়। সাবেককালে ছিল গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদির নিজ নিজ স্মৃতি ও নীতি-শাস্ত্র। অর্থাৎ আটিকায় চলিতেছিল এক সঙ্গে বহুবিধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বধর্ম্ম। থিসিউসের ব্যবস্থায় সমগ্র আথেনিয় সমাজের জন্য একটা সমষ্টিগত কানুন জারি হইল। এই কানুন পুরাণো গোষ্ঠীগত কানুনগুলা ছাপাইয়া উঠিয়াছিল।

থিসিউস্‌-সংহিতার জোরে আথেন্সে এক বিপুল "ধর্ম্ম" বিপ্লব স্থায়ী ঘর করিয়া বসিল। আথেন্সের নরনারীরা স্ব-গোষ্ঠী, স্ব-ফ্রাত্রী এবং স্ব-জাতির এলাকার বাহিরেও কতকগুলা দাবী-

দাওয়া এবং বিধি-নিষেধের সামিল হইতে পারিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সনাতন আথেনিয় সমাজের বহিভূর্ত বিদেশী, অজ্ঞাতকুল-শীল, "ম্লেচ্ছ" ইত্যাদি ধরণের লোকও আথেন্সে খাঁটি স্বদেশী বা গোঁড়া আথেনিয়দের ইজ্জৎ এবং অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হইল। এক কথায়, গোষ্ঠী-প্রথার পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত ঘটিল।

এই গেল থিউউসের প্রথম কীর্ত্তি। আর এক কীর্ত্তি দেখিতে পাই আথেনিয় সমাজের শ্রেণী-বিভাগ-করণে। সাবেক কালের গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি এই তিন কেন্দ্রের পরিবর্ত্তে নতুন ধরণের তিন কেন্দ্র থিসিউস্-সংহিতার বিশেষত্ব। একটীর নাম "ইউপাত্রিদে"। ইহারা অভিজাত শ্রেণীর লোক। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম "গেওমোরায়"; ইহারা চাষী। তৃতীয় শ্রেণীকে বলে "দেমিউর্গোয়" বা ব্যবসায়ী। পুরাণো তিন জীবন-কেন্দ্রের সঙ্গে এই নয়া তিন শ্রেণীর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

থিসিউসের বিধানে "ইউপাত্রিদে" বা কুলীনেরাই সরকারী পদের একমাত্র অধিকারী। এই এক্তিয়ার ছাড়া অভিজাতদের আর কোনো বিশষ অধিকার ছিল না। আইনের চোখে তিন শ্রেণীর লোকই অন্যান্য সকল হিসাবে স্বাধীন এবং সমান বিবেচিত হইত।

তবে এই সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের কাণ্ডে কতকগুলা নতুন শক্তি-সমাবেশের প্রভাব বেশ স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছি। সাবেককালে গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদি কেন্দ্রের সার্ব্বজনিক পদগুলা বংশানুক্রমিকরূপে অধিকৃত হইত। কতকগুলা পরিবার এই অধিকার প্রায় একচেটিয়ারূপে ভোগ করিতেছিল। এই প্রথায় বাধা দিবার অথবা ইহার

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই।

গোষ্ঠী ভাঙিয়া যাইবার সমসময়কালে এই সকল অধিকার বিশিষ্ট পরিবারগুলা প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব ধনদৌলতওয়ালা বংশ গোষ্ঠীর বাহিরে একটা ধনিক বা অভিজাত বা কুলীন শ্রেণী গড়িয়া তুলিতেছিল। থিসিউস্-সংহিতায় এইরূপ অভিজাতশ্রেণীকে "ধর্ম্মসঙ্গত" বা ন্যায্যরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আথেনিয় "রাষ্ট্রে"র জন্মকালে ধনপতি শ্রেণীর প্রভুত্ব বা বিশিষ্ট অধিকারভোগ জনগণের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

আর এক কথা ধনোৎপাদনের প্রণালী যথেষ্ট বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল। কিষাণ নরনারীদের কার্য্যকলাপ আর বণিক ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রা দুই ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচিত হইত। অধিকন্তু, এই দুই ধরণের ধনস্রষ্টাদের প্রভাব সমাজে বিশিষ্টরূপেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ সাবেক কালের গোষ্ঠী ইত্যাদি কেন্দ্রমণ্ডলীকে মানব-জীবনের সুখবিধানের তরফ্ হইতে আর বেশি সম্মান করা হইত না। কাজেই আর্থিক হিসাবে এক নবীন শ্রেণী-বিভাগ থিসিউস্-সংহিতায় অবশ্য কর্ত্তব্যই বিবেচিত হইয়াছিল।

থিসিউসের বিধানে সনাতন গোষ্ঠী-প্রথা ভাঙ্গিয়া গেল। একটা "নতুন কিছু" দেখা দিল। সাবেক কালের স্বধর্ম্মের ঠাঁইয়ে মাথা তুলিল এক নয়া স্বধর্ম্ম। এই "নতুন-কিছু"র নাম "রাষ্ট্র"।

এইখানে বুঝিতে হইবে যে, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র একসঙ্গে থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইবামাত্র গোষ্ঠীর অস্তিত্ব-

লোপ, এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করিতেছে। যতদিন গোষ্ঠী সজীব ছিল, ততদিন রাষ্ট্র দেখা যায় নাই। যেই রাষ্ট্রের জন্ম হইল, অমনি গোষ্ঠী গুঁড়া হইয়া গেল। রাষ্ট্রে গোষ্ঠীতে আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ।

গোষ্ঠীর ভাঙনটা আর একটুকু তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। এই ভাঙনের প্রথম কথা রক্তের ঐক্য বা সমতা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা। লোকেরা রক্তের টানকে একটা বড় কিছু বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইত না। তাহার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অথবা দলে দলে রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আড়াআড়িই নবীন ধর্ম্মের লক্ষণ হইল।

দ্বিতীয় কথা, শ্রেণী-ভেদ এবং শ্রেণী-বিবাদ। একদল হইল ক্ষমতাশালী "অধিকারী"। অপরদল হইল ক্ষমতাহীন "অনধিকারী"। অধিকারীদের শ্রেণীর সঙ্গে অনধিকারীদের শ্রেণীর দ্বন্দ্ব গোষ্ঠী-ভাঙনের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। অনধিকারীরা চাষী এবং ব্যবসায়ী এই দুই আর্থিক শ্রেণীতে বিভক্ত।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঙ্গে-সঙ্গে রক্তের টানের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং আর্থিক দলাদলি আথেনিয় সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। থিসিউস্-সংহিতা আলোচনা করিবার সময় এই তথ্যটা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

ঋণ-কানুন

থিসিউসের পরের যুগে "বাসিলিউসে"র পদ ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী হইতে "আর্কন" বা রাষ্ট্র-নায়ক বাছাই করা হইত। সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তিও ছিল অনেক।

কুলীনদের বাড়াবাড়ি চরমে গিয়া ঠেকিতেছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ সালে ইহা একপ্রকার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

আথেন্স নগরের ভিতর এবং আশেপাশে সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের আড্ডা ছিল। সমুদ্র-বাণিজ্য এবং সমুদ্র-ডাকাইতির সাহায্যে ইহারা ধন সঞ্চয় করিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। নগদ কাচা টাকা তাহাদের হাতে থাকিত অনেক। কিষাণ সমাজে এই টাকা ধার দিয়া তাহারা একসঙ্গে নিজেদের ধনবৃদ্ধিও করিত, আবার জনগণের উপর অত্যাচার চালাইতেও সমর্থ হইত। একে মুদ্রার দৌরাত্ম্য, তাহার উপর সুদখোর মহাজনদের প্রভুত্ব। এই দুই দফায় কৃষিজীবী সাবেক কালের সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

টাকার প্রচলনের সঙ্গে গোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠান খাপ খায় না। কৃষিপ্রধান গোষ্ঠী-সমাজ ধনপতি সুদজীবীদের পাল্লায় পড়িয়া উচ্ছন্ন গেল। সুদজীবীরা কর্জ্জ দিবার সময় জমিজমা বন্ধক লইতে সুরু করিয়াছিল। লগ্নি আর বন্ধকির কারবারে মহাজনেরা জ্ঞাতি-কুটুম্ব, রক্তের টান, এক কথায় গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদি সম্পর্কের কথা মুখেও তুলিত না, বলাই বাহুল্য।

টাকা ধার পাওয়া, সম্পত্তি বন্ধক রাখা, ইত্যাদি কারবার "মান্ধাতার আমলে" জানা ছিল না। গোষ্ঠীর শাসনে অভ্যস্ত নরনারী এই ধরণের আর্থিক ব্যবস্থা বুঝিতেই পারিত না। কাজেই উত্তমর্ণ অধমর্ণের সম্বন্ধ আথেনিয় সমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিল। এই নয়া সামাজিক সম্বন্ধের অনুরূপ নয়া আইন জারিও দরকার হইয়াছিল।

যে ব্যক্তি টাকা ধার লইতেছে, সে ঋণদাতার টাকা

যথাসময়ে ফিরিয়া দিতে বাধ্য,—এইরূপ কানুনের সাহায্যে সমাজকে বাঁধিয়া রাখা হইতেছিল। এই আইনে কিষাণরাই মোটের উপর ধনপতি কুলীনদের তাঁবে আসিয়া পড়িতেছিল। আটিকা প্রদেশের প্রত্যেক পল্লীতেই জমির উপর বন্ধকির "দাসখত" স্বরূপ খুঁটা গাড়া থাকিত। তাহার দ্বারা বুঝা যাইত কোন্ জমিনের জন্য কোন্ কিষাণ কোন্ মহাজনের নিকট কতটা ঋণী। অনেক জমির উপর এই ধরণের বন্ধকি খুঁটা দেখা যাইত না বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই, যে সেগুলা "দেউলিয়া" কিষাণেরা মহাজনদের নিকট বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সে যুগের ঋণ-কানুন আথেনিয়দের পক্ষে যারপরনাই কষ্টকরই ছিল। বন্ধক ফিরাইয়া পাওয়া কিষাণদের কপালে এক প্রকার ঘটিয়াই উঠিত না। অধিকন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র দেউলিয়া কিষাণদের ভোগে আসিত; তাহাও মহাজনদের দয়া-সাপেক্ষ। অবশিষ্ট সবই মহাজনদের প্রাপ্য বিবেচিত হইত।

বন্ধকি-জমি বেচিয়া ধার শোধ করা অসম্ভব হইলে কিষাণেরা নিজ পুত্রকন্যাগণকে বিদেশীদের নিকট বেচিতে বাধ্য হইত। মহাজনের দেনা কোনো মতেই রেহাই হইত না। "পুরুষ-বিধি" এবং "এক-পতি-পত্নী-ত্বে"র ব্যবস্থায়ই সন্তান-বেচা মানব-সমাজে সুরু হইয়াছে। কিন্তু ছেলেপুলে বেচিয়াও ধার শোধ করা অসম্ভব হইলে স্বয়ং কিষাণদিগকে বেচিয়া টাকা উসুল করা উত্তমর্ণদের পক্ষে "ধর্ম্মসঙ্গত" বিবেচিত হইত। "রাষ্ট্রের" ঊষাকাল আথেনিয় সমাজে এইরূপ সুমধুর দৃশ্যের সাক্ষী।

গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থায় এইরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড অসম্ভব হইত। ইণ্ডিয়ান-সমাজে আথেনিয়দের এই স্তর প্রকটিত হয় নাই। সেই সমাজের আর্থিক প্রচেষ্টায় ধনীনির্ধন, দেনাদার পাওনাদার, ইত্যাদি সম্বন্ধ বিকশিত হইতে পারে নাই। প্রকৃতির শক্তিগুলাকে খুব বেশি নিজের তাঁবে আনা ইরোকোআদের ক্ষমতায় কুলায় নাই। তাহারা নিজ কৃতিত্বের এবং অধ্যবসায়ের সীমা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইত। ছোট ছোট ক্ষেতের ফসল এবং হ্রদ নদীর মাছ ও বনের জানোয়ার ইত্যাদি দ্রব্যের পরিমাণ তাহাদের অজানা ছিল না। এই গুলার বাড়তি-কম্‌তিতে তাহাদের সমাজে একটা ভয়ানক রকমের সমাজবিপ্লব ঘটিত না; কারণ তাহারা কখনই ধনোৎপাদনের নেশায় আত্মহারা হইয়া অতিবৃদ্ধির পূজা করিত না। আর্থিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত ছিল। এই সীমানা ছাড়াইয়া উঠিবার জন্ত তাহাদের ঝোঁক দেওয়া যাইত না।

"বার্ব্বার" যুগের সভ্যতার এই এক মস্ত সুলক্ষণ। "উৎকর্ষের"র যুগের সভ্যতার মানুষ আর সুখস্বচ্ছন্দতার সীমা বা ধনোৎপাদনের গণ্ডী স্বীকার করিয়া চলে না। এইখানেই সব অনর্থের গোড়া। বর্ত্তমান যুগে মানবশক্তি প্রকৃতিকে দাসীতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার ফলে সুখের মাত্রায় অনেক বাড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা স্বাধীনভাবে দলবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছে। এই ধনবৃদ্ধি ও দল-গঠনের যুগে "বার্ব্বার" যুগের "সংযম" বা সুখের সীমা স্বীকার করা অসম্ভব কি? সে যুগে শ্রমিকেরা নিজেই ধনোৎপাদনের সীমা নির্দ্ধারণ

করিয়া দিত। আজ যদি শ্রমিকদের আবার সেই ক্ষমতা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে "উৎকর্ষের" যুগ তাহার প্রধান দোষ হইতে অব্যাহতি পায়।

কিন্তু গ্রীক্-সমাজে এই সীমা বা গণ্ডীর তোআক্কা রাখা হইত না। জানোয়ারের মালিকেরা এবং বিলাস-দ্রব্যের অধিকারীরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজারে লইয়া যাইয়া কেনাবেচা সুরু করিয়াছিল। এতদিন যে সকল জিনিষ বাস্তবিক পক্ষে মালিকের "নিজ পরিশ্রমের ফল"রূপে পরিচিত ছিল, সেইগুলা এখন "বাজারের মাল" বা "পণ্যদ্রব্য" মাত্রে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য, এই ধরণের "মালের" সঙ্গে আসল শ্রমিক বা উৎপাদকের সংযোগ কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। "মেহনতের ফলে" আর "মালে" যে প্রভেদের কথা বলা হইতেছে, এই প্রভেদেই ইণ্ডিয়ান আর আথেনিয় অর্থাৎ গোষ্ঠী আর রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানে প্রভেদ। এইখানে একটা বড় বিপ্লবের গোড়া ঢুঁড়িয়া পাইতেছি।

উৎপাদনকারীরা যখন নিজ মেহনতের ফল নিজে ভোগ না করিয়া এইগুলা অন্যান্য লোকের মেহনতের ফলের সঙ্গে অদল-বদল করিতে লাগিয়া গেল, তখন আর তাহারা নিজের কাজের উপর পুরাপুরি প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারিল না। নিজ পরিশ্রমের ফল কোথায় কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে সম্বন্ধে তাহাদের আর কোনো জানাশুনাই সম্ভবপর হইল না। বরং এই জিনিষগুলা তাহাদের হাত ছাড়া হইবামাত্র এইগুলা ব্যবহার করিয়া সমাজের কোনো কোনো লোক তাহাদিগকে নানা অসুবিধায়ই ফেলিতে পারে, এইরূপ অবস্থা ঘটিতেছিল।

সমাজে আর্থিক "বিনিময়"প্রথার কুফল এই প্রথম দেখা দিল।

উৎপাদনকারীর বিরুদ্ধে তাহার নিজ মেহনতের উৎপন্নদ্রব্য অতি অল্পকালের ভিতরেই আথেনিয় সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে। মেহনতের ফল যেই বাজারের মালে পরিণত হইল, তখনই দেখা দিল টাকা বা মুদ্রা। বাজারের বিনিময় সহজসাধ্য করিবার জন্যই মুদ্রার জন্ম। এ এক অতি সহজ, সরল আবিষ্কার সন্দেহ নাই, কিন্তু যে যন্ত্র প্রত্যেক কেনা-বেচার কাজে লাগে, সে যন্ত্রের নিকট সমাজের আপামর সকলেই মাথা নোয়াইতে বাধ্য, সে যন্ত্র নেহাৎ সহজ সরল নয়। ইহার দৌরাত্ম্যে এবং অত্যাচারে আথেনিয় নরনারী উল্টম-পুস্তম হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

সনাতন গোষ্ঠী-সমাজ টাকার আবিষ্কারে বাধা দিতে পারে নাই। অথচ কেনাবেচা, ধার দেওয়া, ধার লওয়া, বন্ধকি ইত্যাদি সমাজিক সম্বন্ধের নয়া নয়া অনুষ্ঠান গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হজম করা অসাধ্য। এই অবস্থায় একমাত্র অতীতের দোহাই দিয়া কি আর "সেকাল"কে ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে? মুদ্রা এবং ঋণতত্ত্ব দুনিয়া হইতে ভাবুকতার জোরে তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইল না। এই আবিষ্কারগুলা আথেন্সে খাঁটি বাস্তব শক্তির "আকারেই জুড়িয়া" বসিয়াছিল।

অতএব কঃ পন্থাঃ? গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান এইবার "খাটে উঠিলেন।" এতদিন ধরিয়া গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত সমাজের আজ আঙুল মট্‌কাইতেছিল, কাল ঠ্যাং ভাঙিতেছিল, পরশু চোখ কানা হইতেছিল। থিসিউসের আগে-পরে সর্ব্বদাই নানা দিক,

হইতে গোষ্ঠীর ভাঙন চলিতেছিল। সেই ভাঙনই এক্ষণে চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

গোষ্ঠী ভাঙিয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে লোকের অজ্ঞাতসারেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলা সমাজে শিকড় গাড়িতেছিল। শ্রম-বিভাগের নিয়মে নগর ও পল্লীর পার্থক্য স্পষ্ট হইয়াছিল। নগরের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীরাও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। এই সকল বিভিন্ন দলের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য আটিকায় নানা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল।

দেশের ভিতর নানা প্রকার সার্ব্বজনিক সরকারী পদ বা চাকুরির উৎপত্তি হইতেছিল। সামরিক বিভাগ এক স্বতন্ত্র পুষ্টির পথে অগ্রসর হইতেছিল। দেশরক্ষার জন্য অথেনিয় সমাজে সর্ব্বপ্রথমে নৌসেনা কায়েম হয়। প্রত্যেক "জাতি"কে বারটা "নৌক্রারিয়া"য় বিভক্ত করা হইয়াছিল। "নৌক্রারিয়া" নামক "সামরিক জেলা"গুলা প্রত্যেকে একটা করিয়া রণতরীর সম্পূর্ণ ভার লইতে বাধ্য থাকিত। অধিকন্তু, প্রত্যেকেই দুই জন করিয়া ঘোড়-সওয়ার জোগাইবার জন্য মোতায়েন ছিল।

"নৌক্রারিয়া" প্রথায়ও গোষ্ঠীর গোড়ায় কুড়াল চালানো হইতেছিল। এতদিন ছিল সমাজের সকল লোকই দেশরক্ষার এবং দণ্ড দিবার কাজে অধিকারী। এই নয়া ব্যবস্থায় "সরকারের" হাতে একটা বিশিষ্ট দল এবং বিশিষ্ট দণ্ড-ক্ষমতা আসিল। এই দল এবং এই ক্ষমতা যে-কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করা সম্ভব। অধিকন্তু, পূর্ব্বে চলিত জ্ঞাতি-কুটুম্ব অনুসারে জনগণের সরকারী ভাগা-ভাগি। কিন্তু এই ব্যবস্থায়

রক্তের টান আর বজায় থাকিল না। তাহার ঠাঁইয়ে আসিল "স্থানহিসাবে" বা বাস্তুভিটার তরফে কেন্দ্র-গঠন।

গোষ্ঠীর আমলে ধনীনির্ধন ভেদ ছিল না। এক শ্রেণী আর্থিক হিসাবে নির্য্যাতিত হইতেছে, অথবা পরের লাভের জন্য নিজে মেহনত্ করিয়া মরিতেছে, এবং আর এক শ্রেণীর লোক পরের রক্ত শুষিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, এই ধরণের দৃশ্য গোষ্ঠী-সমাজে অসম্ভব ছিল। কিন্তু থিসিউসের যুগে এবং পরে নির্য্যাতিত প্রপীড়িত দুঃখী বলিয়া এক প্রকার শ্রেণী দিন দিন বাড়িতে থাকে। তাহাদের রক্ষা করিবার ক্ষমতা গোষ্ঠীর নাই। এই রক্ষাকার্য্যে আগুয়ান হইল রাষ্ট্র। সোলোনের শাসন-পদ্ধতি নবযুগের নবীন সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। সোলোন আথেনিয় সমাজের আর এক যুগাবতার। সে প্রায় ৫৯৪-৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের কথা।

যুগাবতার সোলোন

টাকার চলন এবং ঋণের আইন এই দুই কারণে তখনকার লোকেরা কষ্ট পাইতেছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব সমাজে যারপরনাই উৎপীড়নের কারণ হইয়াছিল। এই কারণে সোলোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষমতা কমাইতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। ধনী মহাজনদের সম্পত্তি বাড়াইবার পথ আটক করিয়া দরিদ্র জনগণের সম্পত্তি কোনোমতে বাঁচাইয়া রাখা সোলোন-নীতির আসল কথা। সোলোন আইনজারি করিয়া উত্তমর্ণদের ঋণগুলা তামাদি ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঋণগ্রস্তেরা রেহাই পাইল।

সোলোন সমাজ সংস্কারক মাত্র নন। তিনি কবিতা রচনায়ও

হাত দেখাইয়াছেন। সোলোন-সংহিতায় যে সকল কথা স্পষ্টরূপে জানা যায় না, তাহার কিছু কিছু আন্দাজ করা যায় সোলোনের গাথা সমূহ হইতে। তাঁহার আইনের ফলে জমির উপরকার বন্ধকির দাসখত-স্বরূপ স্তম্ভগুলা উঠিয়া গিয়াছিল। যে সকল কিষাণ জমিজমা ও বাস্তুভিটা ছাড়িয়া বিদেশে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল, অথবা ঋণের জন্য গোলামরূপে বিক্রী হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে সোলোনের আইন স্বভূমিতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিল।

যে কোনো রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে এইরূপ বিপ্লবসাধন এক মহাকীর্ত্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখিতেছি যে, সোলোন খোলাখুলি স্বত্ব বা নিজস্ব ধনদৌলতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। গরীবদিগকে বাঁচাইতে যাইয়া তিনি ধনবানদের প্রতি বেআইনি বা অবিচার করিয়াছেন।

মজার কথা,—রামার ধন শ্যামাকে অথবা পদার ধন হরাকে দেওয়াই সোলোনের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ভিতরকার কথা। কোনো যুগ-প্রবর্ত্তক বা সমাজ-সংস্কারকই একজনকে না মারিয়া আর একজনকে বাঁচাইতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-বিপ্লবেও এই কাণ্ডই আবার দেখা গিয়াছে। জমিদারের মধ্যযুগ-মাফিক ধনদৌলতকে দাবিয়া রাখিয়া বিপ্লবীরা নবরূপের "বুর্জোআ" মহাজনী সম্পত্তিকে মাথা তুলিতে সুযোগ দিয়াছে। এক হাতে লুটিয়া লওয়া, ডাকইতি বা বাজেয়াপ্ত করা, অপর হাতে ধনদান, জলদান, বিদ্যাদান ইত্যাদি ধরণের খয়রাতি বা পরোপকার যুগে-যুগে নানা আকারে দেখা যাইতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির

বিধানে মানুষ জনগণকে সুখী করিবার আর কোনো কৌশল আবিস্কার করিতে পারে নাই। আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া নরনারী এই এক পথেই চলিতেছে।

কর্জ্জগুলা তামাদি হইবার ফলে কিষাণেরা গোলামী হইতে অব্যাহতি পাইল। সোলোন-নীতি একমাত্র এইখানেই থামে নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে আবার কোনো লোক এইরূপ গোলামে পরিণত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও সোলোনের এক কীর্ত্তি। প্রথম কথা হইল এই যে, কোনো ব্যক্তি টাকা ধার লইবার সময় নিজেকে বন্ধক রাখিতে পারিবে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কোনো ব্যক্তিই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমির বেশি নিজ দখলে আনিতে পারিবে না। এই উপায়ে এক দিকে রক্ষা পাইল আথেনিয় কিষাণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অপর দিকে বাধা পাইল ঋণপতিদের ভূমি-লিপ্সা।

শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সোলোনের সংস্কারগুলাও উল্লেখযোগ্য। পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক জাতি হইতে এক-শ' করিয়া সভ্য আসিবে, এইরূপ নিয়ম হইল। আথেন্সের পরিষদে এই উপায়ে চার-শ' ব্যক্তির ঠাঁই হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, সোলোন সাবেক কালের "জাতি"-কেন্দ্রটা বজাই রাখিয়াই চলিয়াছিলেন।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সোলোন-নীতিতে পুরাণো "স্মৃতিশাস্ত্রের" কোনো দফাই স্বীকৃত হয় নাই। দেশের নরনারীকে সোলোন চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। জমির পরিমাণ এবং আমদানি অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ সাধিত হইয়াছিল। পাঁচিশ "মেদিম্নয়' ফসলের মালিকের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

তিন-শ' "মেদিম্নয়ের" মালিকদিগকে দ্বিতীয় এবং দেড়-শ'ওয়ালা-দিগকে তৃতীয় শ্রেণীর আথেনিয় বিবেচনা করা হইয়াছিল। এক এক "মেদিম্নয়" ১১৬ বুশেলের সমান। চতুর্থ শ্রেণীর লোক ছিল তাহারা, যাহাদের জমির আয় ১৫০ "মেদিম্নয়" অপেক্ষা কম, অথবা যাহারা একদম ভূমিহীন।

প্রথম তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া কেহই সোলোনের বিধানে সরকারী চাকুরী পাইত না। সর্ব্বোচ্চ পদে একমাত্র প্রথম শ্রেণীর লোকই অধিকারী। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা সার্ব্বজনিক সভায় বসিয়া বাদানুবাদ করিতে পারিত, ভোট দিবার অধিকারও ছিল। কিন্তু এই সভায়ই কর্ম্মচারী বহাল হইত, আইন জারি হইত, খরচ-পত্রের হিসাব-নিকাশ হইত। এইখানে চতুর্থ শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে গুণ্তিতে বেশি হওয়ায় দেশের ভাগ্যগঠনে তাহাদের হাত অনেকটা দেখা যাইত।

সোলোন-নীতি মোটের উপর গণতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল বলিতে হইবে। পয়সাওয়ালাদের প্রতিপত্তি, আভিজাতের ইজ্জৎ, এসবও যথারীতি রক্ষা পাইয়াছিল সন্দেহ নাই।

সামরিক কাণ্ডেও এই চারি শ্রেণীকেই কেন্দ্র বিবেচনা করা হইত। ঘোড়-সওয়ার আসিত প্রথম দুই শ্রেণী হইতে। তৃতীয় শ্রেণী জোগাইত "ভারী" পদাতিকের দল। "হাল্কা" পদাতিক হইত চতুর্থ শ্রেণীর লোক। ইহারাই আবার রণতরীর খালাসীরূপে দেশ রক্ষা করিত। বোধ হয় নাবিকের কাজ করার জন্য ইহারা বেতন পাইত।

ব্যক্তিগত ধনদৌলত বা নিজস্ব সোলেন-নীতির এক নতুন কথা। ভূমির পরিমাণ ও আয় দেখিয়া জনগণের অধিকার ও কর্ত্তব্য নিয়ন্ত্রিত হইত। বলা বাহুল্য যেখানেই সম্পত্তির প্রভাব সেইখানেই রক্তের টান কম। গোষ্ঠী-প্রথায় আর এক ঘা লাগিল।

কিন্তু রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইলে মানুষকে সর্ব্বত্রই যে সম্পত্তি অনুসারে নরনারীকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। ধনদৌলতের কম বেশি বিবেচনা না করিয়াও মানব-সমাজ রাষ্ট্র কায়েম করিতে পারে।

আথেন্সেই সম্পত্তির প্রভাব সর্ব্বদা অটুট ছিল না। ক্লারিস্থিদেসের সময় হইতে সরকারী পদগুলা যে কোনো লোকের অধিকারে আসিয়াছিল।

গণতন্ত্রী স্বরাজের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি

সোলোনের পরবর্ত্তী যুগে জমি লইয়া কেনা-বেচা একদম উঠিয়া গিয়াছিল। জমির পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ধনবানদের খেয়াল আর বড় একটা দেখা যাইত না। বাণিজ্য এবং শিল্পকর্ম্ম ইত্যাদির দ্বারা আথেন্সে ধন বৃদ্ধি হইতে থাকিল। স্বদেশী গোলামদের উপর জুলুম অনেকটা কমিয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছিল বিদেশী গোলাম ও ক্রেতাবিক্রেতাদের উপর আথেনিয়দের অত্যাচার।

স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। টাকাকড়ি, গোলাম, নৌকা ইত্যাদিই ধনদৌলতের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে থাকিল। সোলোনের আগেকার লোকেরা

এই সকল ধন জমি কিনিবার জন্ম খাটাইত। এক্ষণে ধনবানেরা আর সেরূপ না করিয়া জমিওয়ালাদেরর সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের টক্কর সুরু করিয়াছিল। শিল্পবাণিজ্যের ধনী-সমাজ আর সাবেককালের ভূমি-সম্পত্তির ধনী-সমাজ, এই দুইয়ে বিরোধ উপস্থিত হইল। ফলতঃ ভূমিপ্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী-প্রথাও আর এক ধাক্কা খাইতে লাগিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর বহির্ভূত অনেক লোক এখন আথেন্সের বাসিন্দা। নাগরিক হিসাবে ইহারা বসবাস করিত। কিন্তু আসল সমাজে ইহাদের কোনো ঠাঁই ছিল না। অধিকন্তু, খাঁটি বিদেশীদের সংখ্যাও দিন-দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনো কানুন ছিল না। একমাত্র মানবীয় সদ্ভাবের জোরেই ইহাদের সঙ্গে স্বদেশীদের লেনদেন চলিতেছিল।

জমিওয়ালা কুলীনদের সঙ্গে "নয়া-ধনী"দের বিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত নবীন ধনদৌলতেরই বিজয়লাভ ঘটে। ক্লাইস্থেনিসের শাসন-পদ্ধতি (৫০৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ) এই ধনবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সাক্ষী।

(১)

ক্লাইসথেনিসের সংহিতায় সাবেক কালের চার "জাতি" স্বীকার করা হইল। গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদি কেন্দ্র এইবার একদম লুপ্ত হইল। রক্তের টানে কোন ব্যক্তিকে কোনো দল, সমাজ বা কেন্দ্রের সামিল বিবেচনা করা হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা করা ক্লাইস্থেনিসের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আথেন্সে একটা খাঁটি যুগান্তর সাধিত হইল।

সোলোনের পূর্ব্বে "নৌক্রারিয়াই" নামক বাস্তুভিটা-প্রতিষ্ঠিত জনকেন্দ্র আথেনিয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। সেই কেন্দ্রই হইল ক্লাইস্থেনিস-নীতির সামাজিক খুঁটা। রক্তের পরিবর্ত্তে মাথা তুলিল "দেশ"।

(২)

গোটা আটিকাকে এক-শ' জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই গুলার নাম "দেময়"। প্রত্যেক "দেময়" স্বরাট। "দেময়ের" লোকেরা নিজ নিজ জেলার দেমাখোস বা গণ-মুখ্য, খাজাঞ্চি এবং ত্রিশজন বিচারক বাছাই করিত। প্রত্যেক "দেময়ে"রই মন্দির এবং "দৈবরক্ষক" ছিল। "দেময়ে"র রক্ষাকর্ত্তা দেবকে গ্রীক্ ভাষায় বলে "হেরোস্"। মন্দিরের পুরোহিত জনগণ হইতে নির্ব্বাচিত করা হইত। গোটা "দেময়"ই অধিবাসীদের পরিষৎ কর্ত্তৃক সকল বিষয়ে শাসিত হইত।

মর্গ্যান বলেন, প্রাচীন আথেন্সের "দেময়" বর্ত্তমান মার্কিণ রাষ্ট্রের নগর প্রতিষ্ঠানেরই আদিম মূর্ত্তি। রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার সময় আথেনিয় নরনারী যে জীবনকেন্দ্রের জন্ম দিয়াছিল, জগতের নবীনতম শাসন-প্রণালীতে সেই কেন্দ্রই চলিতেছে।

ক্লাইস্থেনিসের দশ "দেময়" একত্রে "ট্রাইব" নামে পরিচিত হইত। এই কেন্দ্র সাবেক কালের রক্ত-প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব বা জাতি হইতে স্বতন্ত্র। এই ট্রাইব রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক দুই হিসাবেই স্বরাট। ট্রাইবের মুখ্যকে বলা হইত ফিলার্খোস্। এই পদের অধিকারী "নির্ব্বাচিত" হইত। ঘোড়-সওয়ারের দল ফিলার্খোসের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইত। পদাতিক দলের নায়ক

নাকসিযার্খোস্‌ও "নির্ব্বাচিত" হইত। অধিকন্তু সমগ্র ট্রাইব-কেন্দ্রের পল্টনের সম্বন্ধে যে রণ-নায়কের হাতে সকল দায়িত্ব, তাহাকেও ট্রাইবের লোকেরা বাছাই করিতে অধিকারী ছিল। পল্টনে যোগ দিতে বাধ্য ছিল প্রত্যেক লোক। পাঁচটা করিয়া রণতরীর সকল দায়িত্ব প্রত্যেক ট্রাইবের হাতে থাকিত। ট্রাইবের নামকরণ হইত "দৈবরক্ষকের" নাম অনুসারে। প্রত্যেক ট্রাইব আথেন্সের পরিষদে পঞ্চাশ জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত।

আটিকা ছিল দশ ট্রাইবের দেশ। কাজেই আথেন্সের কেন্দ্র-পরিষদে পাঁচ-শ' সভ্য সমগ্র দেশের শাসন চালাইত। পরিষৎ ছাড়া "সার্ব্বজনিক সভা" বা "আগোরা"ও আর একটা প্রতিষ্ঠান। এই সভায় আপামর সকলেই ভোট দিতে অধিকারী। "পাঁচ শ'"-পরিষদের সকল কাজই এইরূপে "রাস্তার লোকের" সমালোচনার অধীন হইয়া পড়িত। আর্কন ইত্যাদি কর্ম্মচারীরা শাসনের নানা বিভাগে মোতায়েন থাকিত।

ক্লাইস্‌থেনিস আথেন্সে যে যুগ প্রবর্ত্তন করিলেন, সে যুগে পুরাণো গোলামেরা পুনরায় স্বাধীন নাগরিকরূপে চলাফেরা করার অধিকার পাইল। বিদেশীদিগকেও আইনতঃ স্বদেশীদের সামিল বিবেচনা করা হইত। মান্ধাতার আমলের গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলা এই যুগে শাসনক্ষমতাহীন, অ-রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র মাত্রে পরিণত হইল। ধর্ম্ম ও সামাজিক লেনদেন ছাড়া অন্য কোনো উপলক্ষে এই গুলার আর ডাক পড়িত না।

অবশ্য অনেক দিনকার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের উপর এই গুলার "নৈতিক" প্রভাব বড় শীঘ্র কমিতে পারে নাই। বহুকাল ধরিয়াই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আমলেও সনাতন গোষ্ঠীপ্রথার "স্বধর্ম্ম" নরনারীর জীবন-আদর্শ পরিচালিত করিতে থাকিল।

(৪)

দণ্ড দিবার ক্ষমতা থাকা রাষ্ট্রের আসল লক্ষণ। অধিকন্তু এই ক্ষমতার সরকারী অধিকারী জনগণ হইতে স্বতন্ত্র; ক্লাইস্থেনিসের আমলে আথেন্স-রাষ্ট্রের সেনা এবং রণতরী দুই-ই জনগণ কর্তৃক গঠিত হইত। এই দুইয়ের সাহায্যেই দেশকে বিদেশী শত্রু হইতে রক্ষা করা হইত। অধিকন্তু, দেশের ভিতরকার গোলাম শ্রেণীর গণ্ডগোল হইতেও দেশকে বাঁচাইবার ভার এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছিল। তখনকার দিনে আথেনিয় সমাজে গোলামরাই অধিক সংখ্যক লোক।

কিন্তু নাগরিক অর্থাৎ স্বাধীন আথেনিয় যাহারা, তাহাদিগকে রাষ্ট্র স্ববশে আনিত কি করিয়া? সরকারী দণ্ডের ক্ষমতা ছিল পুলিশের হাতে। পুলিশ-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীরা "সভ"বা উৎকর্ষশীল সমাজ বুঝাইবার জন্য "পুলিশ-শাসিত সমাজ" বলিতে অভ্যস্ত ছিল।

আথেনিয় রাষ্ট্রের পুলিশ ছিল তীরন্দাজ। পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার এই দুই দলে পুলিশ বিভক্ত থাকিত। গোলাম জাতীয় লোক ছাড়া আর কেহ পুলিশের চাকরী গ্রহণ করিত

না। স্বাধীন আথেনিয়দের চিন্তায় পুলিশ বিভাগে কাজ করা অতি গর্হিত বিবেচিত হইত। একজন স্বশস্ত্র গোলাম তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করুক, তাও সই, তথাপি তাহারা এইরূপ জঘন্য কাজে নকরি লইত না।

পুলিশ সম্বন্ধে বিদ্বেষ আথেনিয় সমাজে আসিল কোথা হইতে? ইহা তাহাদের সাবেক কালের সনাতন গোষ্ঠী-ধর্ম্মের ফল। পুলিশ ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। কিন্তু রাষ্ট্র আথেন্সে একটা "নতুন কিছু"। এই নবীন প্রতিষ্ঠানের ইজ্জত সমাজে বদ্ধমূল হওয়া মুখের কথা নয়। নয়ায়-পুরাণো দ্বন্দ্বই আথেন্সের সেকালে পুলিশ-বিদ্বেষের গোড়ার কথা। যতদিন পুলিশের কাজকে জঘন্য বিবেচনা করা হইতেছিল, ততদিন আথেনিয় সমাজে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের "নৈতিক" প্রভাব অটুট ছিল বুঝিতে হইবে। বড় সহজে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান মানব-সমাজে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই।

"অনধিকারী" গোলাম শ্রেণী

যাহা হউক ক্লাইস্থেনিসের আমলে রাষ্ট্র এক প্রকার সকল অঙ্গেই দেখা দিয়াছিল। আথেনিয়দের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থাও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলার অনুরূপই বিকাশ লাভ করিতেছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা ধনসম্পদ বাড়িয়া চলিতেছিল। মান্ধাতার আমলের "কুলীন" আর "ইতর" এই ধরণের শ্রেণী-ভেদ যেন আর বড় একটা দেখা যাইত না। শ্রেণীভেদ এক নব রূপে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছিল। প্রথম তফাৎ করা হইত "গোলামে" আর "স্বাধীনে"। দ্বিতীয় শ্রেণীভেদ ঘটিত "স্বদেশী"তে আর "বিদেশী"তে।

আথেন্সের চরম গৌরবযুগে "স্বাধীন" আবালবৃদ্ধবণিতার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০,০০০। ইহারা ৩৬৫,০০০ "গোলাম" নর-নারীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। তখন "বিদেশী" এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত গোলামেরা ছিল গুণ্‌তিতে ৪৫,০০০। অর্থাৎ সাবালক স্বাধীন আথেনিয় যেখানে একজন, সেখানে গোলাম ছিল আঠার এবং বিদেশী ছিল দুই।

এত সব গোলাম জুটিবার কারণ ছিল। বড় বড় কারখানায় ইহাদিগকে মজুররূপে বহাল করা হইত। ইহাদের মাথায় মাথায় থাকিত স্বাধীন লোক, কাজ তদ্‌বীর করিবার জন্য। সামাজিক ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুই চার জন ধনী লোকের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীকৃত হইতেছিল। কাজেই নির্ধন স্বাধীন আথেনিয়রা গোলামদের সঙ্গে মজুরির বাজারে টক্কর দিতে বাধ্য হইত। যাহারা গোলামদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া অপেক্ষা মরণই শ্রেয় বিবেচনা করিত, তাহারা ক্রমশঃ সমাজ হইতে উপিয়াই যাইতেছিল।

এইখানে একটা গভীর এবং গুরুতর কথা মনে রাখা আবশ্যক। স্বাধীন আথেনিয়দের ভিতর নির্ধন লোকেরাই ধনবানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। কিন্তু যখন এই নির্ধনরা ক্রমে ক্রমে নির্ব্বংশ হইতে থাকিল, তখন আথেনিয়দের সমাজের কোমর ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করে। আথেন্স এই কারণেই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

ইয়োরোপের পণ্ডিত মহাশয়েরা রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। ইহারা রাজরাজড়া আমীর ওমরাহ্‌দের প্রশস্তি তৈয়ারী করিতে অভ্যস্ত। ইস্কুল-কলেজের মাষ্টার মহাশয়েরাও কেতাবি গৎ

আওড়াইয়া নবাব বাদশাহ্‌দের স্তুতিগান করিয়া থাকেন। ইঁহারা কাজেই প্রচার করিয়াছেন যে, গণতন্ত্রের স্বরাজই আথেনিয় রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ।

এই বাখ্যা ভ্রমাত্মক। প্রজাতন্ত্র শাসনের ফলে আথেন্সের কোনো অনিষ্ট হয় নাই : অনিষ্ট হইয়াছে গোলামী প্রথার ফলে। এই গোলামী প্রথাই "স্বাধীন" জনগণকে ইজ্জতের সহিত খাটিয়া খাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। স্বাধীন ভাবে খাটিয়া মজুরি করিতে সমর্থ হইলে আথেন্সের দরিদ্র সমাজ বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু এই সামাজিক স্বাধীনতা "স্বাধীন" আথেনিয়দের কপালে জুটে নাই।

আথেনিয় সমাজে রাষ্ট্রের জন্মকথা আলোচনা করিলে একটা পুরাপুরি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ছাঁচ হাতে-হাতে ধরিতে পারি। বাহিরের কোনো আক্রমণ অথবা ভিতরকার কোনো বিদ্রোহ আথেনিয়দিগকে সহিতে হয় নাই। এই কারণেই রাষ্ট্রীয় কাঠামটা অনেকটা ষোলআনায় পূর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মাঝে একবার পিসিষ্ট্রাটুসের দৌরাত্ম্য বা একচ্ছত্র শাসনভোগ আথেন্সে দেখা দিয়াছিল বটে. কিন্তু ইহা বেশি দিন টিকে নাই। কাজেই রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহার প্রভাবও স্থায়ী হয় নাই।

গোষ্ঠী ভাঙিয়া মানব-সমাজ একটা সর্ব্বাঙ্গপরিপূর্ণ রাষ্ট্র কিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার বিবরণ আথেনিয় ইতিহাসে পুরাপুরি পাই। অধিকন্তু এই রাষ্ট্র আবার জনগণের স্বরাজ-মূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান। তাহা ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় অঙ্গের জন্মই এই প্রত্নতত্ত্বে পরিষ্কাররূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোমান-সমাজে গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

নগর-প্রতিষ্ঠার কাহিনী

রোম নগরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে তাহার মোটা কথা এই। একশত ল্যাটিন গোষ্ঠী একত্রে ছিল, নগর স্থাপনের প্রথম প্রবর্ত্তক। ইহারা সকলে মিলিয়া এক ট্রাইব বা জাতির অন্তর্গত। পরে আর এক-শ' গোষ্ঠী আসিয়া উপনিবেশ বসায়। ইহারা সাবেসিয়ান ট্রাইবের অন্তর্গত। তাহার পরেও নাকি আবার এক-শ' গোষ্ঠী তৃতীয় উপনিবেশ কায়েম করে। এই তৃতীয় দলের গোষ্ঠীগুলাকেও কোনো একজাতির সম্ভূত বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

কাহিনীটা শুনিলেই মনে হইবে যে গোষ্ঠী বিষয়ক তথ্যটুকু ছাড়া আর সবই আজগুবি কথা। তাহা ছাড়া এই গোষ্ঠীগুলা অনেক ক্ষেত্রে কোনো আদি-গোষ্ঠীর বাচ্চা মাত্র।

অধিকন্তু এই যে বারবার তিনবার তিনটা তথাকথিত "জাতির" উল্লেখ করা হইয়া থাকে এইগুলা বোধ হয় অনেকটা "ভুয়ো"। তবে প্রত্যেক জাতির অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলার মধ্যে পরস্পর রক্তের সম্বন্ধ কিছু না কিছু ছিল এইরূপ অনুমান করিলে হইবে না। এই হিসাবে কোনো দূরস্থিত আদি-জাতির ছাঁচে রোম-স্থায়িতাদের জাতিগুলাকে কৃত্রিম উপায়ে গড়িয়া

লওয়া হইয়াছিল এইরূপও বিশ্বাস করা চলিতে পারে। তাহা ছাড়া হয়ত বা জাতি তিনটা প্রত্যেকেই গৌণ বা মুখ্য ভাবে কোনো মাতৃস্থানীয় আদি-জাতির বংশধর।

দশ দশটা গোষ্ঠীকে এক এক ফ্রাত্রী-কেন্দ্রে বাঁধিয়া রাখা হইত। ফ্রাত্রীকে বলা হইত "কুরিয়া"। অতএব রোমের প্রতিষ্ঠাতারা সর্ব্বসমেত ত্রিশ "কুরিয়া"য় বিভক্ত ছিল।

গোষ্ঠী-শাসন

রোমের গোষ্ঠী গ্রীক্ গোষ্ঠীরই অনুরূপ। আবার গ্রীক্ গোষ্ঠীর সাবেক রূপ দেখিতে পাই আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে। এই সকল গোষ্ঠীর স্বধর্ম মোটের উপর এক প্রকার।

প্রথমতঃ, রোমের গোষ্ঠী প্রথাস নরনারীরা পরস্পর ধনদৌলতের উত্তরাধিকারী হইতে পারিত। সম্পত্তি গোষ্ঠীর বাহিরে হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারিত না। গ্রীক্ গোষ্ঠীর মতন রোমাণ প্রতিষ্ঠানেও পুরুষ-বিধিই ছিল বংশানুক্রমের কানুন। কাজেই নারীর সন্তানেরা বংশ রক্ষার ভার পাইত না। রোমের প্রাচীনতম লিখিত আইনগুলা "দ্বাদশ বিধান" নামে পরিচিত। এই বিধান মতে নিজ সন্তান সর্ব্ব প্রথম উত্তরাধিকারী। তাহার অভাবে পুরুষের তরফের "আজ্ঞাতি" অর্থাৎ আত্মীয়েরা এবং তদভাবে গোষ্ঠী মৃত ব্যক্তির ধনদৌলত ভোগ করিত। গোষ্ঠীর ভিতরই সম্পত্তির চলাচল আবদ্ধ থাকিত।

এইখানে প্রাচীনতম গোষ্ঠী-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ধরা পড়িতেছে। ধনসম্পদ বৃদ্ধির এবং একপত্নী-পতি-ত্বের প্রভাবে

এই সকল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। মান্ধাতার আমলে নিয়ম ছিল যে, গোষ্ঠীর যে-কোনো লোকই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগে সমান অধিকারী। পরে নিয়ম হয় যে, এই অধিকার একমাত্র "আজ্ঞাতি"র। ক্রমশঃ অধিকারের ক্ষেত্র আরও সঙ্কুচিত করা হয়। তাহার ফলে সর্ব্বপ্রথম অধিকারী স্বীকৃত হয় নিজ পুত্রকন্যারা এবং তাহাদের পুরুষ বংশধরেরা।

দ্বিতীয়তঃ, রোমের গোষ্ঠীতে একটা সার্ব্বজনিক গোরস্থান থাকিত। ক্লাওদিয়া নামক "পাত্রিসিয়ান" (ধনী বা সম্ভ্রান্ত) গোষ্ঠী রেজিলি হইতে রোমে আসিয়া বসতি করে। ইহাদিগকে শহরের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে কবরের জন্য জমি দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি সম্রাট আওগুস্তসের আমলেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। হ্বারুসের নায়ক টয়টোবুর্গের বনে নিহত হয়। তাহার শব রোমে আনা হইয়াছিল এবং কিংক্তিলিয়া নামক স্বগোষ্ঠীর গোরস্থানে গাড়া হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, রোমাণ গোষ্ঠীদের কতকগুলা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। এইগুলাকে "সাক্রা জেন্তিলিসিয়া" বলা হইত।

চতুর্থতঃ, গোষ্ঠীর ভিতর রোমাণরা পরস্পর বিবাহ করিতে পারিত না। এই সম্বন্ধে কোনো পাকাপাকি লেখা কানুন ছিল না। কিন্তু দস্তুর ছিল এইরূপই। সেকালের পারিবারিক নামগুলা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, কোনো ক্ষেত্রেই স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই নাম এক গোষ্ঠীগত নয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক কানুনেও এই কথা প্রমাণিত হয়। বিবাহ হইবামাত্র নারী তাহার "আজ্ঞাতি" বা কুটুম্ব বিষয়ক অধিকার বর্জ্জন করিতে বাধ্য। তাহার

গোষ্ঠীর সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাহার পুত্র-কন্যারাও তাহার জনক কিম্বা ভাইয়ের সম্পত্তিতে কোনো দাবী চালাইতে অধিকারী নয়। কারণ তাহা হইলে তাহার জনক-গোষ্ঠী নিজ সম্পত্তি বেহাত করিতে বাধ্য হইবে। এই সকল আইনের মতলবই এই যে, নারী তাহার নিজ গোষ্ঠীর ভিতর স্বামী পাইবে না।

পঞ্চমতঃ, রোমের গোষ্ঠীরা প্রত্যেকে একটা করিয়া সার্ব্বজনিক ভূমিখণ্ড রাখিত। মান্ধাতার আমলে "জাতি"গত যৌথ জমি ভাগাভাগি করিবার সময় প্রত্যেক গোষ্ঠীকে একএক টুকরা স্বতন্ত্র যৌথ জমি দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীনতম ল্যাটিন জাতিদের ব্যবস্থায় কিছু জমি জাতির তাঁবে, কিছু গোষ্ঠীর অধিকারে এবং কিছু পারিবার-সঙ্ঘের যৌথ দখলে দেখিতে পাই। রোমুলুস নাকি সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তি হিসাবে জমির ভাগবাটোআরা সাধন করে। তাহার ব্যবস্থায় জন প্রতি পড়ে ৭॥০ বিঘা (২ যুগের)। কিন্তু পরবর্ত্তী কালেও গোষ্ঠীর দখলে খানিকটা জমি ছিল দেখা যায়। অধিকন্তু রাষ্ট্রের জমি বা খাশ মহালও অনেক দিন পর্য্যন্ত রোমাণ গণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, রোমাণ গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিত। লিখিত ইতিহাসের নজিরে এই রীতির ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাই। রোমে যখন "রাষ্ট্র" গড়িয়া উঠে তখন এই প্রতিষ্ঠানই জনগণের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়। কাজেই গোষ্ঠীর দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য এই অবস্থায়

এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছিল। তবে কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। আপিয়ুস ক্লার্ত্তদিয়ুসকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তাহার গোষ্ঠীর সকল লোক এমন কি ব্যক্তিগত শত্রুরাও—"অশৌচ" বা দুঃখের পোষাক পরিয়াছিল। দ্বিতীয় পুনিক লড়াইয়ের সময় গোষ্ঠীরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোকদিগকে শত্রুদের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পয়সা খরচ করিবার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু বন্দীদিগকে এইরূপে গোষ্ঠীগত ভাবে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিবার বিরুদ্ধে তখনকার রোমাণ সেনেট বাধা দিয়াছিল।

সপ্তমতঃ, গোষ্ঠীর লোকেরা প্রত্যেক গোষ্ঠীগত নাম ব্যবহার করিতে অধিকারী ছিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার যুগ পর্য্যন্ত রোমাণদের এই দস্তুর দেখা গিয়াছে। গোলামেরা স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তাহাদের সাবেক মনিবের গোষ্ঠীগত নাম ব্যবহার করিতে পারিত। কিন্তু তাহার ফলে গোষ্ঠীগত অধিকারগুলা তাহাদের ভোগে আসিত না।

অষ্টমতঃ, রোমাণ গোষ্ঠীরা বাহিরের লোককে নিজ কেন্দ্রের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারিত। কোনো পরিবারের "পোষ্য" হইবামাত্র বিদেশী বা বাহিরের লোক গোষ্ঠীর একজনরূপে পরিগণিত হইত। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজেও এই রীতি প্রচলিত ছিল।

নবমতঃ, গোষ্ঠীর নায়কগণকে বাছাই ও বরখাস্ত করিবার অধিকার সম্বন্ধে কোনো কথা জানা যায় না। কিন্তু এই দস্তুর অনুমান করিয়া লওয়া চলিতে পারে। কেন না রোমের সর্ব্ব প্রাচীন যুগে প্রত্যেক সরকারী পদের জন্যই কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন

করা হইত। রাজপদও জনগণের বাছাইয়ের ফলে অধিকৃত হইত। "কুরী" কেন্দ্রেরও অধিকার ছিল নিজ নিজ পুরোহিত নির্ব্বাচন করিয়া লইতে। গোষ্ঠীর সর্দ্দার "প্রিন্সিপে"ও জনগণের নির্ব্বাচনের অধীন ছিল এইরূপ বিশ্বাস করা অন্যায় নয়। তবে হয়ত "প্রিন্সিপ্"রা বংশগত রূপে সর্ব্বদা একই পরিবার হইতে নির্ব্বাচিত হইত।

রোমাণ গোষ্ঠীর স্বধর্ম্মগুলা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই এই সবের ভিতর ইরোকোআ-নীতিই বিদ্যমান। তফাৎ এই যে, ইরোকোআ-সমাজে জননী-বিধিই চলিতেছিল। রোমে পুরুষ বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

মম্‌সেনের ভুল

ইয়োরোপে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ রোমের প্রত্নতত্ত্বে অনেক কথা অপরিষ্কার এবং গোঁজামিলে ভরিয়া রাখিয়াছেন। জার্ম্মাণ-পণ্ডিত মম্‌সেন প্রণীত "রোমিশি কোশুঙেন" (রোম-বিষয়ক অনুসন্ধান) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে বাহির হইয়াছিল। গণতন্ত্র এবং সাম্রাজের আমলের রোমাণদের পারিবারিক নাম সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিকপ্রবর লিখিয়াছেন:—"গোষ্ঠীগত নাম ব্যবহার করিত গোষ্ঠীর প্রত্যেক পুরুষ। পোষ্য এবং নাবালকেরাও এই অধিকার ভোগ করিত। গোলামদের এই অধিকার ছিল না। গোষ্ঠীর নারীরাও গোষ্ঠীগত নামই ব্যবহার করিত। * * * ট্রাইব বা "জাতি" (মম্‌সেন গোষ্ঠীকেন্দ্র সম্বন্ধে "জাতি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন) কোনো আদি পূর্ব্বপুরুষের বংশ সম্ভূত নরনারীদের সমাজ-কেন্দ্র। এই

পূর্ব্বপুরুষ সত্যকার কোনো লোক হইতেও পারে না হইতেও পারে। কাল্পনিক অথবা একটা মনগড়া আদি পুরুষের সন্তানেরাও এই কেন্দ্রেরই অন্তর্গত। কতকগুলা রীতিনীতি, গোরস্থান, এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদির নিয়মে জাতির নরনারী ঐক্যবদ্ধ। প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিই—নারীরাও—জাতির লোক।”

নারীর নাম এবং বিবাহের নিয়ম সম্বন্ধে মম্‌সেন কিছু গোলে পড়িয়াছিলেন। ইনি বলেন:—“বিবাহিত নারীদের নামকরণ ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। অবশ্য প্রথম প্রথম এই গণ্ডগোল ছিল না। কেননা তখন নারীরা নিজ গোষ্ঠীর বাহিরের কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারিত না। বহুকাল ধরিয়া নিজ গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করা নারীদেব পক্ষে যারপরনাই কঠিন ছিল। গোষ্ঠীর ভিতরই পরস্পর বিবাহ করা ছিল সনাতন ধর্ম্মের বিধান। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে একমাত্র বিশেষ কোনো বাহাদুরির পুরস্কার অথবা ব্যক্তিগত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ দু’একজন লোককে স্বগোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিবার ক্ষমতা মঞ্জুর করা হইত। * * * কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহ ঘটিত সেই সকল ক্ষেত্রে নারী তাহার স্বামীর জাতির (গোষ্ঠীর) অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িত। ধর্ম্মকর্ম্ম এবং সামাজিক রীতিনীতি সকল তরফ হইতে নারী তাহার নিজ কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া অপর এক কেন্দ্রের সামিল হইয়া পড়িত। ধনদৌলত বিষয়ক উত্তরাধিকারের ক্ষমতাও নিজ গোষ্ঠীর হাতে ফেলিয়া রাখিয়া বিবাহিত নারী স্বামীর সন্তানসন্ততির এবং তাহাদের গোষ্ঠীর প্রচলিত কানুন

ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইত। বস্তুতঃ নারী তাহার স্বামী কর্তৃক পোষ্যরূপে নিজ পরিবারে গৃহীত হইলে পর কি তাহাকে এই নবীন গোষ্ঠী হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে পারে ?"

মম্‌সেনের কথায় বুঝা যায় যে, রোমে কোনো কালে নারীরা নিজ গোষ্ঠীর ভিতর বিবাহ করিতে বাধ্য থাকিত। অর্থাৎ রোমাণ গোষ্ঠী ছিল "আন্তর্ব্বিবাহী"। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমাণ ঐতিহাসিক লিভিয়ুস্‌ গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আছে (৩৯ পরিচ্ছেদ, ১৯ অধ্যায়)। সেই প্রমাণ লইয়া পণ্ডিতগণের ভিতর মতভেদও কম নয়।

লিভিয়ুসের লেখা অনুসারে রোম প্রতিষ্ঠার ৫৬৮ সালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮৬ অব্দে সেনেট এক অনুশাসন জারি করে। তাহার দ্বারা ফেসেনিয়া হিস্পালা নাম্নী এক বিধবাকে নিজ সম্পত্তি সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর বাহিরে সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে, দরকার হইলে একজন অভিভাবক নিয়োগ করিতে পারিবে এইরূপও সেই অনুশাসনের মর্ম্ম,—তাহার স্বামী মৃত্যুকালে উইল করিয়াই যেন তাহাকে এই ক্ষমতা দিয়া গিয়াছে। এক জন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার ক্ষমতাও তাহার থাকিবে। যে ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিবে তাহার পক্ষে এই বিবাহের দরুণ কোনো লজ্জা বা নিন্দার কারণ থাকিবে না।

বহির্ব্বিবাহ না আন্তর্বিবাহ ?

সেনেটের এই অনুশাসন হইতে বুঝা গেল যে, ফেসেনিয়া ছিল এক স্বাধীনতা পাওয়া দাসী। এইরূপ গোলাম-নারীকে

গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আরও বুঝা গেল যে, স্বামী মৃত্যুকালে উইল করিয়া তাহার পত্নীকে গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিবার অধিকার দিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোন গোষ্ঠীর বাহিরে বিধবার বিবাহে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল বা হইত ?

(১)

মম্‌সেনের কথা অনুসারে নারীকে যদি স্বগোষ্ঠীর ভিতরেই বিবাহ করিতে হইত তাহা হইলে বিবাহের পরও নারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তই থাকিত। কিন্তু এই "আন্তর্ব্বিবাহ" সপ্রমাণ করা চাই। আর এক কথা, নারী নিজ গোষ্ঠীর ভিতরই বিবাহ করিতে বাধ্য হইলে পুরুষকেও তাহাই করিতে হইত বলাই বাহুল্য ; তাহা না হইলে বিবাহ ঘটিত কি করিয়া ? তবে দেখা যাইতেছে মজার কথা,—পুরুষ মরিবার সময় তাহার পত্নীকে এমন এক অধিকার দিয়া যাইতেছে যাহা ভোগ করা স্বয়ং তাহার নিজের পক্ষেই অসাধ্য ! আইন হিসাবে এ এক অসম্ভব তথ্য।

মম্‌সেন এই "অসাধ্য সাধনে"র কাঠিন্য বেশ বুঝিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার কেতাবের এক পাদটীকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য রহিয়াছে :—"গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ অবশ্য একমাত্র উইলকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত না। গোষ্ঠীর সকল লোকের মত দরকার হইত।"

এইখানে মম্‌সেন এক অসমসাহসিক মত ঝাড়িয়াছেন। লিভি কথিত অনুশাসনটার বাক্যে এইরূপ আন্দাজ করা কোনো মতেই চলে না। সেনেট বিধবাকে তাহার স্বামীর প্রতিনিধি

স্বরূপই ক্ষমতা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার স্বামী তাহাকে যা কিছু দিতে পারিত তাহার চেয়ে বেশি বা কম সেনেট দেয় নাই। অধিকন্তু সেনেটের এই অধিকার দেওয়া ষোল কলায় পরিপূর্ণ ছিল। অন্য কোনো আইন বা লোকমতের উপর এই অধিকারের মূল্য নির্ভর করে না। বিধবার নতুন স্বামী কাজেই কোনো হিসাবে নিন্দাভাজন হইবে না এই কথা সেনেট স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছিল। এই অনুশাসনের ভোগ সম্বন্ধে বিধবার বা তাহার নতুন স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো গণ্ডগোল যেন সৃষ্টি না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য এমন কি কন্‌সালপ্রিটার ইত্যাদি সরকারী কর্ম্মচারীদিগকেও সেনেট আদেশ দিয়াছিল। সকল দিক হইতেই মম্‌সেনের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

(১)

এখন ধরা যাউক যেন নারী বাহিরের কোনো লোককেই বিবাহ করিত কিন্তু বিবাহের পর নিজ গোষ্ঠীতেই থাকিত। লিভির বাক্য মাফিক্ তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার স্বামী মরিবার সময় পত্নীকে গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিবার অধিকার দিতে পারিত! অর্থাৎ সে অপর এক গোষ্ঠীর লোক কি করিবে না করিবে সে সম্বন্ধে উইল করিয়া যাইতে অধিকারী ছিল। এইরূপ ত যুক্তিসঙ্গত আলোচনায় সময় কাটানো ঝকমারি!

আসল কথা প্রথম হইতেই বুঝিয়া রাখা উচিত যে, নারীর প্রথম স্বামীই ছিল বাহিরের গোষ্ঠীর লোক। কাজে কাজেই প্রথম হইতেই বিবাহিতা নারী তাহার স্বামীর গোষ্ঠীরই একজন। তাহা হইলে সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

বিবাহের পর নারী নিজ গোষ্ঠী হইতে ছাড়া হইয়া পড়ে। রক্তের টানে সে স্বামীর গোষ্ঠীর লোক যদিও নয় কিন্তু পোষ্য রূপে সে এই গোষ্ঠীরই লোক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারও তাহার এই গোষ্ঠী-ধর্ম্ম অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ বিধবার হাতে আসে। এই অবস্থায় বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে স্বামীর গোষ্ঠী হইতেই নতুন স্বামী গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা তাহা না হইলে বিধবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামী-দত্ত সম্পত্তি অন্য গোষ্ঠীতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু সম্পত্তিকে গোষ্ঠীর হাত-ছাড়া হইতে দেওয়া কোনো মতেই সম্ভব ছিল না।

কিন্তু যদি একটা ব্যতিরেক করিতেই হয় তাহা হইলে এই ব্যতিরেকের অধিকারী কে? স্বামী। সে তাহার নিজ সম্পত্তির কিয়দংশ তাহার পত্নীকে দান করিয়াছে। সে যদি চায় যে তাহার পত্নী অপর কোনো গোষ্ঠীর লোককে বিবাহ করুক তাহা হইলে এই সঙ্গে তাহার দেওয়া সম্পত্তিও অন্য গোষ্ঠীতে চলিয়া যাইবে না কি? সে বিবাহ করিয়া নারীকে তাহার গোষ্ঠীর ভিতর আনিয়াছিল। অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেমন নিজের জিনিষ, তাহার স্ত্রীও সেইরূপ নিজস্ব। এই দুই নিজস্বই সে উইল করিয়া অপর এক গোষ্ঠীর হাতে দিয়া যাইতেছে লিভির গ্রন্থে এইরূপ বুঝাই যুক্তিসঙ্গত। শেষ পর্য্যন্ত মমসেন প্রচারিত "আন্তর্ব্বিবাহ" পরিত্যাগ করিয়া মর্গ্যান-বিবৃত "বহির্ব্বিবাহ" প্রথাই রোম সম্বন্ধে স্বীকার করিতে।

(৩)

লিভির বাক্য সম্বন্ধে আর একটা ব্যাখ্যা বাজারে খুব বেশি

চলিতেছে। লাঙ্গে প্রণীত "র‍্যোমিশে আন্টারটিয়্যার" (রোমের প্রত্নতত্ত্ব) গ্রন্থে (১৮৭৬) বলা হইয়াছে যে,—"স্বাধীনতা পাওয়া গোলাম-নারীরা বিশেষ অনুমতি ছাড়া গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিতে অধিকারী ছিল না। তাহা ছাড়া যে সকল কাজ করিলে "পরিবারগত অধিকার" লুপ্ত হইয়া যায় এবং গোলাম-নারী অন্য এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে সেই সকল কাজ করিতে হইলেও তাহাদিগকে প্রথম হইতে বিশিষ্ট সরকারী হুকুম লইতে হইত।" এই ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে "স্বাধীন" রোমাণ নারী সম্বন্ধে লিভির বাক্যে কোনো ব্যবস্থা নাই বুঝিতে হইবে। কাজেই তাহারা যে গোষ্ঠীর ভিতরে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকিত একথাও কোনো মতেই বলা চলে না।

"এমুপসিও জেন্টিস্" (অর্থাৎ গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ) শব্দ এই স্থান ছাড়া গোটা রোমাণ সাহিত্যের আর কোথাও পাওয়া যায় না। "এনুবেরে" (অর্থাৎ বহির্বিবাহ) শব্দটাও লিভির গ্রন্থে মাত্র তিন ঠাঁইয়ে দেখিতে পাই। কিন্তু গোষ্ঠীর সম্পর্কে এই তিন ঠাঁইয়ের কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। অথচ রোমাণ মেয়েরা যে গোষ্ঠীর ভিতরেই বিবাহ করিতে বাধ্য ছিল এই অদ্ভুত ধারণাটা এই একমাত্র বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এই ধারণা ঠেঁকসই নয়। কারণ হয় এই বাক্যের দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া গোলাম-নারীদের বিশেষ বিধিনিষেধের কথা বুঝিতে হইবে। অতএব সাধারণ স্বাধীন নারীদের সম্বন্ধে এই বাক্যে কোনো কথাই বলা হয় নাই। অথবা এইখানে যদি স্বাধীন নারীদের কথা থাকে তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝাই

যাইতেছে যে, তাহারা সাধারণতঃ গোষ্ঠীর বাহিরেই বিবাহ করিতে অভ্যস্ত ছিল। বিবাহের দ্বারা তাহারা পিতৃ গোষ্ঠীর আওতা হইতে স্বামীর গোষ্ঠীতে বদলি হইত। অতএব মমসেনের বিরুদ্ধে এইখানে মর্গ্যানেরই বাজি জিৎ।

"কুরিয়া" বা রোমাণ "ফ্রাত্রী"

রোম প্রতিষ্ঠিত হইবার তিন শ' বৎসর পরেও গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানকে খুব প্রবল দেখিতে পাই। এই সময় ফেরিয়ান নামক এক "পাত্রিসিয়ান" (কুলীন বা সম্ভ্রান্ত ও ধনী) গোষ্ঠী পার্শ্ববর্ত্তী ভেইঈ নগরের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করিবার জন্য সেনেটের অনুমতি পাইয়াছিল। এই গোষ্ঠীর ৩০৬ জন পুরুষ লড়িতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। বংশরক্ষা করিবার জন্য মাত্র একজন বালক নাকি জীবিত ছিল।

রোমের গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানে "কুরিয়া'র মর্য্যাদা ছিল ঢের। দশ দশটা গোষ্ঠীতে যে "ফ্রাত্রী"-কেন্দ্র গঠিত হইত তাহার নাম ছিল "কুরিয়া"। গ্রীক্ "ফ্রাত্রী"র চেয়ে রোমাণ "ফ্রাত্রী"র অধিকার বেশি থাকিত। প্রত্যেক "কুরিয়া" ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে ছিল স্বরাট। নিজ নিজ রীতিনীতি, পুরোহিত, দেবোত্তর সম্পত্তি ইত্যাদি দস্তর মতনই ছিল। প্রত্যেক "কুরিয়া"র পুরোহিতেরা একত্রে এক একটা "কলেজিয়ুম" বা পুরোহিত-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিত।

দশটা "কুরিয়া"য় হইত এক একটা ট্রাইব বা জাতি। জাতি-নায়ক, লড়াই-নায়ক এবং পুরোহিত সমগ্র জাতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইত। তিনটা জাতি সমবেত ভাবে "পোপুলুস রোমান্নুস" অর্থাৎ রোমাণ-সমাজ নামে পরিচিত ছিল।

কাজেই গোষ্ঠীর ব্যক্তি না হইলে অর্থাৎ "কুরিয়া" এবং ট্রাইবের সভ্য না হইলে কেহই "রোমাণ-সমাজের" একজন রূপে পরিগণিত হইতে পারিত না। রোমাণদের সর্ব্ব প্রথম শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক নীবুরের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

"সেনেট" ও "কুরিয়া"-সভা

সেনেট ছিল সার্ব্বজনিক কাজকর্ম্মের শাসক। তিন শ' গোষ্ঠীর গোষ্ঠী-নায়ক হইত সেনেটের সভ্য। গোষ্ঠী "বৃদ্ধ" বলিয়া তাহাদিগকে লোকে "পাত্রে" পিতা বা জনকস্থানীয় বিবেচনা করিত। সেনেটকে এই কারণ বৃদ্ধ-সভা বা পিতৃপরিষৎ বলা হইত। "সেনেক্‌স্" শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। এই শব্দ হইতেই সেনেট শব্দের উৎপত্তি।

গোষ্ঠী-নায়ক বা গোষ্ঠী-বৃদ্ধেরা মোটের উপর বংশগত রূপেই বাছাই হইত। কাজেই জন্মের অধিকারেই সেনেট পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিত। কৌলীন্য, আভিজাত্য ইত্যাদি সবই পুত্র-পৌত্রাদি ধারায় চলিয়া আসিত। এই সকল পরিবারই "পাত্রি-সিয়ান" নামে অভিহিত হইত। ইহারা একমাত্র সেনেটেরই সভ্য জোগাইত এমন নয়; রোমের সকল সরকারী চাকরীই এই সকল অভিজাত বংশের একচেটিয়া ছিল।

কাহিনী শুনা যায় যে,"রোমুলুস" নাকি "পাত্রিসিয়ান" উপাধি এবং এই উপাধিসংসৃষ্ট একচেটিয়া দাবীদাওয়া প্রথম সেনেটের সভ্যগণকে দান করিয়াছিল। কাহিনীর মর্ম্ম এই যে, রোমাণ জনসাধারণ এই সকল জন্মগত অধিকারভোগী কুলীন

বংশগুলার আধিপত্য নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

সেনেট ছিল আথেন্সের "বুলে"-পরিষদের অনুরূপ। অনেক বিষয়ে সেনেটের রায়ই ছিল শেষ কথা। অন্যান্য বিষয়ে,—বিশেষতঃ নতুন কানুন জারি সম্বন্ধে সেনেট প্রাথমিক আলোচনা করিত মাত্র। এইগুলা জারি হইত সার্ব্বজনিক-সভায়। সেই সভার নাম ছিল "কোমিশিয়া কুরিযাতা" অর্থাৎ "কুরিয়া"-সভা। ত্রিশ "কুরিয়া"র প্রত্যেকেরই একটা করিয়া ভোট দিবার অধিকার থাকিত। "কুরিয়া"য় হাজির থাকিত রোমের সকল লোকই। গোষ্ঠী হিসাবেই বোধ হয় ইহারা "পংক্তিতে" বসিত।

"কুরিয়া"-সভা আইনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য অথবা মঞ্জুর করিতে অধিকারী ছিল। বড় বড় সকল কর্ম্মচারীই এই সভায় বাছাই হইত। "রেক্স্" অর্থাৎ "তথাকথিত" রাজাও এই সভায়ই নির্ব্বাচিত হইত। লড়াই ঘোষণা করিবার ক্ষমতা ছিল এই সভার। কিন্তু সন্ধি স্থাপন করিবার ভার ছিল সেনেটের হাতে। মৃত্যু-দণ্ড বিষয়ক সকল বিচারেরই "আপীল" শুনিবার এক্তিয়ার ভোগও "কুরিয়া"-সভার অন্যতম নিজস্ব।

"রেক্স্" কি "রাজা" ?

সেনেট এবং "কুরিয়া"-সভা এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে "রেক্সে"র পদ ছিল প্রাচীন রোমের তৃতীয় প্রতিষ্ঠান। গ্রীসের "বাসিলিউস্" আর রোমাণ "রেক্স্" প্রায় একই। কিন্তু মম্‌সেন "রেক্স্" শব্দে যেরূপ রাজা বুঝিয়াছেন সেরূপ কিছু সম্‌ঝিবার কারণ নাই।

কেল্টিক-আইরিশ "রিগ" এবং গথিক "রাইক্স্" বা ল্যাটিন "রেক্স্"ও তাই। জার্মাণ "ফ্যিষ্ট´," ইংরেজি "ফার্ষ্ট´" এবং ডেনিস "ফোর্ষ্টে´" প্রথমে গোষ্ঠী বা জাতির "মুখ্য'" সর্দ্দার, নায়ক, বা প্রথম বুঝাইত। "রেক্স্" ইত্যাদি অন্যান্য ভাষার শব্দগুলাও এই অর্থেরই বিজ্ঞাপক। নৃপতি বা রাজা বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহার জন্য এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইত না।

পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যখন রাজপদ গড়িয়া উঠে তখন গথেরা এই জন্য এক নতুন শব্দ কায়েম করিয়াছিল। সে "থিউদান্স্" বা সমগ্র জাতির সমর-নায়ক। গথিক সাহিত্যে বাইবেলের অনুবাদ প্রচার করিয়া উল্ফিলা প্রসিদ্ধ। এই অনুবাদে অর্ত্তাজার্কেসেস্ এবং হেরোডকে "রাইক্স্" বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে "থিউদান্স্"। রোমাণ নরপতি তাইবেরিয়সের সাম্রাজ্যকে "রাইকি" না বলিয়া "থিউদিনাস্সুস" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ল্যাটিন "রেক্স্" শব্দকে "থিউদান্সে"র প্রতিশব্দ বিবেচনা করা চলিতে পারে না।

"রেক্সে"র কর্ত্তব্য ছিল নানাবিধ। রোমাণ-সমাজের সেনা-নায়কত্ব ছিল তাহার হাতে। পুরোহিতদের সর্দ্দার হিসাবেও এই পদের দায়িত্ব থাকিত অনেক। কতকগুলা বিচারকার্য্যেও "রেক্সে"র কর্ত্তৃত্ব চলিত। জনগণের জীবন, ধনদৌলত ইত্যাদির উপর তাহার কোনো বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। পল্টনের নেতা অথবা বিচারপতি হিসাবে এই সম্বন্ধে তাহার যে সব অধিকার ছিল তাহার বেশি কিছু "রেক্স" ভোগ করিতে পারিত না।

"রেক্সে"র পদে লোক বহাল হইত বাছাইয়ের ফলে।

জন্মগত অধিকারের প্রভাবে কেহ "রেক্স্" হইতে পারিত না। বোধ হয় পূর্ব্ববর্ত্তী "রেক্স্" তাহার উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু নির্ব্বাচনের এক্তিয়ার ছিল "কুরিয়া"-সভার হাতে। গদিতে বসাইবার ভার থাকিত আর এক সভার তাঁবে। "রেক্স্"কে খেদাইয়া দেওয়াও জনগণের ক্ষমতার অধীন ছিল। তার্ক্ইন সুপার্বুসের ভাগ্য কথা অবিদিত নয়।

বীর-যুগের গ্রীক্দের মতন তথাকথিত রাজ-যুগের রোমাণরাও "সামরিক গণতন্ত্রে"র লোক ছিল। গোষ্ঠী, "ফ্রাত্রী এবং জাতি এই তিন কেন্দ্রে সেই শাসন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইত। "কুরিয়া" এবং ট্রাইব-অর্থাৎ "ফ্রাত্রী" এবং জাতি—এই দুই কেন্দ্র অবশ্য অনেকটা কৃত্রিম, কাল্পনিক বা মনগড়া সন্দেহ নাই। কিন্তু খাঁটি নৈসর্গিক রক্তের এই সকল কেন্দ্রের যে ইজ্জৎ থাকিত রোমাণ-সমাজে এই কৃত্রিম প্রতিষ্ঠানগুলার ইজ্জৎ ততটাই দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ স্বাভাবিক সমরক্তজ কেন্দ্রের ছাঁচেই এই কেন্দ্রগুলাকে চালানো হইত।

"পাত্রিসিয়ান" ও "অনধিকারী" "প্লেব"

"পাত্রিসিয়ান" বংশগুলি দিন দিন আভিজাত্যের বিশিষ্ট অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া চলিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে "রেক্স্"রাও ক্রমশঃ সমাজের সকল বিভাগে হাত পা ছড়াইয়া প্রবল হইতেছিল। এই দুই তথ্য স্বীকার করিলেও গোষ্ঠীধর্ম্মের গোড়ার কথা রোমাণ-সমাজে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাই।

রোমের লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিল।

দেশজয়ের ফলে রোমের চৌহদ্দিও বিস্তৃত হইতে থাকে। বিদেশী লোকেরা আসিয়া রোমে এবং রোমের অধিকৃত জনপদে বস্তি গাড়িতেছিল। এই সকল বিদেশীরা মোটের উপর প্রধানতঃ ল্যাটিন জাতীয় নরনারী।

কিন্তু রোমাণ-সমাজে এই সকল নবাগতের কোনো ঠাঁই ছিল না। ইহারা রোমীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক লেনদেন চালাইতে অধিকারী ছিল না। ব্যক্তিগত হিসাবে ইহারা স্বাধীন নরনারী সন্দেহ নাই। জমিজমার স্বত্বে তাহাদের অধিকার ছিল। খাঁটি স্বদেশীদের মতনই ইহারাও খাজানা দিত এবং সামরিক কাজে যোগ দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু কোনো সরকারী কাজে তাহারা চাকুরী পাইত না। "কুরিয়া"সভায় যোগ দেওয়া তাহাদের অধিকারের বহির্ভূত থাকিত। নতুন নতুন বিজিত-ভূখণ্ডেও তাহারা অধিকার পাইত না।

এই সকল "অনধিকারী" নবাগত স্বাধীন নরনারীই "প্লেব্‌স্" বা জনসাধারণ নামে পরিচিত হইতে থাকে। গুণ্‌তিতে ইহাদের সংখ্যা প্রতি দিনই বাড়িতেছিল। অধিকন্তু লড়াইয়ের কুচকাওয়াজেও ইহাদের হাত পাকাই ছিল।

কাজেই ইহাদের সামাজিক প্রভাব ক্রমেই প্রবলতর হইতেছিল। এই নব শক্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য রোমের সাবেক "পোপুলুস্" বা "খাঁটি স্বদেশী সমাজ" অশেষ প্রকার বিধিনিষেধ জারি করিতে বাধ্য হয়।

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। জমিজমা বোধ হয় "পোপুলুস্" আর "প্লেব স্" অর্থাৎ স্বদেশী আর বিদেশী এই দুই সমাজে সমানভাবে বিভক্ত ছিল। কিন্তু "নবীন

ধনদৌলত" ছিল প্রধানতঃ "প্লেবস্", নবাগত নরনারী বা জনসাধারণের হাতে। শিল্প এবং বাণিজ্য এই দুই পথে নয়া ধনসম্পদ সৃষ্টি হইতেছিল। এই ধনের বিকাশ হইতে অবশ্য অনেক দিন লাগিয়াছে।

সার্ভিয়ুস-সংহিতার শ্রেণী-বিভাগ

রোমের এই গোষ্ঠীধর্ম্ম কবে কি উপায়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহার যথাযথ বিবরণ দেওয়া বিশেষ কঠিন। প্রাচীনতম কাহিনীগুলা একে ত কাহিনী মাত্র; তাহার উপর অস্পষ্ট ও আঁধারে ভরা। এই আঁধারকে আরও আঁধারময় করিয়া তুলিয়াছেন আজকালকার ইয়োরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববাগীসেরা। ইঁহারা আইনের শিক্ষা পাইয়া সেকালের সব কিছুকেই নব্যন্যায়ের বিধান মাফিক্ আইনের চোখে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই রোমাণ-সমাজে যুগান্তরটা কোন্ পথে কেন সাধিত হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। এইটুকু মাত্র জানি যে সেকালের "ধর্ম্ম"-বিপ্লবে বা নীতি-পুনর্গঠনে "প্লেবস্-পোপুলুসে"র অর্থাৎ নবীন-প্রবীনের লড়াই একটা বড় কথা। সেই সংগ্রাম এবং বিপ্লবের ফল দেখিতে পাই এক নয়া সংহিতায় বা স্মৃতিশাস্ত্রে।

রোমুলুস-স্মৃতিকে গ্রীসের (আথেন্সের) থিসির্উস্-স্মৃতির জুড়িদার বিবেচনা করা যাইতে পারে। সেই হিসাবে রোমুলুস-স্মৃতির যুগধর্ম্ম ভাঙিয়া সার্ভিয়ুস তুলিয়ুস নামক "রেক্স্" যে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত করে তাহাকে আথেনিয়া সমাজের সোলোন-যুগের অনুরূপ ধরিয়া লওয়া চলে। সার্ভিয়ুস-নীতি সোলোন-

নীতির মতনই একটা নতুন সার্ব্বজনিক-সভা কায়েম করিয়াছিল। "পোপুলুস" এবং "প্লেবস" হিসাবে এই সভার সভ্য নির্ব্বাচন হইত না। সামরিক জীবনে যে সকল লোক যোগ দিতে অধিকারী ছিল—তাহারা "স্বদেশী"ই হউক বা "বিদেশীই" হউক—এই সভার সভ্য হইতে পারিবে এই বিধান জারি করিয়া সাহ্বিয়ুস এক যুগ প্রবর্ত্তন করে।

ধনদৌলতের পরিমাণ অনুসারে রোমের "সকল" নরনারীকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা সাহ্বিয়ুস-নীতির প্রথম কাজ। প্রথম শ্রেণীর লোকের কিম্মৎ ছিল কম্‌সেকম্ ১০০,০০০ "আস্"। একলাখ "আস্"কে ৩,১৫৫ মার্কিণ ডলার বা প্রায় ১০,০০০৲ আজকালকার ভারতীয় মুদ্রার সমান বিবেচনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর সম্পত্তির দাম যথাক্রমে ৭৫,০০০, ৫০,০০০, ২৫০০০ এবং ১১,০০০ "আস"। অন্ততঃ পক্ষে এই এই পরিমাণ সম্পত্তির মালিক না হইলে কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইত না। ষষ্ঠ শ্রেণীর লোককে বলা যাইতে পারে "প্রোলেটারিয়ান"। ইহাদের সম্পত্তি ১১,০০০ "আস" (৩৮৮ ডলার) বা প্রায় ১১,০০০৲ টাকার কম। ইহারা পল্টনের কাজে অনধিকারী। ইহাদের নিকট হইতে কোনো প্রকার খাজনা আদায়ও করা হইত না।

"সেঞ্চুরিয়াতা"র বিধানে ধনতন্ত্র

সাহ্বিয়ুস-প্রবর্ত্তিত, নয়া সার্ব্বজনিক-সভার নাম ছিল "কোমিশিয়া-সেঞ্চুরিয়াতা" (বা শত-দল সভা)। ফি "সেঞ্চুরিয়া"

বা শত-দল হিসাবে জনগণকে পল্টনের রীতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইত। প্রত্যেক "সেঞ্চুরিয়া"র একটা করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা ছিল। লড়াইয়ের কার্য্য উপলক্ষে "সেঞ্চুরি" গুলা যেমন চলিত সভার কাজেও তাহাদের দস্তুর এবং রীতিনীতি সেই রূপই নিয়ন্ত্রিত হইত।

রণক্ষেত্রে আসিত ৮০০০ ফৌজ অর্থাৎ ৮০ "সেঞ্চুরি" প্রথম শ্রেণী হইতে কাজেই "কোমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াতা"য়ও প্রথম শ্রেণী ছিল ৮০ শত-দল অতএব ৮০ ভোট। এইরূপে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত যথাক্রমে ২০, ২২ এবং ৩০ "সেঞ্চুরি" অর্থাৎ তদনুরূপ ভোটক্ষমতা ও শত-দল-সভায় কার্য্যকরী হইত। ষষ্ঠ শ্রেণী অর্থাৎ "নির্ধন" এবং "অনধিকারী"দিগকে—বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে!—একটা "সেঞ্চুরি" অর্থাৎ এক ভোটের কিস্মৎ দেওয়া হইত। এই সকলের অতিরিক্ত ছিল আর এক শ্রেণী। তাহারা ধনবানদের ধনবান অর্থাৎ অতিমাত্রায় ধনী লোক। এই শ্রেণী জোগাইত ঘোড়সওয়ার। ইহারা ১৮০০ অশ্বারোহী খাড়া করিত। অর্থাৎ ইহারা ১৮ শত-দলে সঙ্ঘবদ্ধ, কাজেই "সেঞ্চুরিয়াতা"র সভায় ১৮ ভোটের অধিকারী।

অতএব দেখা যাইতেছে যুগাবতার ধর্ম্মবিপ্লব সাধ সার্ভিয়ুস তুলিয়ুসের নবীন সভায় মোটের উপর ১৯৩ শত-দলের শাসন চলিত। ইহাদের ভোট সংখ্যাও ১৯৩। এই সভার দ্বারা কোনো মত গ্রহণ করাইতে হইলে তাহার স্বপক্ষে অন্ততঃ পক্ষে ৯৭ ভোট দেওয়া দেওয়া চাই। এই সংখ্যা সর্ব্বদাই ধনীদের "হাতের পাঁচ"। কেননা প্রথম শ্রেণীর ৮০ এবং ঘোড়সওয়ারদের ১৮ এই দুইয়ে মিলিয়া হয় ৯৮! অর্থাৎ ধনবান

এবং ধনবানদের সেরা এই দুই শ্রেণীর লোক একত্রে অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করিয়াও রোমের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত।

"সেঞ্চুরিয়াতা"র সভা সাবেক কালের "কুরিয়া"-সভাকে কানা করিয়াছিল। বড় বড় যা কিছু রাষ্ট্রকাজ সবই এই নতুন সভায় নির্দ্ধারিত হইত। "কুরিয়া"-সভা এবং গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান-গুলা সাভিয়ুসের যুগে মামুলি সামাজিক এবং ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ক অনুষ্ঠানের ভার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। এই অবস্থায়ই আথেন্সের গোষ্ঠী-কেন্দ্রগুলার মতন রোমের সাবেক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিছু কাল ধরিয়া "ভেরাণ্ডা ভাজিতে" থাকে। দেখিতে দেখিতে "কুরিয়া"-সভা লোপ পাইল। পরে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের তিন কেন্দ্র তুলিয়া দেওয়া হয়। তাহার ঠাঁইয়ে কায়েম করা হয় চার জাতি। শহ্‌রের চার অঞ্চলে এই চার জাতিকে জনপদ হিসাবে কতকগুলা রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। রক্তের টান রোমাণরা অনেক দিনই ভুলিয়া গিয়াছে।

রোমাণ গণতন্ত্রের আর্থিক ইতিহাস

তথাকথিত রাজতন্ত্র বা "রেক্‌স্"-পদ উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বেই গোষ্ঠী-ধর্ম্মের রক্তকেন্দ্র লুপ্ত হইয়াছিল। স্থান-গত জনবিভাগ এবং সম্পত্তি-গত শ্রেণীভেদ এই দুই দফায় প্রতিষ্ঠিত এক সমাজবন্ধন প্রণালী দেখা দেয়। তাহারই নাম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। দণ্ড দিবার সার্ব্বজনিক ক্ষমতা আসে সমর কার্য্যে অধিকারী শ্রেণীদের হাতে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইত গোলামদের বিরুদ্ধে আর "নির্ধন" এবং রণকর্ম্মে অনধিকারী "প্রোলেটারি-য়ান"দের বিরুদ্ধে।

শেষ রেক্স্-তার্কুইনিয়ুস সুপার্বুস্ সত্যসত্যই "রাজা" হইয়া বসে। ইহাকে তাড়াইয়া দিয়া রোমাণরা তাহার ঠাঁইয়ে দুই সমর-সর্দ্দার কায়েম করে। ইহারা "কোনস্থল" নামে পরিচিত। প্রত্যেকের ক্ষমতা ছিল সমান। আমেরিকার ইরোকোআদের দস্তুরটা স্মরণ করিতে হইবে। রোমের শাসন পদ্ধতি এইখানে ষোলকলায় পূর্ণ হইল। গণতন্ত্র দেখা দিল।

তাহার পর রোমে ঘটিয়াছে পাত্রিসিয়ান-প্লেবদের লড়াই। প্লেবরা সরকারী-চাকরী এবং খাসমহালে অধিকার দাবী করিতে থাকে। ইহাদের ধাক্কায় আত্মরক্ষার জন্য পাত্রিসিয়নেরা শিল্প ব্যবসায়ে সম্পত্তিশীল "নবীন ধনী"দের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ছোটখাট জমির মালিকেরা লড়াইয়ে যোগ দিতে দিতে দরিদ্র হইয়া পড়ে। তাহাদের জমিজমা বিক্রী হইয়া যায়। কাঁচা টাকাওয়ালা "নবীন ধনী"দের হাতে।

মস্ত মস্ত ভূমি সম্পত্তির অধিকারী "জমিদার" শ্রেণীর লোক রোমে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইতে থাকে। ইহাদের জমি চাষের জন্য গোলাম বহাল করা আবশ্যক হয়। গোলাম-প্রথায় সমাজে যত দুর্গতি ঘটে তাহার ভিতর লোকসংখ্যার হ্রাস অন্যতম। নেতায় নেতায় ঝগড়াও সুরু হয়। শেষ পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের গলা টিপিয়া জননায়ক হন রোমাণ সাম্রাজ্যের বাদশাহ্। এই বাদশাহী যুগের আর্থিক ও সামাজিক কলঙ্কই শেষ পর্য্যন্ত রোমে জার্ম্মাণ "বার্ব্বার"দিগকে রাজ্য বিস্তারের সুযোগ দিয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

কেল্টিক ও জার্ম্মাণ জাতির গোষ্ঠী-প্রথা

জগতের প্রায় সকল অনুন্নত বা আদিম জাতির ভিতরই গোষ্ঠী-প্রথা দেখা যায়। প্রাচীন ইয়োরোপের মতন প্রাচীন এশিয়ারও সকল "সভ্য"সমাজেই কোনো না কোনো যুগে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে।

গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান অল্প দিন হইল পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের নৃতত্ত্ববিৎ ম্যাক্লেনান এই প্রথার বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠানটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক তাঁহার গবেষণা সমস্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, কালমুক, সির্কাসিয়ান, সামোয়েদ এবং অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী-ধর্ম্মের নিয়মে পরিচালিত হয়। রুশ পণ্ডিত কোহ্বালেহ্বস্কি পশাহ্ব, খেহ্বসুর, স্বানেৎ এবং অন্যান্য ককেসাস পাহাড়ের জনসমাজে এই প্রতিষ্ঠান আবিষ্কার করিয়াছেন। কেল্টিক এবং জার্ম্মাণ জাতির অন্তর্গত বহু সমাজেও গোষ্ঠী-প্রথা অতি সাধারণ কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়র্ল্যাণ্ড, হ্বেল্স ও স্কট্ল্যাণ্ড

প্রাচীনতম কেল্টিক কানুন আজও আয়র্ল্যাণ্ডের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। এমন কি ইংরেজের আইনের পাল্লায় পড়িয়াও গোষ্ঠী-প্রথা আইরিশ-সমাজ হইতে একদম উপিয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যান্ত স্কট্ল্যাণ্ডেও গোষ্ঠি-নীতি চলিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের আইন এবং আদালতের প্রভাবে এই প্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। "আইন-আদালত"ই গোষ্ঠীর যম।

হ্বেল্স্-প্রদেশেও ইংরেজ আক্রমণের পূর্ব্বে,—অর্থাৎ একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যৌথ চাষআবাদ প্রচলিত ছিল। অবশ্য তখন এই প্রথা সাবেক কালের এক জের মাত্র বিবেচিত হইত। পনর যোল বিঘা জমি থাকিত প্রত্যেক পরিবারের স্ববশে। অন্যান্য জমি চষা হইত পরিবারে পরিবারে সম্মিলিত রূপে। সম্মিলিত চাষের ফসল পরে ভাগাভাগি করাও হইত।

"জোড়-পরিবার"

আয়র্ল্যাণ্ডের এবং স্কট্ল্যাণ্ডের নজির হইতে বিশ্বাস করা চলে যে, হ্বেল্সের পঞ্চায়ৎ-প্রথা গোষ্ঠী-ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠান। তবে হ্বেল্সের কানুনগুলা গভীরতর ভাবে আলোচনা করিলে হয়ত নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আয়র্ল্যাণ্ডের এবং হ্বেল্সের স্মৃতি-শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেল্টিক সমাজে এক-পত্নী-(পতি)-ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখনও "জোড়-পরিবার" চলিতেছিল।

হেবেল্‌সে বিবাহকে পাকাপাকি রদ করিতে হইলে জানানি-শুনানির পর অন্ততঃ পক্ষে সাত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইত। অর্থাৎ ততকাল পর্য্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষ যৌন-সংসর্গ চালাইতে অধিকারী ছিল। "ডাইভোর্স" বা বিবাহ-ভঙ্গের সময় স্ত্রীই সম্পত্তি বিভাগে কর্তৃত্ব করিত। স্বামী এই ভাগবাটোআরায় সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজের হিস্যা লইত।

পারিবারিক জিনিষপত্রের ভাগবাটোআরায় এক বিচিত্র নিয়ম ছিল। পুরুষের ইচ্ছায় বিবাহ রদ করিতে হইলে সে স্ত্রীকে বিবাহের যৌতুক ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিত এবং অন্যান্য দ্রব্যও কিছু কিছু দিত। স্ত্রীর ইচ্ছায় "ডাইভোর্স" ঘটিলে তাহার ভাগ্যে জুটিত অল্পমাত্র সামগ্রী। সন্তানসন্ততিরও ভাগাভাগি হইত। তিন সন্তান ভাগ করিতে হইলে পুরুষ পাইত প্রথম ও তৃতীয়, নারীর হিস্যায় আসিত দ্বিতীয়।

স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করিবার পর প্রথম স্বামী তাহাকে চাহিলে সে আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিতে বাধ্য ছিল। এমন কি দ্বিতীয় স্বামীর বিছানায় পদার্পন করা হইয়া থাকিলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। কিন্তু যদি সাত বৎসর ধরিয়া কোনো দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গে এই নারী বসবাস করিত তাহা হইলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ না ঘটিলেও তাহারা বিবাহিত বলিয়া গৃহীত হইত।

বিবাহের পূর্ব্বে নারীর সতীত্ব একটা বিশেষ কিছু বিবেচিত হইত না। কিন্তু বিবাহের পরে স্ত্রীকে পরপুরুষের ভোগে দেখিলে স্বামী তাহাকে প্রহার করিতে অধিকারী ছিল। কিন্তু প্রহারের পর স্ত্রীকে আর কোনো সাজা দেওয়া চলিত না।

স্বামীর নিঃশ্বাস দুর্গন্ধময় এই ওজুহাতে স্ত্রী বিবাহ-ভঙ্গের অধিকার পাইত। এই ধরণের আরও অনেক রীতি দেখা যায়।

সেকালে জমিদার, রাজা বা মালিকেরা যে-কোনো বিবাহিতা নারীর প্রথম রাত্রি ভোগ করিতে অধিকারী ছিল। ক্রমে প্রজারা "সেলামি" দিয়া এই দাবী হইতে অব্যাহতি পায়। হ্বেল্‌সের কানুনে প্রথম রাত্রির অধিকার কিনিবার সেলামি সম্বন্ধে অনেক বিধান আছে। এই সংহিতার "গোব্‌র্ মের্থ," মধ্যযুগের "মার্খেতা" এবং ফরাসী "মার্কেৎ" একই রীতির বিজ্ঞাপক।

নারীরা সার্ব্বজনিক-সভায় যোগদান করিয়া ভোট দিতে পারিত। আয়র্ল্যাণ্ডের স্মৃতি-শাস্ত্রেও এই সবই দেখিতে পাই। হ্বেল্‌সের মতন সেদেশেও "সাময়িক" বিবাহই দস্তুর ছিল। নারীদের সামাজিক এবং "রাষ্ট্রীয়" অধিকার বেশ বড় রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহ-ভঙ্গ বিষয়ে মেয়েদের এক্তিয়ার ছিল উঁচু। গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের জন্যও মেয়েরা একটা বিশেষ "পারিশ্রমিক" পাইত। আইরিশ-সমাজে অন্যান্য পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে "প্রথমা পত্নীর" রেওয়াজও সুপ্রচলিত ছিল। জারজ ও অন্যান্য সন্তান উভয়েই পৈতৃক সম্পত্তি ভোগের অধিকারী বিবেচিত হইত।

"জোড়-পরিবার" বলিলে যাহা কিছু বুঝা যায় কেল্টিক-সমাজে তাহার সকল লক্ষণই বর্ত্তমান। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজে বিবাহের কানুনগুলা কেল্টিক আইনের তুলনায় কিছু কড়া বোধ হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। কেননা সীজারের সময়েও কেল্ট্‌রা "দলগত" বিবাহ বা অবাধ-যোনি-সংসর্গের স্বধর্ম্মই চালাইতেছিল।

"সেপ্‌ট্‌" ও "রুন্দাল"

আয়র্ল্যাণ্ডের গোষ্ঠীকে বলে "সেপ্‌ট্‌"। "ট্রাইব" বা "জাতির" প্রতিশব্দ "ক্লাইন" বা "ক্ল্যান"। প্রাচীন আইরিশ স্মৃতি-শাস্ত্রে এই প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ত আছেই সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ "স্মার্ত্তে"দের রচনায়ও সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে। মনে রাখিতে হইবে, এই সকল ইংরেজ নৈয়ায়িক আইরিশ গোষ্ঠী-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই সেদেশে মোতায়েন ছিলেন। ক্ল্যান-গত জমিজমা রাজ-সম্পত্তিতে অর্থাৎ খাস মহালে পরিণত করা ছিল তাঁহাদের কাজ।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আয়র্ল্যাণ্ডে জমি ছিল "ক্লানে"র অর্থাৎ গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তি। কোথাও কোথাও সর্দ্দাররা কিছু কিছু জমি নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতেও পরিণত করিয়াছিল। গোষ্ঠীর কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে গোষ্ঠী-সর্দ্দার,—ইংরেজ স্মৃতিকারগণের ল্যাটিন পরিভাষায় "কাপুট্‌ কোগ্‌নাসিওনিস্‌,"—মৃতের সম্পত্তি গোষ্ঠীর হাতে সঁপিয়া দিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও আয়র্ল্যাণ্ডে জমিজমার ভাগাভাগি অনেকটা প্রাচীন জার্ম্মাণদের প্রথাই ঘটিত। আইরিশ পল্লীগত সমবায়,—জার্ম্মাণ "মার্ক্‌,"—"রুন্দাল" নামে পরিচিত ছিল। এই সাবেক যৌথ প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন আজও কিছু কিছু চলিতেছে।

"রুন্দালে"র চাষীরা আজকাল জমিজমায় "নিজস্ব" ভোগ করে এবং খাজানাও দেয় স্বতন্ত্র ভাবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই "নিজস্ব" বা ব্যক্তিগত হিস্যা ঠিক করা হয় কি করিয়া?

জমিগুলা প্রথমে একত্রে রাখিয়া বিচার করা হয় কোন্ কোন্ অংশ উৎকৃষ্ট, কোন্ কোন্ অংশ মধ্যম, কোন্ কোন্ অংশ নিকৃষ্ট ইত্যাদি। উত্তম মধ্যম অনুসারে বিভক্ত অংশ-গুলাকে জার্ম্মাণির মোজেল দরিয়ার লোকেরা "গেহ্বানে" বলে। আয়র্ল্যাণ্ডে এই "গেহ্বানে"গুলা পরিবারসমূহ কর্ত্তৃক একত্রে চষা হয়। ফসল ভাগাভাগি করা হয় পরে। প'ড়ো জমি, মাঠ, ময়দান ইত্যাদি সবই যৌথ রূপে ভোগ করা হইয়া থাকে।

আইরিশ "রুন্দাল" পল্লীর জমি ভাগাভাগির মানচিত্র দেখিলে জার্ম্মাণির "গেহেফার শাফ্‌ট্" বা কিষাণ-সমবায়ের দৃশ্যই চোখে পড়িবে। মোজেল জনপদে এবং হোখ্‌ল্যাণ্ড অঞ্চলে এইরূপ কিষাণ-সমবায় প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এই দস্তুর আয়র্ল্যাণ্ডের ভূমি-প্রতিষ্ঠানে দেখা গিয়াছে।

আইরিশ গোষ্ঠীগুলা আজকাল "ফ্যাকশুন" প্রতিষ্ঠানে কথঞ্চিৎ জীবিত আছে। সাধারণ ইংরেজ স্মৃতি-শাস্ত্রের নজিরে এই প্রতিষ্ঠান বুঝা সম্ভব নয়। পাড়াগেঁয়ে খেলাধূলার সময় আইরিশরা এক প্রকার "জোট" বা দল বাঁধে। এই দল বাঁধাবাঁধির ভিতর সাবেক কালের গোষ্ঠী-ধর্ম্মই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু বাহির হইতে তাহা আন্দাজ করা কঠিন।

কোনো কোনো অঞ্চলে পুরাণো গোষ্ঠীগুলা আজও সাবেক জমিরই উপরই বসবাস করিতেছে। মোনাগান জেলায় নর-নারীদের নাম দেখিতে পাই প্রধানতঃ মাত্র চার প্রকার। সাবেক কালের চার গোষ্ঠী বা "ক্ল্যানে"র বংশধর রূপে এই সকল লোক প্রাচীন সংহিতারই জীবন্ত সাক্ষী বিশেষ।

আয়র্ল্যাণ্ডে পর্য্যটনের কালে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বড় বড় জমিদারেরা এখনও সাবেক কালের গোষ্ঠী-নায়ক বা "ক্ল্যান"-সর্দ্দারের স্বধর্ম্মই রক্ষা করিয়া চলিতেছে। প্রত্যেক চাষীর মঙ্গল তদ্‌বির করা তাহার এক কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। চাষীর নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় না। চাষীব আপদবিপদে সাহায্য করাও তাহার নিত্যকর্ম্মের অঙ্গ।

স্বচ্ছল লোকেরাও আইরিশ পল্লী-জীবনে দরিদ্রদের মা বাপ। এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণও পাওয়া গিয়াছে। পর্য্যটক মাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এইরূপ সাহায্যকে "ভিক্ষাদান" বলা চলে না। গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য,--এই জ্ঞানই সমাজের আবহাওয়ায় ছড়াইয়া আছে।

এই কারণেই আইরিশ-সমাজে বর্ত্তমান-জগৎ-সুলভ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা নিজস্ব বিষয়ক ধারণা বদ্ধমূল করিতে যাইয়া ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার পণ্ডিত রাষ্ট্রিকেরা হয়রাণ ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। দায়িত্বহীন সম্পত্তির অধিকার আইরিশ মজ্জায় বসে না। এই জন্যই ইংল্যণ্ড ও আমেরিকার বড় বড় শহরে যে সকল আইরিশ নরনারী বসবাস করিতেছে তাহারা নব্যনীতিকে দুর্নীতি এবং মানব চরিত্রের কলঙ্ক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ক্রমশঃ তাহারা নিজেই "খেই হারাইয়া" "স্বধর্ম্ম"-ভ্রষ্ট হইয়া নীতিহীন জীবনহীন রূপে চলাফেরা করিতে বাধ্য হইতেছে।

হ্বাণ্টার স্কটের "ক্ল্যান"-সাহিত্য

স্কটিশ জাতির বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে সঙ্গে স্কট্‌ল্যাণ্ডে গোষ্ঠী-প্রথা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের "ক্ল্যান"গুলা গোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম রক্ত-কেন্দ্র। এই সকল "ক্ল্যানে"র বৃত্তান্ত আমরা হ্বাল্টার স্কট নামক প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের রচনায় বহুসংখ্যক পাই।

স্কট-বিবৃত "ক্ল্যান"গুলা সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিৎ মর্গ্যান বলেন:— "গোষ্ঠী-প্রথার এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপই এই সামাজিক জীবন নৃতত্ত্বের আলোচনায় গ্রহণীয়। ব্যক্তির উপর সমষ্টির প্রভাব এই ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রকটিত। * * * "ক্ল্যানে" "ক্ল্যানে" ঝগড়া ও দাঙ্গাহাঙ্গামা, যৌথ চাষবাসের ব্যবস্থা, ক্ল্যান-সর্দ্দারের প্রতি "ক্ল্যানে"র নরনারীর বিশ্বাস ও ভক্তি, এবং নরনারীর ভিতর পরস্পর হৃদ্যতা এই সকল তথ্যে গোষ্ঠী-জীবনের সকল কথাই ফুটিয়া উঠে। * * * পুরুষের ধারায় বংশানুক্রম চলিত। মেয়েদের সন্তানেরা তাহাদের জনকের "ক্ল্যানের" অন্তর্গত বিবেচিত হইত।"

স্কট্‌ল্যাণ্ডে এক সময়ে নারীর আমল প্রচলিত ছিল। তখন "জননী-বিধি" বা মেয়ের সন্তান হিসাবে বংশরক্ষা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হইত। "পিক্‌ট্‌" জাতির রাজবংশে এই নিয়ম দেখিতে পাই। হ্বেল্‌সের মতন স্কট্‌ল্যাণ্ডেও "পুনালুয়া"-প্রথার বিবাহ অর্থাৎ ভাইবোন ছাড়া অন্যান্য নিকট-আত্মীয়দের ভিতর পরস্পর যোনি-সংসর্গের বিধান অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। কেননা মধ্যযুগ পর্য্যন্ত "ক্ল্যানে"র সর্দ্দার প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর প্রথম রাত্রি দাবী করিত। "সেলামি" দিয়া অবশ্য এই দাবী হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াও সম্ভব হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জার্ম্মাণ-সমাজ

জার্ম্মাণদের "জেনেওলোজিয়া" এবং "কুনি"

দেশত্যাগ এবং "বিচরণের" যুগ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরাও যে গোষ্ঠী-কেন্দ্রেই শাসিত হইত এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ড্যানিউব, রাইন ও হ্বিস্‌টুলা নদী এবং উত্তর সাগর এই চতুঃসীমার ভিতরকার জনপদ খৃষ্টজন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের দখলে আসে। সিম্ব্রি এবং টিউটন জাতি তখনও "বিচরণ" করিতেছিল। স্বুয়েবি জাতি সীজারের আমলে প্রথম স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

সীজার স্পষ্টই বলিয়াছেন:—"স্বুয়েবিরা জেন্তিবুস্‌ কোগ নাতিবুস্ক্‌ অর্থাৎ গোষ্ঠী ও জাতি হিসাবে বস্তি বসাইতেছিল।" ল্যাটিনদের জুলিয়া গোষ্ঠীর বংশধর সীজার। কাজেই ইনি যখন "জেন্তিবুস" বা গোষ্ঠী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তখনই বুঝিতেই হইবে যে, ল্যাটিন-সমাজে প্রচলিত সামাজিক প্রথাই জার্ম্মাণ-সমাজেও প্রচলিত ছিল। সকল জার্ম্মাণ জাতি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

রোমাণদের নিকট হইতে জার্ম্মাণরা যে সকল জনপদ দখল করে সেই সকল অঞ্চলেও গোষ্ঠী হিসাবেই বস্তি গাড়া হইতেছিল। ডানিউব দরিয়ার দক্ষিণ জনপদে আলেমানিয়ান সংহিতার কানুন চলিত। সেই কানুনে দেখি যে, "জেনেওলোজিয়া" অর্থাৎ গোষ্ঠী ক্রমে লোকেরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে "মার্ক" বা "ডর্ফ-গেনোস্সেনশাফ্‌ট্‌" অর্থাৎ

পল্লী-সমবায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইত তখনকার দিনে "জেনে-ওলোজিয়া" শব্দে তাহাই বুঝা হইত।

সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিৎ কোহ্বালেহ্বস্কি প্রচার করিয়াছেন যে,—"জেনেওলোজিয়া" বাস্তবিক পক্ষে পল্লী-সমবায়ের আগেকার ধাপ। জমিজমা পরিবার-সমবায়ে বিভক্ত করা হইত। গোষ্ঠ পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হইতে পরে পল্লী-কেন্দ্র গাড়য়া উঠিয়াছিল।"

আলেমানিয়ানরা যে প্রতিষ্ঠানকে "জেনেওলোজিয়া" বালত বার্গাণ্ডিয়ান এবং লাঙ্গোবার্ডদের সমাজে সেই প্রতিষ্ঠানকে "ফারা" বলা হইত। কিন্তু এই কেন্দ্রকে গোষ্ঠী বলা হইবে কি পরিবার-সমবায় বলা হইবে কি পল্লী-সমবায় বলা হইবে বিচার সাপেক্ষ।

প্রাচীন জার্ম্মাণদের ভাষা বা উপভাষাগুলায় গোষ্ঠীবাচক শব্দের ঐক্য দেখিতে পাইনা। গথিক "কুনি" ও মিড্‌ল্‌-হাই-জার্ম্মাণ "ক্যিন্নে" ব্যুৎপত্তি হিসাবে গ্রীক্ "গেনোস" এবং ল্যাটিন "জেন্‌স্" হইতে অভিন্ন। নারী-বাচক শব্দগুলা একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। গ্রীক্ "গিনে," স্লাভ "জেনা" গথিক "ক্বিনো," নর্স "কোনা," বা "কুনা" একই শব্দের রূপান্তর। বোধ হয় এই সকল শব্দ সাবেক কালের জননী-বিধির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

লাঙ্গোবার্ড এবং বার্গাণ্ডিয়ানদের "ফারা" শব্দ ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিমের মতে "ফিজান" ধাতু হইতে উৎপন্ন। "ফিজান" অর্থে জন্ম দেওয়া। কিন্তু বোধ হয় অত দূর না যাইয়া সাধারণ জার্ম্মাণ ধাতু "ফারেণ" (চলাফেরা করা, হাঁটিয়া যাওয়া বা

ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া) হইতে "ফারা"র উৎপত্তি বিশ্বাস করা চলে। তাহা হইলে সেকালে যে সকল লোক একত্রে দল বাঁধিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিত,—অতএব জাতিকুটুম্ব সমরক্তজ নরনারী সকলেই,—"ফারা" নামে অভিহিত হইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে "বিচরণ" করার প্রভাবে "ফারা" শব্দ "গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানে"র যোনি বা রক্ত-কেন্দ্র বুঝাইতে থাকে।

গথিক্ "সিবিয়া" অ্যাংলো-স্যাক্সন "সিব্," ওল্ড্-হাই-জার্ম্মাণ "সিপ্পিয়া" বা "সিপ্পা," হাই-জার্ম্মাণ "সিপ্পে,"—এই শব্দগুলাও এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। ওল্ড্ নর্স্ ভাষায় এই শব্দেরই বহুবচন "সিফ্য়ার" অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ প্রচলিত আছে। একবচনে,—"সিফ"রূপে—এই শব্দে সেই নামের কোনো দেবীকে বুঝায়।

হিল্ডেব্রাণ্ড্-গাথায় একটা শব্দ পাওয়া যায়। হিল্ডেব্রাণ্ড্ হাডুব্রাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিতেছেঃ—"জাতির ("সমাজের") পুরুষগণের মধ্যে তোমার জনক কে? * * * অর্থাৎ তোমার জ্ঞাতি কি?" এইখানে "ক্নুয়োস্লেস্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

গোটা জার্ম্মাণ জাতির ভিতর গোষ্ঠী-বাচক কোনো এক শব্দ ঢুঁড়িতে হইলে হয়ত গথিক "কুনি"ই সেই অন্যান্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলার সঙ্গে "কুনি"র যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু ইংরেজি "কিং," জার্ম্মাণ "ক্যেনিগ্" ইত্যাদি শব্দ "কুনি" হইতেই উৎপন্ন। এই সকল শব্দে গোষ্ঠী বা জাতির সর্দ্দার (রাজা) বুঝাইত।

"সিবয়া", "সিপ্পে" ইত্যাদি শব্দের রেওয়াজ বড় বেশি নয়।

তাহা ছাড়া গুল্ড্ নস্ "সিফ্‌য়ার" বলিলে একমাত্র সমরক্তজ আত্মীয় বুঝাইত এমন নয়। বিবাহের সম্পর্কের কুটুম্বগণও ইহার অন্তর্গত। কাজেই "সিফ" শব্দে সাধারণ হিসাবে দুই গোষ্ঠীর নরনারী বুঝিতে হইবে। গোষ্ঠীর প্রতিশব্দ স্বরূপ "সিফ্" কোনো মতেই চলে না।

মেক্‌সিকান এবং গ্রীক্‌দের মতন জার্ম্মাণরা মাঠে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক সাজাইবার সময় গোষ্ঠী-কেন্দ্র হিসাবে দল গঠন করিত। ল্যাটিন ঐতিহাসিক তাসিতুস্ এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"পরিবার এবং আত্মীয় হিসাবে জার্ম্মাণরা ফৌজ আনিতে অভ্যস্ত ছিল।" তাসিতুসের আমলে রোমাণ-সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার বৃত্তান্তে "পরিবার এবং আত্মীয়" ইত্যাদি বিশেষত্ব বর্জ্জিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মামা-ভাগ্‌নে

তাসিতুসের আর একটা কথা বিশেষ কাজের। ইনি বলিয়াছেন :—"জননীর ভাই তাহার তাহার ভাগ্‌নেকে নিজ সন্তান বিবেচনা করে। অনেকের বিবেচনায় মামা-ভাগ্‌নের সম্বন্ধ বাপ-বেটার সম্বন্ধের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তিকে জামিন হইতে হইলে ভাগ্‌নের ডাক পড়ে আগে। লোকেরা ছেলেকে জামিন ভাবে না লইয়া ভাগ্‌নেকেই জামিন লইতে লালায়িত।

এইখানে জননী-বিধি-নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ স্বাভাবিক গোষ্ঠী-

প্রথাই দেখিতেছি। এই প্রথাই ল্যাটিন ঐতিহাসিকের মতে জার্ম্মাণ-সমাজের বিশেষ লক্ষণ ছিল।

এই ধরণের জামিনের ফলে যদি ছেলের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার ঘটে তাহা হইলে ইহাতে মাত্র তাহার জনকের পক্ষে একটা ব্যক্তিগত অনিষ্ট সাধিত হইল এইরূপ বিবেচিত হইত। কিন্তু যদি ভাগ্‌নের গায়ে হাত পড়ে তাহা হইলে গোটা গোষ্ঠী-ধর্ম্মে ঘা লাগিত। এই ধরণে ভাগ্‌নের মৃত্যু ঘটিলে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে নিকট-আত্মীয় দায়ী তাহাকে লইয়া টানাটানি পড়িত। হয় তাহার পক্ষে এই ভাগ্‌নেকে জামিন স্বরূপ যাইতে দেওয়া উচিত হয় নাই, না হয় জামিনের কড়ার যাহাতে রক্ষা পায় সেই অনুসারে সে কাজ করিতে বাধ্য ছিল। জার্ম্মাণ-সমাজে গোষ্ঠী-প্রথা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইলেও একমাত্র এই বিধানই তাহার স্থান পূরণ করিতে সমর্থ।

মামা-ভাগ্‌নের সম্বন্ধ বিষয়ে গ্রীক্ দেবদেবীর-তত্ত্বে অনেক পরিচয় পাই। আল্‌থায়া নাম্নী নারীর ভাইয়ের ছেলেদিগকে তাহার নিজ ছেলে হত্যা করে। নারীর চিন্তায় তাহার সন্তানের কাজ অতি গর্হিত। সে শাপ দিল যেন হত্যাকারীর মৃত্যু হয়। দেবতাদের অনুগ্রহে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিলও এবং তাহাতে জননী সুখী হইয়াছিল।

ফিলেউস্ তাহার দ্বিতীয় পত্নীকে সুখী করিবার জন্য প্রথম পত্নীর সন্তানদিগকে বেইজ্জৎ করে। প্রথম পত্নীর ভাইয়েরা ভাগ্‌নেদের উদ্ধারে লাগিয়া যায়। এবং ফিনেউসের বরকন্দাজ-দিগকে খুন করিয়া সন্তুষ্ট হয়।

"দেবতাদের উষা" এবং "দুনিয়ার খতম" এইভাব প্রকাশের অনুরূপ একটা স্বপ্ন-গাথা ওল্ড্ নর্স্ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। তাহার নাম "ফ্যেলুস্পা," এইটা তাসিতুসের ৮০০ বৎসর পরের রচনা। গানটা এক নারী-ঋষির বা যোগিণীর "ঋক্" রূপেই বিবৃত হয়। বাঙ্ এবং বুগ্গে নামক পণ্ডিতেরা সম্প্রতি এই "ঋকে" খৃষ্টীয় প্রভাব দেখিয়াছেন। জগতের মহাপ্রলয় ঘটিবার সম সম কালে "ধর্ম্মস্য গ্লানি" এবং "অভ্যুত্থানম্ ধর্ম্মস্য" নাকি চরম মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। সেই সকল কথা এই গাথার "মুদ্দা"।

একটা পংক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"ব্র্যেড্‌র মুন্থ বেরয়াস্ক্ ওক্ আট্ বেন্ন্‌ম ফের্ডাস্ক মুনুসিস্‌ত্রুঙ্গার সিফ্‌যুম স্পিল্লা।"

অর্থাৎ "ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করিয়া মরিবে এবং পরস্পর পরস্পরকে খুন করিয়া ছাড়িবে আর বোনের সন্তানসন্ততির রক্তের বন্ধন ভাঙিয়া ফেলিবে।"

"সিস্‌ত্রুঙ্গার" শব্দের অর্থ "মায়ের বোনের ছেলে" অর্থাৎ মাসতুত ভাই। কবির বিচারে ভাইয়ে ভাইয়ে খুনাখুনির চেয়ে মাসতুত ভাইয়ের পক্ষে রক্তের টান ছিঁড়িয়া ফেলা বেশি মাত্রার দোষের বা নিন্দার কথা।

এই গাথায় "সিস্‌ত্রুঙ্গার" শব্দের ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কবি এই শব্দের দ্বারা ঘোরতর পাতকের আবির্ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "মায়ের বোনের" ছেলে এইরূপ পাপ কর্ম্ম করিতেছে—এই দৃশ্য গাথায় অতি ভয়ঙ্কর বিবেচিত হইয়াছে। এই শব্দের ঠাঁইয়ে যদি "সিস্‌কিনা-ব্যের্ণ্" (অর্থাৎ ভাই-বোনের ছেলেলে) কিম্বা „পুসিস্‌কিনা-সিনির"

(অর্থাৎ ভাই বোনের পুত্র) ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে কবির বক্তব্যে জোর কিছু কমিয়া যাইত। এই কারণে মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধওয়ালা শব্দের দ্বারা আত্মীয়দের খুনাখুনি বিবৃত হইয়াছে। মোটের উপর বুঝিতে হইবে যে, "হ্বিকিঙ"দের যুগে জননী-বিধির স্মৃতি বেশ জাগ্রতই ছিল।

তাসিতুস্ যে সকল জার্ম্মাণদের সঙ্গে সুপরিচিত তাহাদের সমাজে জননী-বিধির ঠাঁইয়ে পুরুষ-বিধি দেখা দিয়াছিল। বাপের পর ছেলেপুলেরা উত্তরাধিকারী। ছেলেপুলে না থাকিলে ভাই এবং খুড়া জ্যাঠারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগ করিত। কিন্তু তাহাদের ভিতরও দেখা যায় যে, মায়ের ভাই উত্তরাধিকার হইতে একদম বঞ্চিত নয়। বুঝিতে হইবে যে, জননী-বিধি অল্পকাল হইল মাত্র উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রভাব পূরাপূরি লুপ্ত হয় নাই।

জার্ম্মাণ-সমাজে "জননী-বিধি"

মধ্যযুগের বহুদিন পর্য্যন্ত জননী-বিধির প্রভাব দেখিতে পাই। জনক সম্বন্ধে সন্দেহ করা সে যুগের জার্ম্মাণ জাতির মজ্জা হইতে উঠিয়া যায় নাই। বিশেষ করিয়া "সাফ্ˊ" ভূমি গোলাম বা দাস-কিষাণ সমাজে এইরূপ সন্দেহ বেশ প্রবল ছিল। মাওরার প্রণীত "ষ্টেট্রে ফার্কাসুঙ্" (অর্থাৎ নগর-শাসন প্রণালী) গ্রন্থে আউগ্সবুর্গ্, বাজেন এবং কাইজার লাউটার্ণ শহ্রের দস্তুর বিবৃত আছে।

কোনো "সাফ্ˊ" বা দাস-কিষাণ তাহার মনিব জমিদারের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শহরে পলাইয়া গেলে

জমিদার তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে অধিকারী ছিল। কিন্তু শহরের শাসনকর্ত্তারা এই কিষাণকে চিনিয়া লইবার জন্য জমিদারকে কতকগুলা নিয়ম মানিতে বাধ্য করিত। প্রধান কথা এই যে, কিষাণের ছয় জন নিকট আত্মীয়কে শপথ করিয়া বলিতে হইত যে, এই ব্যক্তি বাস্তবিকই জমিদারবাবুর গোলাম। এই নিকট আত্মীয় কাহারা? সেকালের নগর-নীতি অনুসারে ইহারা সকলেই পলাতক কিষাণের মায়ের তরফের লোক। বাপের দিককার আত্মীয়দের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত না।

জননী-বিধির আর একটা সাক্ষ্য জার্ম্মাণী সমাজে অতিমাত্রায়-নারী-ভক্তি। রোমাণরা জার্ম্মাণদের এই স্বভাব একদম বুঝিয়া উঠিতেই পারিত না। জার্ম্মাণদের সঙ্গে কোনো প্রকার চুক্তি করিলে রোমাণরা সেই চুক্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় জামিন পাইত "ভদ্র" বা "বড়" ঘরের জার্ম্মাণ মহিলাদিগকে। মেয়েরা শক্রর হাতে ধরা পড়িবে অথবা দুস্‌মনের বাঁদীগিরি করিতে বাধ্য হইবে এই ভয় ও লজ্জাই জার্ম্মাণ পুরুষদের হৃদয়ে লড়াইয়ের সময় সাহস জাগাইয়া তুলিত। নারীর বাণী ছিল তাহাদের চিন্তায় একপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ বা নীতির ডাক বিশেষ। গুরুতর কাজের সময় মেয়েদের কথা শুনা জার্ম্মাণদের স্বধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত।

গল (সেকালের ফ্রান্স) দেশে রোমাণ শাসন ধ্বংস করিবার আন্দোলনে জার্ম্মাণ এবং বেলজিয়াম জাতি মাথা তুলিয়াছিল। সিহ্বিলিস ছিল সেই বিদ্রোহের নায়ক। কিন্তু বিদ্রোহীরা সকলেই এক নারীর নিকট দীক্ষা পায়। লিপ্পে দরিয়ার উপর-কার এক পল্লী-মন্দিরে নারী ছিল পুরোহিতা—নাম ফেলেদা।

ঘরকন্নায় জার্ম্মাণ নারী ছিল রাণী বিশেষ। তাসিতুসের

বিবরণে জানা যায় যে, পুরুষেরা হয় শিকার করিয়া ফিরিত অথবা বাহিরে বাহিরে আড্ডা মারিয়া টো টো করিয়া বেড়াইত। কিন্তু মেয়েরা থাকিত ঘরের কাজে ব্যস্ত। বুড়া পুরুষ এবং ছেলেপুলেরা মেয়েদের কাজে সাহায্য করিত।

তাসিতুসের "জার্ম্মাণিয়া"

জমি চষিত কাহারা একথা তাসিতুসের গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া জানা যায় না। দাসেরা "টাইদ" নামক কর দিত কিন্তু তাহাদের দ্বারা জোর জবরদস্তি করিয়া কাজ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই অনুমাণ করা চলে, পুরুষেরা যে, একদম আড্ডা মারিয়াই সময় কাটাইত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। চাষআবাদের কাজ সামলানো ছিল তাহাদেরই কাজ।

"জোড়-পরিবার" প্রথায় বিবাহ চলিত। এক-পত্নী (পতি)ত্ব তখনও পরিষ্কাররূপে দেখা দেয় নাই। পয়সাওয়ালারা বহু-পত্নীত্ব চালাইত। কুমারীদের সতীত্ব রক্ষা করার দিকে জার্ম্মাণ-সমাজে নজর ছিল তীক্ষ্ণ। এই হিসাবে কেণ্টিক নীতি ছিল উণ্টা। তাসিতুস্ জার্ম্মাণ-সমাজে বিবাহিত জীবনের ভক্তিযোগ সম্বন্ধে খুব তারিফ করিয়াছেন।

পর-পুরুষ-গমন সম্বন্ধে তাসিতুস্ মাত্র এই বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে স্ত্রী-বর্জ্জন ঘটিত। কিন্তু এই সকল বিষয়ে তাসিতুসের বৃত্তান্তে অনেক ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। আসল কথা, তাসিতুস্ এখানে তখনকার দিনের উচ্ছৃঙ্খল রোমাণ নরনারী মহলে নীতিশিক্ষা বা হিতোপদেশ প্রচার করিয়াছেন এইরূপই বুঝিতে

হইবে। জার্ম্মাণ জাতিকে সংযত-যোনি রূপে বিবৃত করা তাঁহার পক্ষে "ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো" বিশেষ।

যদি একথা সত্যই হয় যে, জার্ম্মাণরা "বনবাসের যুগে" অর্থাৎ "বিচরণে"র কালে নানা সদ্‌গুণের অবতার বিশেষ ছিল, আসল কথা এই যে, যেই তাহারা দুনিয়ার সংস্পর্শে আসিল তৎক্ষণাৎ তাহাদের সতীত্ব, দাম্পত্যধর্ম্ম, যোনি-সংযম ইত্যাদি সবই উড়িয়া গেল। অন্যান্য ইয়োরোপীয়েরা এই সকল বিষয়ে যেরূপ জীব সেইরূপ জীবে পরিণত হইতে জার্ম্মাণদিগকে বেশি সময় দিতে হয় নাই।

রোমাণ "সভ্যতার" আওতায় পড়িয়া জার্ম্মাণরা নিজ নিজ ভাষাগুলা হারাইয়া বসিয়াছে। একথা সকলেই জানে। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই তথাকথিত সংযম ইত্যাদির সদ্‌গুণগুলা হারাইয়াছে আরও শীঘ্র, এই তথ্যটাও জানিয়া রাখা দরকার। তুর শহ্‌রের গ্রেগ্রোরিয়ুসের রচনা এই নৈতিক অধোগতির সাক্ষী।

আদিম বনজঙ্গলের প্রাকৃতিক জীবনে জার্ম্মাণরা সভ্যভব্য নাগরিক রোমাণদের চেয়ে বেশি সংযত এবং ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ছিল এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন নয়। কিন্তু তাসিতুস্‌ যে জার্ম্মাণ জাতিকে নরনারীর যোনিসংশ্রব বিষয়ে নেহাৎ আদর্শস্থানীয়রূপে বর্ণনা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তিই তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারে না।

গোষ্ঠী-প্রথার এক স্বধর্ম্মই এই যে,—প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বাপদাদাদের শত্রুগুলাকে নিজের শত্রু বিবেচনা করিতে বাধ্য। অধিকন্তু সাবেক কালে ছিল "খুনের বদলে খুন" নীতি প্রচলিত।

এই নীতি ভাঙিয়া "হ্বের্-গেল্ড" বা অর্থ-দণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। হত্যা বা অন্য কোনো শারীরিক নির্য্যাতনের সাজা স্বরূপ দোষী ব্যক্তিকে টাকা দিতে বাধ্য করা হইত। জার্ম্মাণ-সমাজে এই ছিল দস্তুর।

বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও পণ্ডিতেরা "হ্বের-গেল্ড"কে খাঁটি স্বদেশী জার্ম্মাণ বিশেষত্ব বিবেচনা করিতেন। নৃতত্ত্বের অনুসন্ধানকারীরা আজকাল জানেন যে, এই প্রতিষ্ঠান জার্ম্মাণদের একচেটিয়া মাল নয়। জগতের অসংখ্য সমাজে এই প্রথা দেখা গিয়াছে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতিরাও "অর্থদণ্ড" নীতি কায়েম করিয়াছিল।

অতিথি-সৎকারের রেওয়াজও জার্ম্মাণ জাতির নিজস্ব কিছু নয়। ইণ্ডিয়ানরা এই বিষয়ে জার্ম্মাণদেরই "মাসতুত ভাই"। তাসিতুসের "জার্ম্মাণিয়া" গ্রন্থে এই বিষয়ে যে সকল বিবরণ আছে সেগুলা মর্গ্যানের ইরোকোআ-সমাজ সম্বন্ধে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

পরিবার ? না "পল্লী" ?

জার্ম্মাণ-সমাজে জমি ভাগাভাগি এবং চষা হইত কি প্রণালীতে এই সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে লাঠালাঠি চলিতেছিল। সে সব তর্ক আজকাল এক প্রকার চুকিয়া গিয়াছে। এখন সকলেই স্বীকার করে যে,—দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন সমাজেই প্রথম প্রথম গোটা গোষ্ঠী সমবেত ভাবে ভূমি চষিত। পরে পরিবারেরা যৌথভাবে চাষআবাদ সুরু করে। এইরূপ পারিবারিক যৌথ চাষ সীজারের আমলে সুয়েবি নামক জার্ম্মাণ

সমাজে দেখা গিয়াছে। কাজেই কয়েক বৎসর পরপর সেযুগে জমিগুলার ভাগবাটোআরা করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে পুনঃপুনঃ জমি ভাগাভাগির রীতি প্রচলিত ছিল।

সীজার খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর ল্যাটিন সেনাপতি। আর তাসিতুস্ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক। দু'য়ে তফাৎ প্রায় দু'শ' বৎসর, সীজার দেখিয়াছিলেন স্যুয়েবিরা "পারিবারিক সমবায়" হিসাবে জমি চষিতেছে। তাসিতুসের সময়ে জার্ম্মাণরা ব্যক্তিগতভাবে "নিজ নিজ" জমি চষিতেছিল। সেই সময় প্রতি বৎসর জমি ভাগাভাগি করা হইত। অর্থাৎ পুরাপুরি নিজস্ব সম্পত্তির প্রথা দু'শ' বৎসরের ভিতর গজিয়া উঠে নাই। তখনও প্রচুর জমি যৌথ ব্যবহারের জন্য পড়িয়া থাকিত।

এখন একটা নতুন প্রশ্ন উঠিয়াছে। কোহ্বালেহ্বস্কি বলেনঃ—"মান্ধাতার আমলের জননী-বিধি-নিয়ন্ত্রিত যৌথ সম্পত্তিশীল সমাজ আর বর্ত্তমান যুগের পরস্পর-স্বাধীন-পারিবারিক-কেন্দ্র এই দু'য়ের মধ্যে দুনিয়ার প্রায় সর্ব্বত্রই আর এক প্রকার সামাজিক জীবন দেখা যায়। সে পুরুষ-বিধি-নিয়ন্ত্রিত যৌথসম্পত্তিশীল পারিবারিক সমবায়।"

এতদিন মাওরার এবং হ্বাইট্‌স্ এই দুই পণ্ডিতের ভিতর ঝগড়া চলিতেছিল। প্রশ্নটা এই ঃ—"সেকালে ধনদৌলত যৌথ ছিল না ব্যক্তিগত ছিল?" কোহ্বালেহ্বস্কির গবেষণার ফলে আজকাল প্রশ্নটা এত সরল নয়। সমস্যা এখন নিম্নরূপ ঃ—"ধনদৌলতের যৌথ রূপটাই কোন্ নিয়মে চলিত?"

সীজারের আমলে স্যুয়েবিরা জমির অধিকারী ছিল যৌথ

ভাবে, জমি চষিতও যৌথ ভাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যৌথ-কেন্দ্রটা কি? গোষ্ঠী, না পরিবার-সমবায়, না এই দু'য়ের মাঝামাঝি একটা অন্য কোনো প্রকার সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমাজ-কেন্দ্র? এই তিন কেন্দ্রই বা কি সেকালে একসঙ্গে জার্মাণির বিভিন্ন জনপদে প্রচলিত ছিল?

কোহ্বালেহ্বস্কি বলেন:—"তাসিতুসের সাক্ষ্য অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, তখনও পল্লী-সমবায় বা মার্ক গড়িয়া উঠে নাই। তখন পারিবারিক সমবায়ই আর্থিক জীবনের প্রতিষ্ঠান ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই প্রতিষ্ঠান হইতে পল্লী-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে।"

কাজেই দেখিতেছি যে,—রোমাণ আমলের জার্ম্মাণরা "পল্লী" নামক প্রতিষ্ঠান চিনিত না। তাহাদের জীবন-কেন্দ্র ছিল সমবায়-নিয়ন্ত্রিত পরিবার-সঙ্ঘ। এই পারিবারিক সমষ্টিগুলা পুরুষানুক্রমে যৌথ ভাবে চাষের জমি ভোগ করিত। অপরাপর জমিগুলার ভোগ সম্বন্ধে তাহাদের প্রতিবেশীদেরও অধিকার থাকিত।

এই যদি ঠিক হয় তাহা হইলে তাসিতুসের বৃত্তান্তে জমি ভাগাভাগি সম্বন্ধে কি বুঝিতে হইবে? বুঝা যায় এই যে, পারিবারিক সমষ্টিগুলা প্রতি বৎসরই একটা করিয়া নতুন জমির টুক্‌রা চষিত। পূর্ব্ববৎসরের চষা জমি পরবর্ত্তী বৎসর ফেলিয়া রাখা হইত। অর্থাৎ দেখিতেছি যে, তাসিতুস-বিবৃত বিধান স্বত্ব বা ভোগের অধিকার সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে না। ইহাতে চাষআবাদের একটা দস্তুর বিবৃত হইয়াছে মাত্র। ইহা কৃষিবিদ্যার কথা,—স্বত্ব নীতির কথা নয়।

তখনকার দিনে লোক সংখ্যা বেশি ছিল না কাজেই প'ড়ো

জমি অনধিকৃত থাকিত অনেক। সুতরাং জমিজমা লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি বাধিতও কম। পরে যখন পরিবার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌথ চাষ অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে তখন পারিবারিক সমষ্টিগুলা ভাঙিয়া যায়। এই অবস্থা ঘটিতে অবশ্য অনেক শতাব্দী লাগিয়াছে।

পারিবারিক সমবায়গুলার ঠাঁইয়ে উৎপন্ন হয় স্ব স্ব প্রধান পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পরিবার। সাবেক কালের যৌথ ময়দান্, পশুচারণের মাঠ ইত্যাদি ভূমি এই সকল পরিবারের নিজস্বে পরিণত হয়। চাষআবাদের জমিগুলা প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর পরপর ভাগাভাগি করা হইত। অবশেষে এই সকল জমিও পরিবারের স্থায়ী স্থাবর সম্পত্তি দাঁড়াইয়া যায়।

জার্ম্মাণদের সমাজে জমিজমার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে সকল কথা ঠারেঠোরে বলা হইতেছে সে সব কথা রুশিয়া সম্বন্ধে নিরেট ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে সপ্রমাণ করা সম্ভব। কোহ্বা-লেহ্বস্‌কি-বিবৃত এই ব্যাখ্যা-প্রণালী অবলম্বন করিলে জার্ম্মাণির নরনারীর এবং জার্ম্মাণ জাতীয় অন্যান্য সমাজের আর্থিক সংঘটনগুলা ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে যতটা মিলে তাসিতুস্-বিবৃত পল্লী-সমবায় স্বীকার করিয়া লইলে ততটা মিলে না।

প্রাচীনতম জার্ম্মাণ স্মৃতিশাস্ত্রের ভিতর "কোদেক্‌স্ লাওরেশা-মেন্‌সিস্" অন্যতম। এই স্মৃতির বিধান পারিবারিক সমবায়ের সঙ্গেই খাপ খায়। পল্লী-সমবায়ের সমাজ এই স্মৃতির বিধিনিষেধের সঙ্গে মিলে না। তবে গোষ্ঠী আর পল্লীব মাঝামাঝি এই পারিবারিক যৌথ-কেন্দ্র জার্ম্মাণ জীবনের ক্রমবিকাশে সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতে হইবে এইরূপ মত প্রচার করা অতি সাহসের কাজ।

জার্ম্মাণদের কৃষিশিল্পে বাণিজ্য

সীজারের সময়ও জার্ম্মাণরা 'ভবঘুরের দল'। তখন তাহারা ঘর পায় পায় অবস্থায় আসিয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহাদের "বিচরণের যুগ" চলিয়া গিয়াছিল। কোনো কোনো সমাজ স্থির-প্রতিষ্ঠ-"গৃহস্থ"ও হইতে পারিয়াছে। কিন্তু তাসিতুসের আমলে জার্ম্মাণরা সর্ব্বত্রই প্রায় এক শ' বৎসর ধরিয়া পাকাপাকি "গৃহস্থ"। তখন ইহারা বাস্তুভিটার মালিক। দরকার তখন তাহাদের অনেক বাড়িয়াছে। কাজেই দরকার অনুযায়ী মাল তৈয়ারি করিবার পথেও তাহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

তাসিতুসের আমলের জার্ম্মাণরা লম্বা লম্বা ব্যারাক-সদৃশ ভবনে বাস করিত। পোষাক ছিল তাহাদের বনজঙ্গলের মাফিকই আদিম। পশমের ঢাক্‌না এবং জানোআরের খোল ছিল মামুলি বসন। নারী এবং ধনীদের রেওয়াজ ছিল লিনেন বা মিহিসূতার (ফ্লাক্‌স্) জামায় অঙ্গ আবৃত করা। দুধ, মাংস, বন্যফল ইত্যাদি ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য।

প্লিনি বলেন:—"ওট্‌শস্যের খিচুড়ি জার্ম্মাণদের সমাজে খাদ্যতালিকায় বড ঠাঁই পাইত।" আজও আয়র্ল্যাণ্ডের এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের কেল্টিক সমাজে "ওট্‌মিল পরিজ্" প্রিয়খাদ্য।

পশু-সম্পদই ছিল জার্ম্মাণদের বড় সম্পত্তি। কিন্তু জানোআর-গুলা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। গাভীগুলা দেখিতে বিশ্রী। তাহাদের শিঙ্ ছিল না। ঘোড়াগুলা বেঁটে এবং জোরের সহিত দৌড়িতে পারিত না। মুদ্রা ব্যবহৃত হইত নেহাৎ কম।

তাহাও রোমাণ টাকা। সোনা রূপার গহনা তাহারা আদরও করিত না, তৈয়ারিও করিত না। লোহা ছিল বিরল। রাইন এবং ডানিউব দরিয়ার অঞ্চলে যে সকল লোহার জিনিষ ব্যবহৃত হইত সেইগুলা সবই আমদানি করা মাল। লোহার খনিতে কাজ করা জার্ম্মাণরা জানিত না।

গ্রীক্ এবং ল্যাটিন হরফের নকলে এক প্রকার লিপি জার্ম্মাণ সমাজে চলিত। তাহার নাম "রুণেন"। কিন্তু ভাষার অক্ষর হিসাবে এইগুলার ব্যবহার হইত না। সঙ্কেত চিহ্ন মাত্র রূপে এইগুলার চল ছিল। এই চলও আবার একমাত্র ধর্ম্মকর্ম্মের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিত।

নরবলি তখনও জার্ম্মাণ-সমাজে চলিতেছিল। এক কথায় "বার্ব্বার" যুগের "মধ্যস্তর" হইতে "উচ্চতর" উঠ' উঠ' এই অবস্থায় তাসিতুস্ জার্ম্মাণদিগকে দেখিয়াছেন। যে সকল জাতি রোমাণদের সংস্পর্শে বেশি আসিত তাহারা রোমাণ মাল কিনিত: কাজেই ধাতুজ পদার্থ অথবা বয়ন-শিল্প এই সকল সমাজে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু উত্তর পূর্ব্বে,—বাল্টিক অঞ্চলে জার্ম্মাণরা স্বাধীনভাবে এই সকল শিল্প গড়িয়া তুলিতেছিল।

শ্লেজ্ হ্বিক প্রদেশে প্রাচীন জার্ম্মাণদের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলার ভিতর একটা লম্বা লোহার তলোআর, একটা লোহার পোষাক, একটা রূপার শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া জার্ম্মাণরা পশ্চিম এবং দক্ষিণ ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়িবার পর এই সকল দেশে জার্ম্মাণ ধাতুজ দ্রব্যও চলিতে থাকে। এই সকল ধাতুর কাজে জার্ম্মাণদের রুশি

যে রোমাণ শিল্প হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এমন কি কোনো কোনো বিষয়ে ধাতুশিল্প জার্ম্মাণদের হাতের সাফাইয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যে যে ক্ষেত্রে জার্ম্মাণ মিস্ত্রীরা রোমাণ ছাঁচের নকলে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিত সেই সকল ক্ষেত্রেও জার্ম্মাণরা রোমাণদের চেয়ে ভাল মালই গড়িত এইরূপ বিশ্বাস করা চলে।

তখনকার দিনে ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি ইয়োরোপের সকল দেশই রোমাণ সাম্রাজ্যের এবং সভ্যতার অধীনে ছিল। জার্ম্মাণরা এই আওতায় প্রবেশ করিবামাত্র তাহাদের স্বদেশী ধাতুশিল্প প্রায় সর্ব্বত্রই নষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র ইংল্যাণ্ডে জার্ম্মাণ জাতীয় শিল্প বজায় থাকে। তবে পেতলের গহনার টুক্‌রা বার্গাণ্ডি, রুমেণিয়া এবং দক্ষিণ রুশিয়ার আজহব-সাগর জনপদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বহুদূরস্থিত অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলা দেখিলেই মনে হইবে যেন ইংল্যাণ্ড এবং সুইডেন ইত্যাদি দেশের স্যাক্‌রারাই এই সব প্রস্তুত করিয়াছে। অর্থাৎ এইগুলা জার্ম্মাণ শিল্পীদেরই হাতের কাজ।

সার্ব্বজনিক সভা

"বার্ব্বার" যুগের "উচ্চতর" স্তরের অনুরূপই ছিল জার্ম্মাণদের সমাজ-শাসন-প্রণালী। তাসিতুসের বৃত্তান্তে জানিতে পাই যে, জার্ম্মাণ-সমাজে দুইটা সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রথমটা "প্রিন্‌সিপে" অর্থাৎ সর্দ্দারদের পরিষৎ। দ্বিতীয়টা সার্ব্বজনিক সভা। সর্দ্দার-পরিষৎ ছোটখাটো বিষয়ে আলোচনা করিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে অধিকারী ছিল। বড় বড় বিষয়ে

তাহার অধিকার ছিল মাত্র সমালোচনা করা এবং সার্ব্বজনিক সভার নিকট সেগুলা পেশ করা।

এই সার্ব্বজনিক সভাটা কিরূপ? "বার্ব্বার" যুগের "নিম্নতম" স্তরের সাক্ষ্যস্বরূপ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজে দেখা গিয়াছে যে, সার্ব্বজনিক সভায় হাজির থাকিত "গোষ্ঠী"র লোক। "ট্রাইব" "(জাতি)" অথবা লীগ জাতি-সঙ্ঘ এই সভার ধার ধারিত না। জার্ম্মাণ-সমাজেও এইরূপ বিশ্বাস করা চলে।

জার্ম্মাণ-সমাজে সর্দ্দার ছিল দুই প্রকার। শান্তির কাজের সর্দ্দারের নাম "প্রিন্সিপে"। লড়ায়ের সর্দ্দারকে তাসিতুস্ বলিয়াছেন "ডুসে"। ইরোকোআ-সমাজেও এই দ্বিবিধ নায়কের কথা অবগত হওয়া যায়।

শান্তির সর্দ্দারেরা পশু, শস্য ইত্যাদি বস্তু গোষ্ঠীর নিকট হইতে "সিধা" পাইত। এই সিধার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। ইরোকোআদের মতন জার্ম্মাণ-সমাজেও কোনো এক পরিবার হইতে এই সকল নায়ক বাছাই করা হইত। "পুরুষ-বিধি" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাছাই প্রথা উঠিয়া যায়। তখন জন্মের অধিকারে বংশগত সর্দ্দার দেখা দেয়। গ্রীস্ এবং রোমের সমাজেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে জার্ম্মাণ গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এক একটা করিয়া কুলীন, অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত বংশ গড়িয়া উঠে। বিচরণের ফলে এবং পরে এই সকল বংশ অনেকটা খর্ব্ব হইতে বাধ্য হয়।

"ডুসে" বা রণ-নায়কেরা একমাত্র গুণ অনুসারে নির্ব্বাচিত হইত। তাহাদের ক্ষমতা এমন কিছু বেশি ছিল না। তাসিতুস্

"লাণ্ড্স্‌ক্নেখ্‌ট্" বা "ভাড়াটিয়া ফৌজ" জার্ম্মাণ-সমাজের এক কলঙ্কময় প্রতিষ্ঠান। এই সকল বেতনভোগী আদর্শহীন লড়াই-ব্যবসায়ী বরকন্দাজ বা পল্টনের আবির্ভাব সেই প্রাচীন রণ-সর্দ্দারদের সামরিক দলবলের ভিতরই লক্ষ্য করিতে হইবে। রোমাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জার্ম্মাণদের হাতে আসিবার পর এই সব রাজ-পেটোয়া গুণ্ডারাই অভিজাত বংশের অর্দ্ধেক অংশ গড়িয়া তোলে। রোমাণ দরবারের মোসাহেবরাও এই ধরণের আভিজাত্যে দল পুরু করিয়াছে।

মোটের উপর দেখা গেল যে, জার্ম্মাণ জাতিগুলার শাসন প্রণালী গ্রীক্‌দের "বীর যুগ" এবং রোমাণদের তথাকথিত "রাজ যুগ" এই দুই স্তরের অনুরূপ। সার্ব্বজনিক-সভা, সর্দ্দার-পরিষৎ এবং লড়াই-নায়ক বা রাজা,—এই তিন অঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ছিল। গোষ্ঠী-প্রথায় ইহাই শাসন-পদ্ধতির চরম বিকাশ। "বার্ব্বার" যুগের "উচ্চতম" স্তরে এই পদ্ধতি ছাড়াইয়া উঠা কোনো সমাজেই সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু যেই মানব-সমাজ এই শাসন-কাঠাম ছাড়াইয়া উঠিবার দরকার বোধ করিতেছিল তখনই গোষ্ঠী-নীতির আয়ু ফুরাইয়া আসিতেছিল। সমাজ এক নবযুগোপযোগী নবীন স্বধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছিল। সেই স্বধর্ম্ম "রাষ্ট্র"-নীতির কথা।

শ্রেণীর লোককে সমাজে বড় করিয়া তুলিতেছিল। মামুলি স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধানে স্বাধীনতা-পাওয়া-গোলামেরা গোষ্ঠীর একজন রূপে গৃহীত হইত না কাজেই সমাজে ইহাদের ঠাঁই ছিল নেহাৎ নগণ্য। কিন্তু রাজারা ইহাদিগকে ধন, খেতাব ইত্যাদি দিয়া সমাজে মাথা তুলিবার সুযোগ দিয়াছিল।

রোমাণ সাম্রাজ্য ভাঙিবার জন্য যে সকল জার্ম্মাণ রণ-নায়ক দায়ী তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে "রাজা" হইয়া বসে। ইহাদের প্রিয়পাত্র যে সকল গোলাম বা স্বাধীনতা-পাওয়া-গোলাম তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশের জনক হয়। ফ্রাঙ্ক-সমাজে এই ধরণের গোলামেরাই প্রথমে রাজ-দরবারে, পরে রাষ্ট্রে মস্ত মস্ত লোক হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী, সম্ভ্রান্ত বা কুলীন বংশের অনেকগুলার পূর্ব্ব-পুরুষই এই সব গোলাম।

রাজপদ গড়িয়া উঠিবার ব্যবস্থায় প্রধান সাহায্য আসে সামরিক দলবলের গঠন হইতে। আমেরিকার "রেড্‌স্কিন" ইণ্ডিয়ান্‌-সমাজে গোষ্ঠী-কেন্দ্রের ভিতর ভিতর স্বাধীন ভাবে লড়াইয়ের কেন্দ্র বা পল্টনের দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল দলই জার্ম্মাণ-সমাজে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

"লড়াই-সর্দ্দার" ও "ক্ষত্রিয়-শ্রেণী"

রণ-নায়ক নামজাদা হইবামাত্র এই ধরণের বহুসংখ্যক পালোআন-শ্রেণীর যুবাকে নিজ পেটোআর অন্তর্গত করিয়া লইত। নায়কে আর যুবায় পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধরূপে ভক্তি-শ্রদ্ধার বিনিময় হইত। রণপ্রিয় যুবাদিগের ভরণপোষণের ভার

থাকিত নায়কের হাতে। তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে সঙ্ঘবদ্ধ করাও ছিল তাহার রণ-নীতির অন্তর্গত। একদল হইত তাহার ব্যক্তিগত শরীর-রক্ষী। দ্বিতীয় দলকে তৈয়ারি করা হইত ছোট খাটো অভিযান এবং লুটপাটের জন্য। বড় বড় কাণ্ডকারখানার জন্য উচ্চপদের সেনা-নায়কের দল তৈয়ারি করিয়া রাখিবার দিকেও তাহার দৃষ্টি থাকিত।

এই সকল পালোআন লুটপাট প্রিয় পোটোআর দল সমাজে বড় বেশি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ ইতালীতে ওডোআকারের আমলে এই ধরণের সামরিক দলবল বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল না। কিন্তু গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের স্বধর্ম্ম ইহাদের ছায়ায় মলিন হইতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোষ্ঠী-জীবনের বিশেষত্ব যে স্বাধীনতা তাহা ইহাদের উৎপাতে অনেকটা খর্ব্ব হইতে থাকে।

রাজপদকে শক্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে এই সকল "ক্ষত্রিয় শ্রেণী" "সামরিক গুণ্ডার দল"ই ছিল মস্ত সহায়। তাসিতুস্ বলেন :—"এই সকল দলকে 'খোরাক' দিবার জন্য রণ-নায়কেরা সর্ব্বদাই লড়াই, লুটপাট বা দাঙ্গাহাঙ্গামায় মত্ত থাকিতে বাধ্য হইত।" পালোআনের দলকে তোআজ করা লড়াই ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। সমাজে ডাকাইতি একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাণ্ডে পরিণত হয়। যখন ডাকাইতি জুটিত না তখন যে কোনো অছিলায় পার্শ্ববর্ত্তী মুল্লুকে চড়াই করা ছিল যুবা-বীরদের স্বধর্ম্ম। এই ধরণের লড়াই-ব্যবসায়ী লুটপাটপ্রিয় গুণ্ডার দল হইতেই রোমাণ সম্রাটেরা অনেক সময় ফৌজ সংগ্রহ করিত। এই কারণেই বহুক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণরা লড়িয়াছে।

"লাণ্ড্স্‌ক্লেখ্‌টু" বা "ভাড়াটিয়া ফৌজ" জার্ম্মাণ-সমাজের এক কলঙ্কময় প্রতিষ্ঠান। এই সকল বেতনভোগী আদর্শহীন লড়াই-ব্যবসায়ী বরকন্দাজ বা পল্টনের আবির্ভাব সেই প্রাচীন রণ-সর্দ্দারদের সামরিক দলবলের ভিতরই লক্ষ্য করিতে হইবে। রোমাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জার্ম্মাণদের হাতে আসিবার পর এই সব রাজ-পেটোয়া গুণ্ডারাই অভিজাত বংশের অর্দ্ধেক অংশ গড়িয়া তোলে। রোমাণ দরবারের মোসাহেবরাও এই ধরণের আভিজাত্যে দল পুরু করিয়াছে।

মোটের উপর দেখা গেল যে, জার্ম্মাণ জাতিগুলার শাসন প্রণালী গ্রীক্‌দের "বীর যুগ" এবং রোমাণদের তথাকথিত "রাজ যুগ" এই দুই স্তরের অনুরূপ। সার্ব্বজনিক-সভা, সর্দ্দার-পরিষৎ এবং লড়াই-নায়ক বা রাজা,—এই তিন অঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ছিল। গোষ্ঠী-প্রথায় ইহাই শাসন-পদ্ধতির চরম বিকাশ। "বার্ব্বার" যুগের "উচ্চতম" স্তরে এই পদ্ধতি ছাড়াইয়া উঠা কোনো সমাজেই সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু যেই মানব-সমাজ এই শাসন-কাঠাম ছাড়াইয়া উঠিবার দরকার বোধ করিতেছিল তখনই গোষ্ঠী-নীতির আয়ু ফুরাইয়া আসিতেছিল। সমাজ এক নবযুগোপযোগী নবীন স্বধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছিল। সেই স্বধর্ম্ম "রাষ্ট্র"-নীতির কথা।

অষ্টম অধ্যায়

জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি

"জার্ম্মাণিয়া মাগ্না"র নরনারী

রোমাণ ঐতিহাসিক তাসিতুসের বিবেচনায় জার্ম্মাণরা ছিল গুন্‌তিতে এক পুরু জাত। সেনাপতি সীজার কোনো কোনো জার্ম্মাণ জাতির লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে এক একটা আনুমাণিক অঙ্ক দিয়াছেন। উসিপেতান এবং তেঙ্ক্‌তেরাণ নামক দুই জাতি রাইন দরিয়ার বাম কিনারা পর্য্যন্ত তাঁহার আমলে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। নারী শিশু সমেত এই দুই জাতির লোক সংখ্যা সীজারের মতে ১৮০,০০০।

গল (সেকালের ফ্রান্স) দেশে যে সকল কেল্‌ট্‌ বাস করিত তাহাদের সংখ্যা সিসিলির ঐতিহাসিক দিয়োদোরুস্‌ প্রণীত গ্রীক্‌ গ্রন্থে পাওয়া যায়। দিয়োদোরুস্‌ বলেন—"এখানে ছোট বড় মাঝারি অনেক প্রকার জাতি বসবাস করে। সর্ব্ব-বৃহতের সংখ্যা ২০০,০০০ এবং সর্ব্ব-ক্ষুদ্র বোধহয় ৫০,০০০ এর কম নয়।"

তাহা হইলে গলে গড়-পড়্‌তা এক একটা জাতিকে ১২৫,০০০ নর-নারীর সমাজ-কেন্দ্র বিবেচনা করা চলে। এদেশের লোকেরা জার্ম্মাণদের চেয়ে তখনকার দিনে বেশি উৎকর্ষশীল ছিল। কাজেই জার্ম্মাণ জাতিগুলার প্রত্যেকের সংখ্যা গড়-পড়্‌তা কিছু কম হওয়াই স্বাভাবিক।

জার্ম্মাণি সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতিকে ১০০,০০০ সংখ্যক ধরিয়া লওয়া যাউক। তাহা হইলে আমেরিকার ইরোকোআ-সমাজের তুলনায় জার্ম্মাণ সমাজগুলি খুব বড়ই ছিল সন্দেহ নাই। ইরোকোআরা তাহাদের চরম বিকাশের কালে মহাহ্রদ সমূহ হইতে দক্ষিণে ওহায়ো এবং পটোমাক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ইহাদের লোক-সংখ্যা তখন মাত্র ২০,০০০। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইরোকোআরা আমেরিকায় এক বিপুল আতঙ্ক-স্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাইণ জনপদে যে সব জার্ম্মাণ জাতি বাস্তুভিটা গাড়িয়াছিল তাহাদের প্রধান প্রধান গুলাকে মানচিত্রের সাহায্যে "দেশস্থ" করিলে দেখিতে পাই যে আজকালকার (১৮৮০—৯০) প্রুশিয়ায় এক একটা জেলার যতখানি চৌহদ্দি সেই চৌহদ্দিই ইহাদের এক একটার স্বভূমির আয়তন ছিল। অর্থাৎ ১০,০০০ বর্গ কিলোমেটার বা ৩৮৬১ বর্গ মাইল বিস্তৃত জনপদে সেকালের প্রধান প্রধান জার্ম্মাণ জাতি বসবাস করিত।

রোমাণরা জার্ম্মাণদের মুল্লুকগুলাকে সমবেত ভাবে "জার্ম্মাণিয়া মাগ্না" বলিত। এই ভূখণ্ডের পূর্ব্ব সীমানা ছিল হ্বিস্‌টুলা দরিয়ার কিনারা। সমগ্র "জার্ম্মাণিয়া মাগ্নার" আয়তন ৫০০,০০০ বর্গ কিলোমেটার অর্থাৎ ১৯৩,০৫০ বর্গ মাইল। অতএব যদি প্রত্যেক ৩৮৬১ বর্গমাইলে এক লাখ লোকের বাস ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে গোটা জার্ম্মাণ মুল্লুকে লোক ছিল ৫,০০০০০০। "বার্ব্বার" জন-সমাজ সম্বন্ধে এ এক অতি বিপুল সংখ্যা। অবশ্য বর্ত্তমান জগতের হিসাবে প্রত্যেক বর্গ কিলোমেটারে ১০ জন অর্থাৎ প্রত্যেক বর্গ মাইলে ২৫ জন এমন বিশেষ কিছু নয়।

কিন্তু পঞ্চাশ লাখ লোকই জার্ম্মাণ সমাজগুলার চরম সংখ্যা নয়। তখনকার দিনে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ নর-নারী কার্পেথিয়ান পাহাড়ের গায়ে গায়ে ডানিউব দরিয়ার মোহনা পর্য্যন্ত বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা "গথিক" শ্রেণীর জার্ম্মাণ। বাষ্টার্ণিয়ান, পয়কিনিয়ান ইত্যাদি নামে তাহারা পরিচিত। রোমাণ ঐতিহাসিক প্লিনির মতে এই সকল লোক সমগ্র জার্ম্মাণ জনসংখ্যার পঞ্চম অংশ।

১৮০ খৃষ্টাব্দেও এই সব জার্ম্মাণ জাতীয় লোককে লড়াই-ব্যবসায়ী পালোয়ান বা বরকন্দাজরূপে মাসিদোনিয়রাজ পার্সিয়ুসের বেতন ভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম অব্দে প্রথম রোমাণ-সম্রাট আওগুস্তুসের আমলে ইহারা আদ্রিয়ানোপল পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

প্লিনির কথার উপর নির্ভর করিলে ইহাদের সংখ্যা দশ লাখ। কাজেই খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ কালে "জার্ম্মাণিয়া মাগ্নার" এবং অন্যান্য জনপদের (দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইয়োরোপের) জার্ম্মাণ নর-নারীরা সংখ্যায় ছিল ৬,০০০,০০০।

"বিচরণের যুগ" শেষ হইয়া গেলে জার্ম্মাণরা যখন গৃহস্থরূপে আড্ডা গাড়িতে থাকে তখন তাহাদের লোক-বৃদ্ধি দ্রুত বেগেই সাধিত হইতেছিল। তাহাদের শিল্পকর্ম্মের বিকাশ হইতে এইরূপই মনে হইবে। শ্লেজহ্বিক্ দেশের খানা-ডোবার ভিতর লোহার এবং রূপার যে সকল দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সঙ্গে কতকগুলা রোমাণ মুদ্রাও দেখিতে পাই। এইগুলা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর টাকা। কাজেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ধাতু-শিল্প এবং বয়ন-কার্য্য জার্ম্মাণ

সমাজে বেশ পাকা ব্যবসা ছিল। বাল্টিক অঞ্চলের জার্ম্মাণরা রোমাণ সাম্রাজ্যের সঙ্গে কেনা-বেচা করিত। পয়সাওয়ালা লোকেরা তখন খানিকটা বিলাস সামগ্রী ভোগও করিতেছিল।

এই যুগেই আবার জার্ম্মাণরা সকল দিক হইতেই রোমাণ সাম্রাজ্যের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। রাইন দরিয়ার তরফ হইতে পশ্চিমে এবং রোমাণ প্রাচীর ও ডানিউব দরিয়ার তরফ হইতে দক্ষিণে অভিযান চলিতেছিল। উত্তর সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত রোমাণ সাম্রাজ্যের সকল কোনই জার্ম্মাণ-প্লাবনের ধাক্কা সামলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণরা এত বিপুল হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বভূমি ছাড়িয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

তিন শত বৎসর ধরিয়া রোমাণদের উপর জার্ম্মাণদের চাপ পড়িতে থাকে। "গথিক" শ্রেণীর জার্ম্মাণরা—স্কাণ্ডিনাভিয়ান এবং বার্গাণ্ডিয়ানরা বাদে—ইয়োরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইয়াছিল। মহাদেশব্যাপী জাতিসংঘর্ষের লড়াইয়ে গথ্‌রা ছিল জার্ম্মাণ সেনার বাম অঙ্গ।

মধ্যভাগে রোমাণ সাম্রাজ্য গুঁড়া করিবার ভার ছিল "হাই" জার্ম্মাণদের হাতে। ইহারা হারমিনোনিয়ান্ নামে অভিহিত। ডানিউব দরিয়ার মাথার অংশে ইহারা রোমাণদের উপর চাপ বসাইতেছিল। জার্ম্মাণ সেনাবাহিণীর দক্ষিণ অঙ্গ সামলাইয়াছিল ইস্‌কেহ্বোনিয়ান জাতি। রাইন দরিয়ার সীমানা ছাড়িয়া রোমাণ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলা তাঁবে আনা ছিল ইহাদের কাজ। এই সময়ে এই জাতীয় জার্ম্মাণদিগকে ফ্রাঙ্ক বলিত।

ফ্রান্সের ব্রিটানি অঞ্চলে ভাসিয়া আসে ইন্‌গেহ্বোনিয়ানরা। ইহাদের দলে ছিল ফ্রিজিয়ান, স্যাক্‌সন, জুট্‌, এবং অ্যাংগল্‌। উত্তর সাগরের কুলে জুইডার জে হইতে ডেন্মার্ক পর্য্যন্ত ইহাদের বসবাস ছিল। জার্ম্মাণদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া হয়রাণ হইতে হইতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে রোমাণ সাম্রাজ্য চিৎ হইয়া পড়ে।

"রোমাণ" সমাজে জমিদার ও গোলাম

এইবার গ্রীক্‌ এবং রোমাণ সভ্যতার জীবন-লীলার শেষ দেখিতেছি। রোমাণ বিশ্ব-শক্তি সমগ্র ভূমধ্যসাগর জনপদে বৈচিত্র্য ভাঙ্গিয়া ঐক্য এবং সমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। গ্রীক্‌ভাষা যেখানে যেখানে নেহাৎ প্রবল আকারে দেখা দেয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার উচ্ছেদ সাধন করিয়া ল্যাটিন ভাষা,—কম্‌ সে কম্‌ ল্যাটিন প্রভাবান্বিত কোনো দোআঁস্‌লা উপভাষা ঘর করিয়া বসিয়াছিল।

গল, ইবেরিয়ান, লিগুরিয়ান, লোরিকান ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির নাম আর সে আমলে কেহ মুখে আনিত না। সকল জাতিই এক নামে রোমাণ মাত্র রূপে পরিচিত হইত। রোমাণ আইনকান্থন আর শাসনের আওতায় সাবেক কালের স্থানীয় স্ব স্ব প্রধান গোষ্ঠীধর্ম্মগুলা লোপ পাইয়াছিল। জনপদগত বা জাতিগত স্বাধীনতা "মান্ধাতার আমলের" সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছিল।

ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এই যে এক নূতন ধরণের

"রোমাণ" নর-নারী গড়িয়া উঠিতেছিল ইহারা জগৎকে নূতন কিছু দিতে পারে নাই। ইহারা ছিল বিশেষত্ব-বর্জ্জিত, জাতীয়-স্বাতন্ত্র্যহীন, জন-সমাজ। স্বাতন্ত্র্য এবং জাতীয়তার অভাবই ছিল তাহাদের বিশেষত্ব। নূতন নূতন জাতি গড়িয়া তুলিবার উপাদান অবশ্য এই সকল সমাজে কম ছিল না।

ভিন্ন ভিন্ন জনপদের ল্যাটিন উপভাষাগুলা ক্রমেই বৈচিত্র্য ও অনৈক্যের পথে বাড়িয়া চলিতেছিল। ইতালী, গল, স্পেন, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশের প্রাকৃতিক সীমানা গুলাও 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্'ই ছিল। কাজেই জনপদে জনপদে ভৌগোলিক স্বতন্ত্রতা বজায় ছিল পূরামাত্রাতেই। কিন্তু এই সকল উপকরণকে ব্যবহার করিয়া খাঁটি জন-পদগত বা জাতিগত স্বরাজ কায়েম করিবার মতন ক্ষমতা কোনো কেন্দ্রেই বিকশিত হয় নাই। সৃষ্টি-শক্তির অভাব সেই যুগের এক বিশেষ লক্ষণ।

এই বিপুল জন-সঙ্ঘকে ঐক্যবদ্ধ করা হইতেছিল রোমের নামে। অথচ রোম সে যুগে আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নগরী রূপে পূজা পাইতেছিল না। মফঃস্বলের হিংসায় এবং প্রতিযোগিতায় রাজধানীটা সাধারণ শহরে পরিণত হইয়াছিল। কন্‌ষ্টান্টিনোপল, মিলান, ত্রেভস্ ইত্যাদি শহরেই বাদশাহ, রাজপ্রতিনিধি ইত্যাদি শ্রেণীর শাসনকর্ত্তারা বসবাস করিত।

এদিকে রোমাণ শাসন প্রজাগণের ধন-শোষণ মাত্রের কলস্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। খাজনায় নানারূপ নর-

নারীকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর অবস্থায় লইয়া গিয়া ঠেকাইতেছিল। তাহার উপর তহশিলদার এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীর ঘুস খাওয়া এবং জুলুম ত ছিলই। রোমাণ সাম্রাজ্য যথেচ্ছশাসন, অত্যাচার এবং শৃঙ্খলাহীনতার নামান্তর বিবেচিত হইত। অপর পক্ষে বিদেশীর আক্রমণ হইতে জন-গণকে রক্ষা করার ক্ষমতা আর তাহার ছিল না। জন-গণই বিদেশীদিগকে "যেচে এসে ডেকে নিয়ে" স্বদেশী অত্যাচারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। দুস্‌মনদিগকেই স্বদেশের উর্দ্ধারকর্ত্তা এবং যুগাবতার বিবেচনা করা সেকালের রোমাণ নর-নারীর স্বধর্ম্ম বিবেচিত হইত।

এই গেল রোমাণ সাম্রাজ্যের চরম অবস্থার আইনকানুন এবং রাষ্ট্র-শাসনের কথা। জন-গণের সামাজিক রীতিনীতিও এই যুগে যারপরনাই শোচনীয় ও লজ্জাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। রোমাণদের সামাজিক অধোগতি গণ-তন্ত্রের আমলেই সুরু হয়। মফঃস্বল এবং বিজিত দেশগুলাকে শুষিয়া টাকা আদায় করা ছিল গণ-নায়কদের নীতিশাস্ত্র।

সাম্রাজ্যের আমলেও এই নীতিশাস্ত্রেরই জের চলিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পের বিকাশে রোমাণজাতির নজর কোন দিনই ছিল না। সরকারী কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে ব্যবসা মাথা তুলিতেই পারিত না। প্রধানতঃ টাকা ধার দিয়া সুদ খাওয়া এবং সুদখোর "কষাই" শ্রেণীর লোককে পুষ্ট করা রোমাণ সমাজের এক প্রধান কথা। আসল ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু সবই গ্রীক্ অঞ্চলের "রোমাণ"দের অর্থাৎ গ্রীক্ জাতীয় লোকের হাতে ছিল। মোটের উপর আর্থিক জীবনের সকল

বিভাগেই রোমাণ সাম্রাজ্য আনিয়াছিল অবসাদ, নগরের অবনতি এবং শিল্প-লোপ। কৃষিকার্য্যেও অধঃপতন দেখা দিয়াছিল।

গোটা দুনিয়ায় কৃষিকার্য্যই ছিল ধন-দৌলতের প্রধান জন্মদাতা। এই যুগেও কৃষিকার্য্যের দাম কম ছিল না। ইতালীতে গণ-তন্ত্রের অবসান কাল হতেই বড় বড় জমিদারী প্রথা সুরু হইয়াছিল। এইগুলাকে 'লাতিফুন্দি' বলিত। সাম্রাজ্যের আমলে 'লাতিফুন্দি' বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

'লাতিফুন্দি'গুলার দুরবস্থা শীঘ্রই দেখা দেয়। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে চাষ-আবাদ চলিত না, লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। ভেড়া-বলদের চরিবার মাঠরূপে জমিগুলা ব্যবহৃত হইত। কয়েকটা গোলাম রাখিলেই জমিদারেরা সহজে কাজ চালাইতে সমর্থ হইত। চাষবাষও চলিত কিছু কিছু সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ছিল 'লাতিফুন্দি' অধিপতিদের বিলাসভোগের উপযোগী "বাগানবাড়ী"র রসদ জোগানো মাত্র। কিছু কিছু বিলাস-ভোগের ফল-মূল শহুরে বাজারেও বিক্রীর জন্য পাঠানো হইত।

কিন্তু জমিদারীগুলাও উচ্ছন্নে যাইতেছিল। কেন না একে জমিদারবাবুরাই গরীব হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর শহরের অবনতি হওয়ায় লোক-জনেরা বিলাসজীবনের উপযোগী বাগানবাড়ীর ক্ষেত্রের ফল-মূল কিনিতে অসমর্থ ছিল। গোলাম খাটাইয়া ভেড়া-চরাণো অথবা বিলাসের চাষ-চালানো আর সবস্তপর হইল না।

বড় বড় জমিদারীগুলা টুক্‌রা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বেচা হইতেছিল। এই সকল ছোটোখাটো জমিজমার মালিক

হইল কৃষাণেরা! ইহারা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর দিয়া রেহাই পাইত। এই সূত্রে "পার্ত্তিয়ারি" নামক একশ্রেণীর লোকও ছোটখাটো জমির মালিকে পরিণত হয়। ইহাদিগকে মালিক না বলিয়া তদারককারী কর্ম্মচারী বলাই ভাল। কেন না ইহারা নিজে কৃষাণ ছিল না, কৃষাণের কাজ তদ্‌বির করা ছিল ইহাদের কর্ত্তব্য। এই জন্য উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ বা নবমাংশ থাকিত তাহাদের প্রাপ্য।

মোটের উপর কিন্তু 'লাতিফুন্দি' জমিদারিগুলা কৃষাণদের ভিতরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রায় ভাগাভাগি হইয়া যায়। এই সকল কৃষাণকে "কলোনিষ্ট" বা উপনিবেশ-স্থাপয়িতারূপে বিবৃত করা হইত। বার্ষিক খাজনা দিলেই ইহাদের কর্ত্তব্য ফুরাইত। কিন্তু জমিগুলা বেচার সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও বিক্রী হইয়া যাইত। গোলাম বলিলে যাহা বুঝায় এই সকল 'কলোনিষ্ট' কৃষাণ ঠিক তাহা নয় বটে, কিন্তু স্বাধীনতার চূড়ান্ত অভাব তাহাদের জীবনে ঘটিত। স্বাধীন নাগরিকদের সঙ্গে ইহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল অধিকন্তু নিজ সমাজের ভিতরও যে বিবাহ চলিত তাহাকে আইনের চোখে বিবাহ রূপে গণ্য করা হইত না। গোলামদের পত্নীরা যেমন আইনতঃ উপপত্নী মাত্র, এই সকল কৃষাণদের পত্নীও ঠিক সেইরূপ বিবেচিত হইত। মধ্যযুগের ইয়োরোপে "সার্ফ" বা ভূমি-গোলাম নামক এক শ্রেণীর কৃষাণ দেখা দেয়। সেই প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বপুরুষই রোমাণ সাম্রাজ্যের পতনকালের এই সকল "কলোনিষ্ট" চাষী।

সাবেক কালের দাসত্ব প্রথায় এ যুগে আর কোনো আর্থিক লাভ ঘটিত না। কি চাষআবাদে কি শহরের কারবারে

কোথায়ও গোলাম খাটাইয়া জমিদার বা ব্যবসাদারেরা দু'পয়সা করিতে পারিত না। কেন না গোলামের শ্রমের বাজারই উঠিয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্যের গৌরব যুগে বড় বড় শিল্পে কৃষিকর্ম্মে অবশ্য গোলামের শ্রম খাটাইয়া লাভবান হওয়া সম্ভবপর ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন ছিল কেবল ছোটখাটো কারবার, ছোটখাটো ক্ষেত। গোলাম-খাটানো এই সকল ক্ষেত্রে অসম্ভব। ধনীলোকেরা দু'-চার জন গোলাম রাখিত ঘরের কাজের জন্য, অথবা বিলাসের বা ধন-দৌলতের মাত্রা দেখাইবার জন্যও তাহারা গোলাম রাখা দস্তর বিবেচনা করিত।

তাহা সত্ত্বেও গোলামী-প্রথার কুফল সমাজে বেশ ছড়াইয়াই পড়িয়াছিল। মেহনৎ করিয়া, গায়ে খাটিয়া অন্ন-সংস্থান করা স্বাধীন রোমাণরা একটা অপমানের চিহ্ন বিবেচনা করিতে শিখিয়াছিল। এদিকে রোমে যখন প্রায় সকলে স্বাধীন জীব তখন রোমাণ-সমাজের সকলেই শারীরিক পরিশ্রমকে নেহাৎ গর্হিত সমঝিতেই অভ্যস্ত ছিল।

মনিবেরা খাঁটি গোলাম পুষিতে অসমর্থ। কাজেই গোলামের দলকে বরখাস্ত করা সে যুগের এক লক্ষণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'কলোনিষ্ট'-চাষীদের দল বাড়িতেছিল। আর বাড়িতেছিল "হা ভাতে" "হা ঘরে" অন্ন-বস্ত্রহীন "স্বাধীন" নর-নারীর সংখ্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোলামশীল প্রদেশগুলার দরিদ্র স্বাধীন শ্বেতাঙ্গদের অবস্থা দেখিলেই রোমাণ-সমাজের এই যুগ বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে গোলামী-প্রথা জগৎ হইতে উঠিয়া গিয়াছে—এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রোমাণ সাম্রাজ্যের অধীনে

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম গোলাম প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয়ানদের গোলাম কেনা-বেচা ব্যবসায় বাধা দিবার জন্য খৃষ্টধর্ম্ম হাত তুলে নাই। উত্তরে জার্ম্মাণরা, ভূমধ্যসাগরে ভেনিসের বণিকজাতি এবং পরে নিগ্রো-মণ্ডলের শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টীয়ানরা যুগে যুগে দাস-ব্যবসা চালাইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম কোনোদিনই তাহার বিরুদ্ধে কথা বলে নাই।

ফ্রান্সের ভ্যাদা নগর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তথাকথিত জার্ম্মাণ ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের একবড় খুঁটা ছিল। এই নগরের সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ শিল্প বা ব্যবসায় ছিল পুরুষের যোনি কাটিয়া খোজা বা হিজ্‌রা প্রস্তুত করা। ভ্যাদার ফ্যাক্টরির তৈয়ার করা হিজ্‌রা-দিগকে স্পেনে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এইখানে "মুর" জাতীয় মুসলমানেরা খৃষ্টীয়ান-শিল্পে নিজ অভাব মোচন করিত।

খৃষ্ট ধর্ম্ম গোলামী তুলিয়া দেয় নাই। গোলামী উঠিয়া গিয়াছে আর্থিক কারণে। গোলামদিগকে খাটাইয়া মনিবেরা যখন হইতে লাভবান হইতে পারিল না তখন হইতেই গোলামীর শিকড় শুকাইতে সুরু করিল।

কিন্তু রোমাণ-সমাজে এক সমস্যা উপস্থিত হইল। গোলাম আর নাই কিন্তু শারীরিক কাজ করা স্বাধীনদের চিন্তায় গর্হিত। শ্রমজীবী নামক এক শ্রেণীর স্বাধীন লোক তখনও দেখা দেয় নাই। কাজেই রোমে একটা আর্থিক বিপ্লবের কাল উপস্থিত হইয়াছিল।

গল্ দেশের কয়েকটা জেলা হইতে শোচনীয় চিত্র পাওয়া গিয়াছে। 'কলোনিষ্ট' ছাড়া স্বাধীন কৃষাণও সে দেশে চাষবাস করিত। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারী আর সুদখোর মহাজনদের

অত্যাচার সহিতে করিতে না পারিয়া অনেক সময় কৃষাণেরা দল বাঁধিয়া কোনো ক্ষমতাবান লোকের আশ্রয় লইত। চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাটেরা এই ধরণের আশ্রয়-লওয়া আইন দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু এই আশ্রয়দাতাদের কড়ারও ছিল জবর। কৃষাণরা নিজ নিজ জমির স্বত্বাধিকার আশ্রয়দাতাকে দিয়া দিতে বাধ্য থাকিত। অবশ্য আজীবন ভোগের অধিকার কৃষাণদেরই থাকিত। এই ফন্দী পরবর্ত্তী কালে গির্জ্জার মোহান্তেরা খুব বেশি মাত্রাতেই চালাইযাছে। গরীব কৃষাণদের জমি বেহাত করিয়া ভগবানের আদেশ পালন করিবার পথে নবম এবং দশম শতাব্দীর খৃষ্টয়ান-ধর্ম্ম-কেন্দ্র-সমূহ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

আশ্রয়দাতা সাধারণ লোকই হউক অথবা পুরোহিত-সঙ্ঘই হউক, ইহার কড়ার যে জুয়াচুরি বা ডাকাইতির সমান নিন্দনীয় একথা সে যুগের লোকেরাও বেশ বুঝিত। মার্সেইয়ের "বিশপ" বা পুরোহিত-সর্দ্দার সাল্‌ভিয়ানুস এই সকল জুলুমের নিন্দা করিয়াছেন। 'রোমাণরা' সরকারী আইন-কানুন এবং কর্ম্মচারী ও আশ্রয়দাতাদের অত্যাচার হইতে পলাইয়া গিয়া "বার্ব্বার" জার্ম্মাণদের ভিতর বসবাস করিতে বাধ্য হইত। রোমাণ শাসনে ফিরিয়া আসার মতন ভয়াবহ কাণ্ড তাহাদের চিন্তায় আর ছিল না।

সে যুগে গরীব বাপ-মারা সন্তান-সন্ততিকে গোলাম রূপে বেচিতে অভ্যস্ত ছিল। একটা আইনের দ্বারা প্রথাটা তুলিয়া দেওয়া হয়। সন্তান-বেচার বিরুদ্ধে আইন আবশ্যক হইয়াছিল,—এই তথ্য হইতেই সমাজের অবস্থা অনুমান করা যায়।

জার্ম্মাণদের রাজতন্ত্র

জার্ম্মাণরা "রোমাণ"দিগকে স্বজাতীয়দের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ রোমাণরা তাহাদের জমি-জমার দুই তৃতীয় অংশ উদ্ধার-কর্ত্তাদের হাতে সঁপিয়া দিতে বাধ্য হইল। জার্ম্মাণরা এই সকল সম্পত্তি নিজেদের ভিতর গোষ্ঠী-ধর্ম্ম অনুসারে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইল।

জার্ম্মাণ বিজেতারা অবশ্য গুন্‌তিতে বেশি নয়। কাজেই সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড অনেকগুলা অবিভক্ত যৌথভাবে গোটা গোষ্ঠী, বা ট্রাইব বা জাতির সমবেত সম্পত্তি রহিয়াছিল। গোষ্ঠীগুলা নিজ নিজ ভাগ-বাটোয়ারায় লটারির অনুসরণ করিত। প্রত্যেক পরিবারের কপালে যে যে টুক্‌রা পড়িত সেটা তাহার নিজস্ব বিবেচিত হইত। এই সব টুক্‌রা কেনা-বেচা সম্ভবপর ছিল। নাম ছিল "আলোদিয়ুম" বা স্বাধীন সম্পত্তি। বনভূমি এবং পশুচারণের মাঠ সমুদয় যৌথ থাকিত। চাষআবাদ চলিত গতানুগতিক গোষ্ঠীর নিয়মানুসারে।

রোমাণদের সঙ্গে জার্ম্মাণরা মিশিয়া ডালেচালে খিচুড়িরূপে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই সাবেক কালের গোষ্ঠী-ধর্ম্মের "রক্ত"-সম্বন্ধের বাইরে "দেশগত" জনপদগত আত্মীয়তার সম্বন্ধ সৃষ্ট হইতেছিল। "মার্ক্-কমিউন" বা পল্লী-সমবায় গোষ্ঠী-কেন্দ্রকে ডুবাইয়া দিল। অবশ্য প্রথম প্রথম এই পল্লী-কেন্দ্রেও রক্তসম্বন্ধের প্রভাব দেখা যাইত। উত্তর ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জার্ম্মাণিতে এবং স্কাণ্ডিনাভিয়ায় মার্কে এবং গোষ্ঠীতে কম-বেশি সমন্বয় বা সন্ধি কায়েম হইতেছিল।

মোটের উপর গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের সাম্যনীতি এবং গণতান্ত্রিক স্বধর্ম্ম নবীন "স্থানগত" জীবনকেন্দ্রে একদম লুপ্ত হইয়া যায় নাই। গোষ্ঠীনীতির যেটুকু জের এই যুগে বজায় থাকিতে পারিয়াছিল তাহার প্রভাবেই দারিদ্র্য নির্য্যাতিত এবং 'অনধিকারী' শ্রেণীর নর-নারী সমাজে নিজ দাবীদাওয়া চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

রক্তকেন্দ্রের প্রভাব কমিবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণো জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলার বিভিন্ন অঙ্গও বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। রোমাণ প্রদেশগুলা দখল করিবার পর তাহাদের হাতে ভার পড়িল, এই গুলা সুশাসনে শৃঙ্খলীকৃত করার। কিন্তু কোন্ শাসন প্রণালী তাহারা অবলম্বন করিবে? তাহারা জানিত মাত্র গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের নীতিশাস্ত্র। রোমাণদিগকে নিজ গোষ্ঠী-কেন্দ্রে পুরিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অথচ গোষ্ঠীর নিয়ম জারি করিয়া তাহাদিগকে শাসন করাও চলিতে পারে না। এই সমস্যায় জার্ম্মাণরা নতুন অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইল।

রোমাণ প্রদেশে প্রদেশে যে সকল রোমাণ প্রতিষ্ঠান চলিতেছিল সেইগুলা বজায় রাখাই "বার্ব্বারে"রা বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিয়াছিল। নতুনের মধ্যে তাহারা নিজ এক্তিয়ারের প্রতিনিধি স্বরূপ কোনো কোনো কর্ম্মচারীকে সেই সকল স্থানীয় শাসন-কেন্দ্রের মাথায় বসাইয়া দিল। বিজেতা জাতি নিজ প্রতিনিধি আর কাহাকেই বা পাঠাইবে? লড়াইয়ের সর্দ্দার হইল রোমাণ শাসন-কেন্দ্রে জার্ম্মাণ-গোষ্ঠীর স্তম্ভস্বরূপ।

রণ-নায়ককে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায় না। তখন চলিতেছিল একে আভ্যন্তরীণ অশান্তি তাহার উপর নিত্য নতুন বিদেশীদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ। কাজেই জার্ম্মাণরা

রণ-নায়কের ক্ষমতা দিন দিন বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলতঃ রণ-নায়ক নরপতিত্বে পরিণত হইল। এইখানেই বিদেশ বিজয়ের প্রভাবে গোষ্ঠী-প্রথায় "রাজতন্ত্রের" আবির্ভাব।

ফ্রাঙ্ক্-জাতীয় জার্ম্মাণ বিজেতাদের মুল্লুকে সালিয়ান শ্রেণীর রণ-নায়কেরা রোমাণদের সকল সরকারী জমি দখল করিয়া বসিয়াছিল। পল্লীসমাজের অধীনে যে সকল জমি-জমা ছিল সেইগুলা ছাড়া অন্যান্য সকল সম্পত্তি ইহারা দখল করিতে ছাড়ে নাই। দখল করা হইত অবশ্য সবই গোটা জাতির নামে। কিন্তু প্রথমেই রণ-নায়কেরা সব সম্পত্তি রাজ-দৌলতে পরিণত করে। জন-সাধারণের ভাবে কোনো জমিই থাকিল না। রাজারা "নিজ সম্পত্তি" হইতে নিজ নিজ পেটোয়াদিগকে কিছু কিছু উপহার দিয়াছিল মাত্র।

পেটোয়া ছিল কাহারা? রাজার বা রণ-নায়কের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ লাঠিয়াল, কুস্তীগীর, গুণ্ডা, লড়াই-প্রেমিক যুবা এবং অন্যান্য পল্টনীকাজে করিৎ-কর্ম্মা লোকজনই তাহার সর্ব্বপ্রিয় সন্দেহ নাই। এদিকে নতুন দেশে বসবাস করিতে আসিয়া জার্ম্মাণেরা স্থানীয় অর্থাৎ "রোমাণ" বা রোমাণীকৃত গলদিগকে লেখক, কেরাণী, দোভাষী, আইনজ্ঞ, স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ইত্যাদিরূপে নক্‌রি দিতে বাধ্য হইত। ল্যাটিন ভাষা, সাহিত্য এবং রোমাণ আইনকানুনে অভিজ্ঞতাওয়ালা বহু লোক এই উপায়ে সালিয়ান ফ্রাঙ্কদের রাজপ্রিয় হইয়াছিল। রাজ-সম্পত্তির কয়েক টুক্‌রা ইহাদের কপালে জুটিয়াছিল।

এই দুই ধরণের জার্ম্মাণ ও রোমাণ পেটোয়া ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোকও রাজাদের দল-বল পুরু করিত। তাহারা ছিল

গোলাম,—সার্ফ অথবা স্বাধীনতা-পাওয়া গোলাম। ইহাদিগকে হাতে রাখিবার জন্যও বিজিত দেশের নবীন রাজারা জমি-জমা দিয়া খুশী রাখিত। এই সকল নানা উপায়ে একটা নতুন অভিজাত-সম্ভ্রান্ত বা ধন-কুলীন জাতি গড়িয়া উঠিতেছিল। জনসাধারণ সকল দিক হতেই অধিকারচ্যুত হইতেছিল।

দেশজয়ের ফলে রণ-নায়কের ক্ষমতা বাড়িয়া যাওয়ায় গোষ্ঠী-প্রথায় প্রথম ভাঙ্গন লাগে। অতিবৃদ্ধিশীল রণ-নায়ক বা রাজা নিজ পেটোয়াদিগকে কুলীন করিয়া তুলিয়া গোষ্ঠী-প্রথায় আর এক ঘা লাগাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজ-তন্ত্রের তরফ হইতে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নতুন এক অস্ত্র চলিয়াছিল। গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের সর্দ্দার-পরিষৎ উঠিয়া গেল। ইহার স্থান পূরণ করিল রাজ-সর্দ্দারদের মজলিস। অধিকন্তু সাবেক কালের "সার্ব্বজনিক" সভাটা এখন নামে মাত্র টিকিয়া রহিল। এই সভায় আসিত রাজ-পেটোয়ারা অর্থাৎ কুলীন জমিদাররা বাদে সমর বিভাগের নিম্নতর সেনাপতিরা এবং নতুন নতুন অভিজাতবংশীয় কুলীনেরা।

জার্ম্মাণ কিষাণদের দুর্গতি

জনসাধারণের ঠাঁই কোথায়? কোথায়ও না। রোমাণ গণতন্ত্রের আমলে কৃষাণদের যে দুর্গতি দেখা গিয়াছিল সেই দুর্গতিই ফ্রাঙ্ক্ নর-নারী জার্ম্মাণ যুগে ভোগ করিতেছিল। ঘরোয়া লাঠালাঠি আর দেশজয়ের লড়াই এই ছিল তাহাদের জীবনের কর্ম্মভোগ। যে সকল লোক সাবেক কালে ফ্রান্স-বিজেতা পল্টনের অন্তর্গত ছিল তাহারাই ক্রমে ক্রমে এমনি অনধিকারী

সম্পত্তিহীন ও দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নবম শতাব্দীতে তাহাদের পাঁচ ভাগের এক ভাগও স্বাধীনভাবে লড়াইয়ে যাইতে সমর্থ ছিল না।

কাজেই নতুন উপায়ে পল্টন তৈয়ারি করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। কুলীন অভিজাতদের অনুচরেরা নবীন সৈন্যের ফৌজ হইতে থাকিল। রাজা স্বয়ং এখন আর সমগ্র দেশ হইতে লোক ডাকিয়া সেনা গঠন হইতে অসমর্থ। কিন্তু জমিদারদের অনুচর ছিল কাহারা? ইহারাই পূর্ব্বকালে স্বাধীন কৃষাণরূপে রণ-নায়কের হুকুম তামিল করিত এবং আরও সাবেক কালে কোনো রাজার তোয়াক্কা রাখিত না।

শার্ল্যমেঞের বংশধরদের আমলে ঘরোয়া লড়াইয়ের দরুণ কৃষাণদের দুর্গতি আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। রাজার ক্ষমতা দিন দিন কমিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের প্রভুত্ব সমাজে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। শার্ল্যমেঞ প্রত্যেক 'গাও' বা জেলায় (গাও—মার্ক্ বা পল্লীর চেয়ে বিস্তৃতর জনপদ) নতুন একপ্রকার কর্ম্মচারী বহালের ব্যবস্থা করেন। ইহারা পদগুলা বংশগতরূপে একচেটিয়া করিয়া ফেলে। এই সকল গাও-শাসক অন্যান্য অভিজাতদের দলে ভিড়িয়া জনসাধারণের উপর জুলুমে যোগ দিতে ভুলিত না।

কৃষাণরা নর্ম্মাণদের আক্রমণে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শার্ল্যমেঞের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ফ্রান্স নর্ম্মাণ বিজেতাদের চরণতলে বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঠিক চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই ধরণেই গল প্রদেশের রোমাণ সাম্রাজ্য ফ্রাঙ্কদের নিকট কাবু হইয়া পড়ে।

ফ্রাঙ্কদের অধোগতি অন্যান্য দিকে সেই রোমাণ সাম্রাজ্যের অধোগতিরই জুড়িদার। "কলোনিষ্ট" কৃষাণরা রোমাণ আমলে যেরূপ দুঃখময় জীবন যাপন করিত সেই দুঃখ দারিদ্র্যই এই যুগে স্বাধীন ফ্রাঙ্ক কৃষাণদের ভাগ্যে জুটিতেছিল। রাজশক্তি তাহাদিগকে কোনো মতেই রক্ষা করিতে পারিত না। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য ইহারা হয় জমিদারের না হয় গির্জ্জার শরণাপন্ন হইত। কিন্তু এই আশ্রয়ের কিস্মৎ ছিল ঢের।

রোমাণ আমলের সেই "কলোনিষ্ট"দের মতনই ফ্রাঙ্ক আমলে চাষীরা আশ্রয়দাতাদিগকে নিজ নিজ জমির মালিক করিতে বাধ্য হইত। তাহার পর এই সকল নতুন মালিক কৃষাণদিগকে রাইয়ত রূপে জমির ভোগস্বত্ব প্রত্যর্পণ করিত। অবশ্য এই ভোগসত্বের জন্যও আবার কৃষাণরা কর দান এবং গতর খাটার দায়িত্ব লইত।

এইরূপে পরাধীন হইবামাত্র কৃষাণরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েক পুরুষের ভিতর ফ্রান্স ভরিয়া সার্ফ বা ভূমি-গোলাম দেখা দিয়াছিল।

"সাঁ জার্ম্মাঁদে প্রে" নামক গির্জ্জা সে যুগে প্যারিসের নিকটবর্ত্তী ঠাঁইয়ে অবস্থিত ছিল। আজকাল অবশ্য গির্জ্জাটি প্যারিস শহরেরই এক ধর্ম্মমন্দির। শার্ল্যামেঞ্জের আমলে এই মন্দির বা মঠের তাঁবে বিপুল বিস্তৃত জমিদারী শাসিত হইত। ২৭৮৮ পরিবার—ইহাদের অধিকাংশই জার্ম্মাণ নামধারী ফ্রাঙ্ক জাতীয় লোক—মঠের রাইয়ত ছিল। তাহাদের মধ্যে ২০৮০ ছিল "কলোনিষ্ট"। কথঞ্চিৎ স্বাধীনতাবিহীন কৃষাণ পরিবারের সংখ্যা ৩৫, এবং খাঁটি গোলাম ছিল ২২০। পুরাপুরি স্বাধীনতা-ওয়ালা কৃষাণ পরিবার গুন্‌তিতে মাত্র ৮।

পুরোহিত-সর্দ্দার* সিল্‌হ্বানিয়ুস পঞ্চম শতাব্দীতে কৃষাণদের জমি বেহাত করিয়া লইবার জন্য গির্জ্জা-প্রতিষ্ঠানকে যারপর-নাই নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু নবম শতাব্দীতে এই প্রথা খ্রীষ্টান মোহান্তদের আটপৌরে জীবনের কথায় পরিণত হইয়াছিল।

অধিকন্তু কৃষাণদিগকে গতর খাটাইয়া কাজ করানো এ যুগের এক অতি সাধারণ নীতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। রোমাণ আমলে 'আঙ্গারি' প্রথার সাহায্যে জনগণকে সরকারী কাজে বাধ্য করা হইত। জার্ম্মাণদের মার্কনীতি অনুসারেও লোকেরা পল্লীর সাঁকো, সড়ক ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে বাধ্য থাকিত। সেই সকল সাবেক কালের নিয়মই ফ্রাঙ্ক আমলে জোরের সহিত চলিতেছিল। অর্থাৎ চার শ' বৎসর কাল জার্ম্মাণ বিজেতাদের শাসনে থাকিয়া গলের (ফ্রান্সের) নরনারী যেকে সেই রহিয়া গিয়াছিল।

এমনটি কেন ঘটিল? রোমাণ সাম্রাজ্যের অবসানকালে কৃষি-শিল্পের যেরূপ অবস্থা ছিল সেই অবস্থার অনুরূপই তখন সম্পত্তির বিভাগ ঘটিত এবং জনগণের শ্রেণী-বিভাগও সাধিত হইত। ধন-সৃষ্টির উপায় মাফিকই সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। চার শ' বৎসরের জার্ম্মাণ শাসনে কৃষি-শিল্পে নতুন কোনো কৌশল উদ্ভাবিত হয় নাই অর্থাৎ ধনদৌলত উৎপন্ন করিবার প্রণালীতে নতুন কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। কাজেই এই যুগেও সম্পত্তি-বিভাগ এবং শ্রেণী-ভেদের নিয়ম 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং' থাকিবে না কেন?

রোমাণ সাম্রাজ্যের অবসান কালে নগরগুলা মফঃস্বলের উপর আর কর্ত্তৃত্ব করিত না। ফ্রাঙ্ক আমলেও নগরগুলা আর মাথা

তুলিতে পারে নাই। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কৃষিকর্ম্মে এবং শিল্পে একটা নিম্নস্তরের যুগ চলিতেছিল। এই অবস্থায় বড় বড় জমিদারের ক্ষমতা বাড়িতে পারে মাত্র আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় ছোট ছোট কৃষাণদের দুরবস্থা।

শার্ল্যেমেঞ নিজ রাজ-বাগিচায় রোমাণ "লাতিফুন্দি" জমিদারীর নকলে গোলাম খাটাইয়া চায চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক সঙ্গে বহুসংখ্যক মজুরকে বাধ্য করিয়া কাজ করানো তাঁহার ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই সকল নতুন "পরীক্ষা"য় গোটা সমাজের উপর কোনো ফল ফলে নাই। শার্ল্যমেঞের পর কোথাও এই সকল উপায় অবলম্বিত হইত না।

একমাত্র মঠের মোহান্তরা শার্ল্যমেঞের পরীক্ষা অনুসারে কাজ চালাইতে থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের দল যাহা কিছু করিয়াছে তাহাকে সমাজের সাধারণ প্রথা বিবেচনা করা উচিত নয়। এসব ছিল ব্যতিরেক বিশেষ। সমাজের লোক এই গুলাকে বিশেষত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বরূপে দূর হইতে দেখিতে অভ্যস্ত ছিল। বহু সংখ্যক গোলাম খাটাইয়া চাষের ব্যবস্থা করা জনগণের স্বভাবে পরিণত হইতে পারে নাই।

"বার্ব্বার" রক্তের স্বধর্ম্ম

চার শ' বৎসরে কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই একথা বলিলে ভুল বুঝা হইবে। কি রোমাণ আমলে কি ফ্রাঙ্ক আমলে শ্রেণীভেদের এক রূপই দেখিতে পাই সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল নর-নারী এই শ্রেণীগুলার অন্তর্গত তাহারা দুই যুগে ভিন্ন ভিন্ন।

সাবেক কালের গোলামী আর ছিল না। আর ছিল না

রোমাণ আমলের শারীরিক পরিশ্রমে অপমান-বোধ। সেকালের "কলোনিষ্ট" কৃষাণ আর একালের নয়া সার্ফ বা ভূমি-গোলাম এই দুই শ্রেণীর দাসের মাঝামাঝি একশ্রেণীর কৃষাণ ফ্রাঙ্কের আমলে দেখা গিয়াছিল—তাহারা স্বাধীন নর-নারী।

অধিকন্তু রোমাণ আমলের "ইজ্জৎ লইয়া ঘরোয়া খাওয়া-খাওয়ি" আর এ যুগে দেখা যাইত না। একটা নয়া জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল! ইহাতে পুরাণো বাসি মালের স্মৃতি কাজ করিত কম। এ যুগের মনিব-ভৃত্যেরা সেকালের লোক-জনের তুলনায় মানুষ ছিল এ কথা বলা চলে। প্রাচীন জগৎ ভাঙিবার সময় সমাজে দেখা দেয় প্রবল-প্রতাপ জমিদার আর সেবকশ্রেণীর কৃষাণ। এই দুই শ্রেণীর লোক লইয়া ফ্রাঙ্করা এক নবীন সমাজ কায়েম করিতে সুরু করে।

তাহা ছাড়া বর্ত্তমান জগতে যে সকল "নেশ্যন" নামধারী জাতি চলিতেছে সেই সকলের জন্ম এই চার শ' বৎসরের ভিতরই ঘটিয়াছিল। ফলতঃ জার্ম্মাণরা ইয়োরোপে, বিশেষতঃ পশ্চিম ইয়োরোপে, একটা নয়া জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল—এইরূপই বিশ্বাস করিতে হয়।

জার্ম্মাণ আমলের রাষ্ট্র ভাঙাভাঙিতে শেষ পর্য্যন্ত অতি মারাত্মক রকমের ধ্বংস বা পরাধীনতা ঘটে নাই। রাজসম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা, জমিদারির উৎপত্তি আর তদুপযোগী 'ফিউড্যাল' সমাজ এই যুগের নতুন কথা। লোক সংখ্যার উপর এই সকল পরিবর্ত্তনের প্রভাব ভালই বলিতে হইবে। জমিদার-পালিত বহু কেন্দ্রী-কৃত ভূমি-গোলাম-প্রতিষ্ঠিত জনসমাজে লোক-সংখ্যা যারপরনাই বাড়িয়া গিয়াছিল। এই কারণেই দুই শত বৎসর

পরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টীয়ানদের যে ধর্ম্ম-যুদ্ধ সুরু হয় তাহাতে অজস্র লোক মরা সত্ত্বেও পশ্চিম ইয়োরোপ লোকবলে দরিদ্র হইয়া পড়ে নাই।

কিসের জোরে জার্ম্মাণরা ইয়োরোপীয় সমাজে নব জীবন ঢালিতে পারিয়াছিল? জার্ম্মাণির "স্বদেশ-প্রেমিক" ঐতিহাসিক-গণ লম্বা গলা করিয়া প্রচার করিয়াছেন—"জার্ম্মাণদের অপূর্ব্ব জার্ম্মাণামি ইহার কারণ।" যেন জার্ম্মাণ জাতির একটা কোন বিশেষ যাদুমন্ত্র ছিল! জার্ম্মাণরা যে 'আর্য্য' মানবের এক অতি উৎকর্ষশীল এবং ক্ষমতাবান জাত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর সেই সময়ে তাহারা উত্তরোত্তর বিকাশের পথে উঠিতেছিল একথাও বিশ্বাস করা চলে।

কিন্তু ক'ঘর স্বদেশী জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের গোঁড়ামি কোনো মতেই স্বীকার করা যায় না! জার্ম্মাণদের একমাত্র জোর ছিল এই যে, তখনকার দিনে তাহারা ছিল "বার্ব্বার"। এই "বার্ব্বার" জীবনের গুণেই তাহারা মরা ইয়োরোপকে বাচাইয়া তুলিয়াছিল। সেইগুণ আর কিছুই নয়—এক কথায় উহার নাম গোষ্ঠী-ধর্ম্ম।

সেকালের জার্ম্মাণদের ব্যক্তিগত কার্য্যদক্ষতা ও সৎসাহস ছিল প্রচুর। স্বাধীনতা ছিল তাহাদের রুধির। সাম্যনীতি এবং জন-গণের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ছিল তাহাদের সমাজ-নীতির প্রধান কথা। এই সব গুণই আবার সেকালের রোমাণরা খোয়াইয়া বসিয়াছিল। অথচ নতুন দেশ গড়িয়া তুলিতে অথবা পুরাণো জন-কেন্দ্রে নবীন জীবনস্রোত বহাইতে এই সকল গুণই আবশ্যক। এই সব গুণ জার্ম্মাণ নামের মহিমা নয়।

উচ্চতম স্তরের যে কোনো "বার্ব্বার" নর-নারীই এই সকল গুণের অধিকারী। গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান এই সবের জন্মদাতা।

সেকালের রোমাণ ধরণের একা স্ত্রী-পতিত্বকে মোলায়েম ভাবে বদলাইয়া জার্ম্মাণরা পরিবারে নারীর ইজ্জৎ বাড়াইয়া দিতেছিল কিসেব জোরে? সে কি তাহাদের গতানুতিক "জননী-বিধি"-নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীধর্ম্মের প্রভাবে নয়?

জার্ম্মাণি, উত্তর ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড এই তিন দেশের জমিদার-প্রধান 'ফিউদ-পন্থী' সমাজে জার্ম্মাণরা 'মার্ক-কমিউন' বা পল্লী-সমবায় প্রবর্ত্তন করিয়াছিল কিসের জোরে? যে প্রতিষ্ঠানে ভর করিয়া দরিদ্র কৃষাণরা মধ্যযুগের চরম "ভূমি-গোলামী"র যুগেও কোন মতে নিজ অধিকার বজায় রাখিয়া চলিতেছিল, যে প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না ছিল জার্ম্মাণ গোলামদের, না আছে বর্ত্তমান যুগের শহুরে মজুরদের, সেই পল্লী-সমবায়ের যৌথজীবন জার্ম্মাণরা রোমাণ মুল্লুকে আমদানি করিল কোথা হইতে? ইহাও কি তাহাদের "বার্ব্বার" স্বাতন্ত্র দান নয়?

তারপর জার্ম্মাণরা যে প্রাচীন জগতের ষোলকলার পূর্ণ গোলামীর ঠাঁইয়ে খানিকটা নরম দাস্য প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় তাহাও কি "বার্ব্বার"-সুলভ সাম্য ও ঐক্যের ফল নয়? মনে রাখিতে হইবে যে, গোষ্ঠী-প্রথায় কোনো দিনই পূরাপূরি গোলাম নামক শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই।

ফরাসী সোস্যালিষ্ট ফুরিয়ে বলেন যে, এই মোলায়েম দাস্য বা নিম্-গোলামী প্রথা নির্য্যাতিত জনগণের পক্ষে স্বাধীনতার সুযোগ বিবেচিত হইত। চাষীরা দলে দলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই প্রথার সাহায্যে ধাপে ধাপে স্বাধীন হইতে সমর্থ হইয়াছে।

পূরা গোলামীতে এই ধরণের ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন জগতে গোলামেরা বিদ্রোহের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু মধ্য যুগের সার্ফ্ বা ভূমি-গোলামের পক্ষে এইরূপে স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইয়াছিল।

জার্ম্মাণরা রোমাণ সমাজে যাহা কিছু নতুন জিনিষ দিয়াছে সবই "বার্ব্বার"-সুলভ গোষ্ঠী-জীবনের ফল। একমাত্র "বার্ব্বার" নর-নারীই একটা মরা জগৎকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে পারে। রোমাণ সাম্রাজ্য ভাঙিয়া তাহাকে দুরস্ত করিবার শিক্ষা জার্ম্মাণরা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী "বার্ব্বার" মণ্ডলের আবহাওয়ায় লাভ করিয়াছিল।

নবম অধ্যায়

"বার্ব্বার" জীবন ও "উৎকর্ষ"

অথাতঃ সুখ-জিজ্ঞাসা

প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক্, রোমাণ এবং জার্ম্মাণ এই তিন জাতিই বহুকাল ধরিয়া গোষ্ঠীধর্ম্ম অনুসারে জীবন ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক সমাজেই গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান আবার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য গোষ্ঠী-প্রথার জন্ম, ক্রমবিকাশ এবং পতন ভিন্ন ভিন্ন জনপদে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঘটিয়াছে।

কিন্তু মোটের উপর যে স্তরের মানব জীবন গোষ্ঠী-প্রথার যুগে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, তাহা "বার্ব্বার" অবস্থার পরিচায়ক। গোষ্ঠীর লোপ "বার্ব্বার" অবস্থার চরম বা উচ্চতম কোঠায় সাধিত হয়। তাহার পর মানব জাতি যে জীবনস্তরের বিকাশ সাধন করিয়াছে, তাহাকে "সিভিলিজেশ্যন" বা "উৎকর্ষের" অবস্থা বলা হইয়া থাকে। "উৎকর্ষে"র জন্ম এবং গোষ্ঠীর মৃত্যু সমসাময়িক।

"বার্ব্বার" সভ্যতা মরিল কি উপায়ে? এক কথায় ধন-দৌলতের ব্যবস্থা, সুখস্বচ্ছন্দতা সৃষ্টি করিবার কৌশল, এবং মানব সমাজের আর্থিক ক্রমবিকাশের ভিতর এই মৃত্যুর কারণ-গুলা চুঁড়িতে হইবে। "অথাতঃ সুখ-জিজ্ঞাসা" প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে নরনারী এমন এক স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছিল যে, তখন আর গোষ্ঠীর "স্মৃতিশাস্ত্রে" কাজ চালনো অসম্ভব।

এই কার্য্যকারণ-পরম্পরা বুঝিবার জন্য কাল মার্কস্ প্রণীত "কাপিটাল" (বা পুঁজি) নামক গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইবে। মর্গ্যান প্রণীত "এন্‌শ্যেণ্ট সোসাইটি" (বা প্রাচীন সমাজ) নামক গ্রন্থের তথ্যরাশি এবং সভ্যতাবিকাশের ব্যাখ্যা-প্রণালীও সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

"স্যাহ্বেজ" (বা "সহজ" অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ) যুগের মাঝামাঝি গোষ্ঠী-কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়। "বার্ব্বার" যুগের নিম্নতর স্তরে এই প্রথা একপ্রকার পাকিয়া উঠে। গোষ্ঠী-নীতির আর্থিক শিরদাঁড়াটা পাকড়াও করিতে হইলে সেই যুগের ধনদৌলতের নিয়মই আলোচনা করা দরকার।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের আদিম রূপ

আমেরিকার "রেড্‌স্কিন" ইণ্ডিয়ান সমাজে কি দেখিতে পাই? প্রত্যেক "ট্রাইব" বা জাতি সাধারণতঃ তুইটা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠীগুলাও নতুন নতুন গোষ্ঠীতে ভাঙিয়া যাইত। সাবেক গোষ্ঠী তখন "ফ্রাত্রী" নামে পরিচিত হইত। "ট্রাইব"ও নানা ট্রাইবে বিভক্ত হইয়া পড়িত। এই সকল নতুন "ট্রাইবে" পুরাণো গোষ্ঠীর আত্মীয়ও থাকিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রাইবগুলা "ফেডারেশ্যন" সূত্রে "সংযুক্ত-ট্রাইবে" সম্মিলিত হইত।

এই গেল "ইণ্ডিয়ান"দের শাসন-পদ্ধতির কাঠাম। জনগণের ভিতর যে সকল প্রশ্ন উঠিত, সে সব মীমাংসা করিবার পক্ষে এই কাঠাম বেশ উপযোগীই বিবেচিত হইত। বাহিরের লোক-জনের সঙ্গে সমস্যা উঠিলে তাহার মীমাংসা হইত লড়াইয়ে

এই সকল লড়াইয়ের ফলে বিজিত জাতিগুলা লোপাট হইয়া যাইত। সে যুগে বিজেতারা বিজিত জাতিকে "পরাধীন" বা গোলাম করিয়া রাখিতে জানিত না। গোষ্ঠী-প্রথার মহত্ত্ব এবং দুর্ব্বলতাই এইখানে। মনিব-দাস সম্বন্ধ এই প্রতিষ্ঠানে সম্ভবপর নয়।

অধিকন্তু তখনকার দিনে দাবীদাওয়া, কর্ত্তব্য অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধও ছিল না। সার্ব্বজনিক কাজে কোনো ব্যক্তির "অধিকার" আছে, অথবা গোষ্ঠীর কোনো লোককে বিদেশী কেহ খুন করিলে গোষ্ঠীর লোকদের পক্ষে তাহার প্রতিহিংসা লওয়া "কর্ত্তব্য",—এই ধরণের চিন্তা গোষ্ঠীধর্ম্মে ঠাঁই পাইত না। খাওয়া, ঘুমানো, শিকার করা ইত্যাদি বিষয়ে নরনারীর কর্ত্তব্য বা এক্‌তিয়ার আছে কিনা—এই সকল কথা যেমন "ইণ্ডিয়ান" মগজে বসিত না, সেইরূপ সামাজিক লেনদেন সম্বন্ধেও "অধিকার-সমস্যা" তাহাদের মাথার বহির্ভূতই ছিল। তাহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন "শ্রেণীতে" কোনো সমাজের লোক ভাগাভাগি থাকিতে পারে ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিত না।

এই ধরণের সমাজ সম্ভবপর হইল কি করিয়া? লোকসংখ্যা ছিল কম। "ট্রাইবে"র (জাতির) অধীনে যেটুকু জনপদ, সেইটুকুর ভিতরেই তাহাদের বসবাস। এই জনপদের চারিধারে থাকিত শিকারের মাঠ। তাহার পর ছিল এক সুবিস্তৃত বন। এই বনের সাহায্যে দুই পরস্পর-স্বাধীন (এবং পরস্পর-শত্রু) জাতিকে তফাৎ করিয়া রাখা হইত। বনটা "উদাসীনীকৃত" ভূখণ্ড। কোন জাতিরই ইহাতে একচেটিয়া অধিকার থাকিত না।

শ্রম-বিভাগ ছিল বেশ আদিম ধরণের। স্ত্রীপুরুষ দুই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজ সামলাইত। পুরুষেরা লড়াই করিত, শিকারে যাইত, খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিত। ঘরকন্নার কাজে থাকিত মেয়েরা। পোষাক তৈয়ারি করাও ছিল মেয়েদেরই কাজ। নিজ নিজ এলাকায় পুরুষ নারী পরস্পর স্বাধীন। বাহিরের কর্ত্তা পুরুষ, ঘরের কর্ত্রী স্ত্রী। পুরুষেরাই আবার পুরুষোচিত কাজকর্ম্মের উপযোগী যন্ত্রপাতির মালিক থাকিত। গৃহস্থালীর আসবাবপত্র ছিল মেয়েদের "স্ত্রীধন।" গৃহস্থালী চলিত "যৌথ" নিয়মে। বহুসংখ্যক পরিবারের সমবায়ে ঘরকন্না চলিত একসঙ্গে। কুইন শার্লট্ দ্বীপের কোনো গৃহস্থালীতে ৭০০ নরনারীর ব্যবস্থা হইত। স্লুটকা জাতির বিধানে গোটা জাতিই এক গৃহস্থালীর অন্তর্গত থাকিত। যা কিছু যৌথরূপে উৎপন্ন হইত এবং ব্যবহৃত হইত সবই "যৌথ সম্পত্তি" বিবেচিত হইত। বাড়ী, বাগান, নৌকা সকল ধনই সাধারণ বা সার্ব্বজনিক।

বর্ত্তমান যুগের কানুনবিৎ নৈয়ায়িক এবং ধনবিজ্ঞান-বেত্তারা বলেন যে, "নিজের উপার্জ্জন করা সম্পত্তি" নামক বস্তু "উৎকর্ষশীল" মানবেরা আধুনিক কালে সৃষ্টি করিয়াছে। এই মত একদম ভিত্তিহীন। বাস্তবিক পক্ষে "নিজে উপার্জ্জন করা" কথাটা একমাত্র সেই মান্ধাতার আমলের গোষ্ঠীনিয়ন্ত্রিত যৌথ সম্পত্তির যুগসম্বন্ধেই খাটে। বর্ত্তমান জগতের জুয়াচোরেরা একটা মিথ্যা রটাইয়া নব্য পুঁজিসম্পত্তিকে "নিজ উপার্জ্জন করা" দৌলতের গৌরব প্রদান করিতেছেন।

"জানোআর-চাষে" আর্থিক বিপ্লব

কিন্তু মানবসমাজ সর্ব্বত্র "ইণ্ডিয়ান"দের এই আদিম আর্থিক অবস্থায় বেশি দিন রহে নাই। এশিয়ায় পোষমানা জানোআর পাওয়া গিয়াছিল। বুনো বাদ শিকার করা হইত। অন্যান্য গাভীকে ঘরে রাখা হইত বাছুর বিয়াইবার জন্য আর দুধ দেওয়াইবার জন্য। "আর্য্য", "সেমিট" এবং "তুরানিয়ান" জাতিও "জানোআর-চাষে" লাগিয়া গিয়াছিল।

মানব জাতির ভিতর এইখানে জগতের সর্ব্বপ্রথম শ্রমবিভাগ বা সামাজিক শ্রেণীভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে। জানোআর পুষিয়া যে সকল নরনারী সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিতেছিল তাহারা অন্যান্য "বার্ব্বার" সমাজ হইতে আর্থিক হিসাবে তফাৎ হইয়া পড়িতেছিল। ইহাদের পরিশ্রমের ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত। অধিকন্তু অনেক নতুন নতুন রকমের সামগ্রীও জানোআর-চাষীদের আর্থিক জীবনের ফল।

"ইণ্ডিয়ান" সমাজে আর এশিয়ার সমাজগুলায় প্রভেদ বাড়িয়া যাইতে থাকিল। দুধ, মাংস, জানোআরের খোল, চামড়া, ছাগলের লোম, পশমের দ্রব্য, বোনা কাপড়চোপড় ইত্যাদি বিচিত্র জিনিষ পত্র তৈয়ারি হইতেছিল। তাহার ফলে মালে মালে বিনিময় সম্ভবপর হইতেছিল। বিনিময় এই যুগের এক বিশিষ্ট আর্থিক তথ্য।

পূর্ব্ব যুগেও বিনিময় চলিত সন্দেহ নাই। পাথরের যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে যাহারা ওস্তাদ তাহারা এই গুলার বদলে অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। "নব্য-প্রস্তর" যুগের কারখানা

বা কামারশালা জগতের নানা স্থানে আবিস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কারখানার তৈয়ারী মাল গোষ্ঠীর বাহিরে যাইত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু জানোআর-নিষ্ঠ "বার্ব্বার"দের সমাজে বিনিময় প্রথা গোষ্ঠী ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ট্রাইবের (জাতির) ভিতর মালের আদান-প্রদান নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। প্রথম প্রথম ট্রাইব-নায়কেরা গোটা ট্রাইবের প্রতিনিধিরূপে মাল অদলবদল করিত। পরে যখন জানোআরগুলা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় তখন অবশ্য মাল-বিনিময় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বাধীনভাবেই চলিত।

বিনিময়ের প্রধান জিনিষ ছিল জানোআর। কাজেই নর-নারীরা যে সকল জিনিষ তৈয়ারী করিত অথবা বিনিময়ের জন্য হাজির করিত সবই জানোআরের মাপকাঠিতে বিচার করা হইত। অর্থাৎ জানোআরই ছিল সার্ব্বজনিক তুলনাযন্ত্র বা মূল্যনিরূপণের উপায় অর্থাৎ "মুদ্রা"।

কৃষি ও শিল্পে আবিস্কার

"জানোআর-চাষ" এশিয়ার "বার্ব্বার"দের নিম্নতম স্তরের আর্থিক অনুষ্ঠান। ফলের চাষ বা গাছের চাষ এবং শস্যের চাষ কিছু পরবর্ত্তী কালে সুরু হয়। জানোআর পুষিবার জন্য তুরাণ-মুল্লুকের লোকেরা শীতের খোরাক জোগাইতে বাধ্য হইত। সেখানে শীতকাল অনেকদিন থাকে এবং কড়া ভাবে দেখা দেয়। কাজেই পাহাড়ী ময়দানে এবং ক্ষেতে আবাদ চালানো দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

ভুরাণী পাহাড়ের মতনই কৃষ্ণসাগরের উত্তরবর্ত্তী "ষ্টেপ" মাঠের অবস্থা, এইখানেও জানোআর-সেবার জন্যই কৃষিকার্য্যের জন্ম হইয়াছিল। শস্যগুলা পশুর খাদ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইবামাত্র এই সব মানুষের সেবায়ও লাগিতে থাকে।

চষা জমি ছিল প্রথম প্রথম ট্রাইবের সম্পত্তি। ট্রাইবের নিকট হইতে এই জমি পায় গোষ্ঠীরা পরে। গোষ্ঠী এইগুলা ভাগাভাগি করিয়া দিয়াছিল পরিবারের ভিতর। শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তির হাতে আসিয়া এইগুলা ঠেকিত। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কেহ জমিগুলা "নিজস্বে" পরিণত করিতে পারিত না। ভোগ-স্বত্বে মাত্র ছিল তাহাদের অধিকার।

এই যুগে শিল্পের আবিষ্কার সাধিত হয় দুই দিকে। প্রথমতঃ, তাঁতের সাহায্যে "বার্ব্বারে"রা কাপড় বুনিতে শেখে। দ্বিতীয়তঃ, ধাতু গলাইয়া ধাতুর মাল তৈয়ারী করায়ও তাহাদের মাথা খেলিতে থাকে। তামা, টিন এবং এই দুইয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত পিতল ছিল তাহাদের প্রধান ধাতু। পিতল দিয়া অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী হইত কিন্তু পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তখনও উঠিয়া যায় নাই। একমাত্র লোহার যন্ত্রপাতির পক্ষেই পাথরের ঠাঁই অধিকার করা সম্ভব। কিন্তু লোহার ব্যবহার সে যুগে আবিষ্কৃত হয় নাই। সোনা রূপার রেওয়াজ তখন ছিল গহনার জন্য। তামা পিতল ইত্যাদির চেয়ে এই দুই ধাতুর কদরও বেশি ছিল।

"জানোআর-চাষে", কৃষিকর্ম্মে, গৃহশিল্পে—সকল পথেই ধনদৌলত বাড়িয়া যাইতেছিল। জীবন ধারণের জন্য যা কিছু দরকার মানুষেরা পরিশ্রমের দ্বারা তাহার চেয়ে বেশি সৃষ্টি করিতেছিল। প্রত্যেক লোকের হিস্যায় দৈনিক খাটুনির পরিমাণও বাড়িয়া

গিয়াছিল। নতুন নতুন শ্রমশক্তির আবশ্যকতা দেখা দিয়াছিল। লড়াইয়ের বন্দীরা গোলামভাবে এই নতুন শ্রম জোগাইত। এতদিনে সমাজে দুই শ্রেণীর লোক উপস্থিত হইল। এক শ্রেণী মনিব, অপর শ্রেণী দাস। এক শ্রেণী অপরের পরিশ্রমের ফলের উপর বিনা মেহনতেই ভাগ বসায়। অপর শ্রেণী পরের জন্য গতর খাটিয়া নিজের রক্ত জল করিয়াই মরে।

এই যুগেই জানোআরের পালগুলা গোষ্ঠী বা জাতির সমবেত আওতা হইতে পরিবার-নায়কদের হাতে আসে। কিন্তু কি উপায়ে স্বত্ব-নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় না। তবে এইখানে একটা নতুন আর্থিক তথ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। এইরূপ বুঝিয়া রাখা উচিত।

পুরুষ প্রাধান্যের সূত্রপাত

খাওয়াপরার জিনিষ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ছিল পুরুষের কাজ। পুরুষেরাই আবার এই সব "পুরুষোচিত" জীবনের সকল কিছুরই মালিক। কাজেই জানোআর এবং জানোআররূপ যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈয়ারী সকল ধনদৌলতেরই মালিক হইত পুরুষেরা। সুতরাং গোলাম এবং ভোগের পর যা কিছু সম্পত্তি বেশি থাকে সবই পুরুষের নিজস্বে পরিণত হইতে থাকিল।

মেয়েরা ছিল ঘরের কাজের কর্ত্রী এবং ঘরোয়া "নারী-জনোচিত" আসবাবপত্রের মালিক। পুরুষোচিত ধনদৌলতে তাহাদের "ভোগ-স্বত্ব" থাকিত মাত্র। কাজেই "বার্ব্বার" যুগে যখন "ধন-বৃদ্ধি" হইতে থাকিল আর গোলাম, "উদ্বৃত্ত" সম্পত্তি ইত্যাদি "নানারূপে" দৌলত দেখা দিল তখন নারীর অবস্থা

ক্রমেই নামিতে সুরু করিল। "স্যাভেজ" বা সহজ যুগে যখন লড়াই আর শিকার করাই পুরুষের প্রধান কাজ ছিল তখন ধনদৌলতের মাত্রা ছিল কম। কাজেই তখন মেয়ে-পুরুষে ধনের ক্ষেত্রে উনিশ বিশ দেখা যাইত না। বস্তুতঃ তখন মেয়েরাই ছিল পুরুষদের চেয়ে বড়।

এখন মেয়ে-পুরুষের সম্বন্ধে "যুগান্তর" সৃষ্ট হইল। ঘরের রাণী স্ত্রী আর বাহিরের রাজা পুরুষ,—এই নীতিই চলিতেছিল সত্য। কিন্তু ইতিমধ্যে সমাজে ধনদৌলতের বৃদ্ধি হওয়ায় আর সেই ধনদৌলতের অধিকাংশই "বাহিরের কাজ" হওয়ায় সমাজে পুরুষের ইজ্জদই বড় বিবেচিত হইতে থাকিল। তাহার বলে পরিবারের ভিতরই স্ত্রীধন দাঁড়াইয়া গেল নগণ্য এবং পুরুষই হইল সর্ব্বেসর্ব্বা। বাস্তবিক পক্ষে ঘরোআ কাজটা বিশেষ কিছু বিবেচিতই হইত না।

সেই যুগে পুরুষ-প্রাধান্য এবং নারী-দাসত্ব সুরু হইয়াছে। নারী যতকাল বাহিরের কাজে যোগ দিতে অসমর্থ ততকাল তাহার স্বাধীনতা সুদূর-পরাহতই রহিয়াছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া বাহির হইতে নারীকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। নারীকে ঘরের কাজে আট্‌কাইয়া রাখিয়া পুরুষকে বাহিরের কাজে একচেটিয়া এক্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ফ্যাক্‌টরি-নিয়ন্ত্রিত শিল্পের আমলে মেয়েরা প্রথম সামাজিক অর্থাৎ বাহিরের কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে যোগ দিতে সমর্থ হইতেছে। এমন কি ঘরোআ অর্থাৎ তথাকথিত নারীজনোচিত কাজগুলাও অনেকটা সামজিক কাজে পরিণত হইতেছে। কাজেই স্ত্রী-স্বাধীনতার মামলা এতদিন পরে মাথা তুলিতে পারিয়াছে।

পুরুষ পরিবারে একচ্ছত্র রাজা হইয়া বসিল। এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইত যে, "জননী-বিধি"র ঠাঁইয়ে "পুরুষ-বিধি" (অর্থাৎ পুরুষানুসারে বংশানুক্রম এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার) কায়েম হওয়ায় গোটা সমাজেই পুরুষের আধিপত্য এই যুগে চলিতেছিল। তাহার উপর "জোড় পরিবার" সুলভ "অবাধ যোনিসংস্রবের" (অতএব স্ত্রী-স্বাধীনতার) দিন আর ছিল না। এক-পত্নী-পতিত্বের প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাহার ফলে যোনি-সংশ্রব বিষয়ে নারীর সংযম এবং পুরুষের যথেচ্ছাচারই প্রকারান্তরে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুরাণো গোষ্ঠী-নীতির বিরুদ্ধে এই প্রথা এক প্রবল আঘাত দিয়াছে। সকল তরফ্ হইতেই জগৎ পুরুষ-প্রাধান্যে অভ্যস্ত হইতে থাকিল।

লোহার আর্থিক প্রভাব

পরে আসিল লোহা আবিস্কারের যুগ। লোহার তলোআর, লোহার হাল এবং লোহার কুড়াল ইত্যাদি যন্ত্র মানুষের দাসে পরিণত হইল। যে সকল কুদ্‌রত্তি বা কাঁচা মাল আর্থিক ইতিহাসে যুগান্তর ঘটাইয়াছে, তাহার ভিতর লোহা সর্ব্বপ্রধান। আর আলু ছাড়া বোধ হয় লোহাই জগতের শেষ যুগান্তর-সাধক দ্রব্য।

লোহার প্রভাবে মানুষ কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার সাধন করিতে পারিয়াছে, বন কাটিয়া চাষ আবাদের ভূমি তৈয়ারী করিতে পারিয়াছে। লোহার প্রভাবে মানুষ পাথরের যন্ত্রপাতি ছাড়িয়া তীক্ষ্ণতর যন্ত্রপাতির সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু জগতে লোহার রেওয়াজ বড় শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে নাই। প্রথম প্রথম লোহার

অস্ত্রশস্ত্র পাথরের চেয়ে নরম হইত। "হিল্ডেব্রাণ্ড" গাথায় পাথরের যন্ত্রপাতিই চলিতেছে। এমন কি ১০৬৬ সালে হেষ্টিংসের যুদ্ধক্ষেত্রেও ইংরেজরা পাথরের কুড়াল লইয়াই লড়িতে গিয়াছিল।

যাহা হউক লোহার তৈয়ারী দ্রব্যে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতে থাকিল। জাতি বা জাতিসঙ্ঘ নগর নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত হইল। পাথর বা টালির ঘর পাথরের দেওয়ালে ঘেরা শহর,—এই ছিল সে যুগের বাস্তরীতি। বয়ন কার্য্য, ধাতু শিল্প ইত্যাদি সকল প্রকার আর্থিক প্রচেষ্টায় নিত্য নতুন শাখা প্রশাখা বাহির হইতেছিল। স্বকুমার কারুকার্য্যও প্রত্যেক শিল্পেরই সহচর ছিল। কৃষিক্ষেত্রে উঠিত একমাত্র শস্য নয়। মদ তৈয়ারী করিবার সব্জীও উঠিতেছিল। মানব জাতি ধন-দৌলতের হিসাবে প্রাচুর্য্য ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইল।

লোহার যুগের প্রথম প্রথম আর একটা বড় কথা এই যে, কৃষিকার্য্য হইতে শিল্পকর্ম্ম পূরাপূরি আলাদা হইয়া গিয়াছিল। ধনসৃষ্টির নেশায় পড়িয়া মানুষ নূতন নূতন মজুর ঢুঁড়িতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে গোলামী আবিস্কৃত হইয়াছে। সেই প্রথাই এখন আরও ফলিয়া উঠিল। চাষআবাদে কারখানায় সর্ব্বত্রই গোলামের শ্রম এই যুগে লক্ষ্য করিবার বিষয়। চাষের ফলে আর শিল্পের ফলে অদলবদল পূরামাত্রায়ই সাধিত হইতেছিল। এক কথায় বিনিময়ের যুগে এখন জোয়ার চলিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এমন কি সাগর ডিঙাইয়া পর্য্যন্ত জীবন-স্রোত দেখাইতেছে। সাবেক কালের জানোআর-মুদ্রা ক্রমে ক্রমে মান্ধাতার আমলে পরিণত হইতেছিল। তাহার ঠাঁইয়ে আসিয়া

দাঁড়াইতেছিল ধাতুর মুদ্রা। সোণারূপা ওজন হিসাবে,—মোহর হিসাবে নয়,—বিনিময়ের মাপকাঠি বিবেচিত হইতেছিল।

এতদিন সমাজে চলিতেছিল মনিব-গোলাম ভেদ। এখন হাজির হইল ধনী-দরিদ্র ভেদ। পরিবার-নায়কদের সম্পত্তি-সাম্য আর বজায় ছিল না। উনিশ বিশ, কম বেশি, উঁচু নীচু দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার-সমবায় উঠিয়া যাইতেছিল। কাজেই গোটা সমাজের জন্য যৌথ চাষ আর যুগোপযোগী ছিল না। চাষবাসের জমিগুলা প্রত্যেক পরিবার নিজস্বরূপে পাইতে থাকিল। প্রথম প্রথম এই নিজস্বভোগ চালত কিয়ৎ-কালের জন্য। পরে নিজস্বগুলা স্থায়ী পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়। "মনগেমি" বা এক-পত্নী-পতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বপ্রথা সমাজে পাকা ঘর করিয়া বসে।

গোষ্ঠী-নীতির ক্রমিক লোপ

ধনবৃদ্ধি এবং লোকবৃদ্ধি এক সঙ্গে চলিতেছিল। কাজেই দুস্‌মন হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও বাড়িতেছিল। নিকট-আত্মীয় স্বরূপ ট্রাইব বা জাতিগুলা এই কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। জাতিগুলার সম্মেলনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জনপদ একত্রে বিশাল দেশে পরিণত হইয়াছিল। সমর-সর্দ্দার—"রেক্‌স" নামেই হউক, বা "বাসিলিউস" নামেই হউক অথবা "থিউদান্‌স্‌" নামেই হউক,—সর্ব্বত্রই অতি প্রধান বিবেচিত হইতেছিল।

যেখানে যেখানে সার্ব্বজনিক-সভা নামক প্রতিষ্ঠান ছিল না, সেই সকল স্থানে এই কেন্দ্র কায়েম করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সমর-সর্দ্দার (বা রাজা) এবং সর্দ্দার-পরিষৎ ত

আছেই। এই তিন কেন্দ্রে মিলিয়া সাবেক কালের গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের স্থান পূরণ করিল। এই প্রথাকে রাজতন্ত্র না বলিয়া সামরিক-গণতন্ত্রই বলা কর্ত্তব্য। জনগণের সাম্য তখনও বজায় ছিল।

"সামরিক" বলা হইতেছে এই জন্য যে লড়াই সে যুগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি বিশেষ। "বার্ব্বারে"রা পরস্পরের ধনদৌলতের উপর লোভ করিতেছিল। সাবেক কালের লড়াই ছিল গোষ্ঠী ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন প্রকার দুরাচরণের সাজা বিশেষ। কিন্তু এই যুগে লড়াই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল লুটপাটের ফিকির।

নগরগুলার দেওয়াল সেই যুগেই ডাকাইত-বীরদের বিরুদ্ধে সাক্ষী। নগর-দুর্গের চারিধারকার খালের ভিতর গোষ্ঠী ধর্ম্মের "ভাই ভাই এক ঠাঁই" নীতির কবর দেখিতে হইবে। আর দুর্গ-চূড়ার মাথাগুলা গিয়া ঠেকিতেছিল "উৎকর্ষের" যুগের উষায়।

লড়াইয়ের ফলে সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থায়ও নবরূপ দেখা দেয়। সমর-সর্দ্দার (বা রাজা) এবং তাহার পেটোআ স্বরূপ সেনাপতি ও অন্যান্য রণনায়ক দেশের ভিতর জবরদস্ত হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম সর্দ্দার বাছাই হইত কোন নির্দ্দিষ্ট পরিবার হইতে। পরে এই পদ বংশানুক্রমিক দাঁড়াইয়া যায়। বংশগত "রাজ্য" লাভ জনগণের পছন্দসই ছিল না। কিন্তু কালক্রমে একটু একটু সহিতে সহিতে তাহাদের হাড় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল। তাহারা বেশি কিছু উচ্চবাচ্য করিলে রাজপুত্র স্বয়ংই গদিতে আসিয়া বসিত। রাজতন্ত্র, কৌলীন্য, আভিজাত্য ইত্যাদি অনুষ্ঠান জন্মের অধিকার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হইল। বিলকুল এক বিপরীত

প্রতিষ্ঠান তাহার স্থান অধিকার করিল। গোষ্ঠীর আমলে ট্রাইব বা জাতি এবং জাতিসঙ্ঘ ছিল স্বাধীনতা বিকাশ এবং স্বাধীন শাসনের যন্ত্র। সেই কেন্দ্র এখন হইল পরজাতি-পীড়ন এবং পরের ধন লুটিয়া আনিবার কৌশল।

গোষ্ঠীর কেন্দ্রগুলা আগে ছিল সার্ব্বজনিক গোষ্ঠীমতের সেবক। এখন হইল সেইগুলা "স্ব"-তন্ত্র শাসনকেন্দ্র। তাহার প্রভাবে স্বগোষ্ঠীর লোকজনই শোষিত এবং নির্য্যাতিত হইতে থাকিল।

সমাজে ধনদৌলতের লোভ না ঢুকিলে এই যুগান্তর ঘটিত না। কেন না এই লোভেই গোষ্ঠী-সমাজে ধনীনির্ধন ছোট-বড় ভেদ সৃষ্ট হয়। কার্ল মার্কস্ বলেন ঃ—"সম্পত্তির অসাম্যেই সাবেক কালের যৌথ-গোষ্ঠী-গত-স্বার্থের ঐক্য ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহার স্থানে দেখা দিয়াছিল স্বার্থের দলাদলি, নানা শ্রেণীর লোকের নানা স্বার্থ।"

এই যুগান্তর সাধনের পথে আর একটা কারণও কাজ করিয়াছে। সে গোলামী বা দাসত্ব প্রথা। এই প্রথার প্রভাবে গায়ে খাটিয়া খাওয়া সমাজের স্বাধীন লোকের মহলে নিন্দনীয় বিবেচিত হইত। ডাকাইতি করিয়া পরের ধন লুটিয়া খাওয়া মেহনৎ করিয়া অন্ন সংস্থান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর,—এইরূপ চিন্তা জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানে ঘুণ ধরিয়াছিল।

বিনিময় ও শ্রমবিভাগ

গোষ্ঠী ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে "বার্ব্বার" ও "উৎকর্ষের" যুগের "সন্ধিক্ষণ" উপস্থিত। "উৎকর্ষ" বা "সিহ্বিলিজেশানে"র স্তরে

মানব-সমাজ,পা দিতে দিতে এক নতুন ধরণের শ্রমবিভাগ প্রকটিত হইয়াছিল।

"বার্ব্বার" সভ্যতার প্রথম স্তরে ধনদৌলত উৎপন্ন হইত একমাত্র সমাজের লোকের স্বভোগের জন্য। ভোগের পর "উদ্বৃত্ত" কিছু থাকিত না। থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ। এই যৎকিঞ্চিৎ মাল অন্যান্য সমাজের ধনদৌলতের সঙ্গে অদলবদল করা হইত। মতভেদ ও বিনিময় ছিল নেহাৎ আদিম বা নগণ্য।

উচ্চতর স্তরে উঠিয়া "বার্ব্বার" নরনারী জানোআর-ধনের মালিক হিসাবে বহুবিধ এবং প্রচুর পরিমাণে "উদ্বৃত্ত" মাল সৃষ্টি করিত। এই সকল "উদ্বৃত্ত" মাল লইয়া যাইয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত (গোধনহীন) জাতিদের সঙ্গে বিনিময়ের ব্যবস্থা করিত।

"বার্ব্বার" সভ্যতার উচ্চতম স্তরে বিনিময় এবং শ্রমবিভাগ আরও বিস্তৃত এবং গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষি এবং শিল্প এই দুই শ্রেণীর আর্থিক প্রচেষ্টায় সেই স্তরের লোক ভাগাভাগি থাকিত। স্বভোগের জন্য মাল সৃষ্টি করা তখন আর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। "বিনিময়"ই ধনোৎপাদনের কেন্দ্রস্থলে দেখা দিতেছিল।

তাহার পর "উৎকর্ষের" যুগ। এই যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী "বার্ব্বার" স্তরগুলার প্রতিষ্ঠানসমূহ সুদৃঢ় হইতে থাকে। অধিকন্তু শ্রম-বিভাগ এবং বিনিময়-প্রথা শহর ও পল্লী এই দুই শ্রেণীর কেন্দ্রে বিশিষ্টতা লাভ করে। শহর ও পল্লীর পরস্পর সম্বন্ধে ইতিহাস স্তর দেখাইয়াছে। প্রাচীনতর—গ্রীক্-রোমাণ-যুগে শহর ছিল পল্লীর জীবন-নিয়ন্তা। পরবর্ত্তী কালে—মধ্যযুগে পল্লী বা মফঃস্বলই শহরের উপর প্রভাব বিস্তার করিত।

"উৎকর্ষের" যুগে আর এক শ্রমবিভাগ প্রকটিত হয়। ধনের উৎপাদনকারী—অর্থাৎ কৃষক ও শিল্পীরা হইল এক শ্রেণী। আর যাহারা ধনের উৎপাদনে যোগ দেয় না, পরন্তু ধনের বিনিময় লইয়াই জীবন কাটায়, এই ধরণের এক শ্রেণীর লোক সমাজে গড়িয়া উঠিল। এইরূপ বিনিময়-সাধক লোককে বলে ব্যাপারী, ব্যবসাদার বা বণিক।

জগতে এতদিন যে সকল শ্রেণীবিভাগ চলিতেছিল—তাহাতে ধনের "উৎপাদনকারী"দের ভিতরই দল, জাতি ইত্যাদি কেন্দ্র সৃষ্টি হইতেছিল। ধন-স্রষ্টাদের কেহ হইত পরিচালক, কেহ হইত হুকুম তামিল করিবার লোক। কেহ বা বড় বড় ধনসৃষ্টির মালিক, কাহার তাঁবে বা অল্প মাত্র মাল তৈয়ারী হইত; ইত্যাদি। কিন্তু বণিক, ব্যবসায়ী বা ব্যাপারী শ্রেণীর উৎপত্তিতে সমাজে একদম নতুন লক্ষণ উপস্থিত হইল। সমগ্র ধনস্রষ্টা শ্রেণীটাই এই নতুন শ্রেণীর লোকের তাঁবে আসিয়া পড়িল। অথচ ইহারা নিজে ধনসৃষ্টির কোনো কাজে বহাল নয়।

এই লেনদেন সহায়ক বিনিময় সাধক বণিক শ্রেণীর কার্য্য বিচিত্র। ইহারা দুই ভিন্ন ভিন্ন ধনস্রষ্টার মধ্যে আনাগোনা করিয়া প্রত্যেককে সাহায্য করিবার ছলে পরস্পরকে পরস্পর হইতে আলাদা করিয়া রাখে। ইহারাই প্রত্যেক ধনস্রষ্টার মাল দুনিয়ার দেশ বিদেশে বিনিময়ের জন্য পাঠাইয়া নিজেদেরকে সমাজের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বেশি প্রতাপশালী করিয়া তুলে।

ইহাদের মেহনৎ সামান্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই "পরগাছা"গুলা ধনস্রষ্টাদের মেহনতের উপর চড়াহারে ভাগ বসাইয়া থাকে। এইরূপে "বিনাশ্রমে" ধনের অধিকারী জাতি

নিজের ভুঁড়ি মোটা করিতে করিতে সমাজের ধনস্থষ্টি কাণ্ডটাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতে সমর্থ হয়।

ফলতঃ শিল্প কারখানায় কাজকর্ম্মে প্রত্যেক কয়েক বৎসর পর পর এক একবার মহা দুর্যোগ ঘটাইয়া তুলা এই "পরের ধনে পোদ্দার" মহাশয়দের কৃতিত্ব। "উৎকর্ষে"র যুগের আর্থিক তথ্য সমূহের ভিতর এই সব দুর্যোগ এক বড় কথা। এই অবশ্য আধুনিকতম কালের চরম বিকাশ সম্বন্ধে খাটে।

মুদ্রার আবির্ভাব

"উৎকর্ষে"র যুগে প্রথম প্রথম বণিক শ্রেণী সবে মাথা তুলিয়াছিল মাত্র। তখন তাহারা তাহাদের চরম পরিণতির প্রতাপ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। কিন্তু তখনই তাহারা নিজ ক্ষমতা খাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিল ঢের। সেই সময় ধাতুর মুদ্রা প্রথম দেখা দেয়। এক "অদ্ভুত চীজ্" সকল ধনের ধন স্বরূপ এই মুদ্রা অনেকটা যাতুমন্ত্রের মতন কাজ করিত; যাহারই হাতে মুদ্রা থাকুক না কেন সে অন্যান্য সকল লোকের ধনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অধিকারী। বলা বাহুল্য এই বস্তু বেশি পরিমাণে থাকিত বণিক জাতিরই পেটরায়।

মুদ্রার মালিক বণিকেরা অন্যান্য ধনের স্রষ্টাদিগকে নিজ মুঠার ভিতরে রাখিতেছিল। মুদ্রার ধ্যান, মুদ্রার পূজা, মুদ্রার সেবা অন্যান্য ধনীদের পক্ষে একটা নিত্যকর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। কেননা মাল না বেচিলে তাহাদের গত্যন্তর নাই। বণিক শ্রেণী এই অবস্থা বেশ বুঝিত এবং ধনীদিগকে নাকের জলে চোখের জলে বুঝাইয়াও ছাড়িত।

মাল বেচাকেনাই মুদ্রার একমাত্র কাজ নয়। মুদ্রা কর্জ্জ দেওয়া কর্জ্জ লওয়াও সংসারী লোকের মামুলি রেওয়াজ। কাজেই সুদের ব্যবসাও বণিক মহলে একটা মোটা ব্যবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সুদখোরদের কবলে ঋণগ্রস্ত নরনারীর কিরূপ নির্য্যাতন সম্ভব তাহা প্রাচীতম গ্রীক্ এবং রোমাণ কানুনে ধারায় ধারায় লিখিত আছে। "উৎকর্ষে"র যুগ এইরূপেই জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

মালগুলা—পশুজ, কৃষিজ, শিল্পজ—ছিল ধনদৌলতের প্রথম রূপ। তাহার পর অথবা সঙ্গে সঙ্গে গোলাম নরনারী ধনদৌলতের তালিকায় ঠাঁই পায়। এই দুই প্রকার ধনদৌলত "উৎকর্ষে"র যুগে মানুষকে প্রাচুর্য্য ভোগের সুযোগ দিয়াছিল। সেই প্রাচুর্য্যই আরও ফুলিয়া উঠে মস্ত মস্ত জমিজমার দখল ফলে।

ব্যক্তিগত ভূমিসম্পত্তি "উৎকর্ষে"র যুগের এক বড় প্রতিষ্ঠান। গোষ্ঠী বা জাতির এক্তিয়ার এবং ভোগস্বত্ব উঠিয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিরা যৌথসঙ্ঘের আজ্ঞা হইতে মুক্তি লাভ করিল। ভোগ এবং অধিকার দুইই পুরাপুরি ব্যক্তির হাতে আসার ফলে জমি-জমা কেনাবেচা করিবার ক্ষমতাও তাহার অধীন হইল।

এতদিন জমির সঙ্গে গোষ্ঠীর জাতির (এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি মাত্রেরই) একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। সেই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলা নরনারীর পক্ষে অসাধ্য বিবেচিত হইত। কিন্তু জমি-জমা সঙ্ঘ হইতে স্বাধীন হইবামাত্রই ব্যক্তিও জমিজমা হইতে মুক্ত হইল। গোষ্ঠী হইতে স্বাধীনতা লাভ করা এবং জমি হইতে স্বাধীনতা লাভ করা দুইই ব্যক্তির পক্ষে এক সঙ্গে ঘটিয়াছে। দুইই "উৎকর্ষে"র যুগের আর্থিক তথ্য।

মুদ্রার প্রভাবে জমিজমা কেনাবেচা সহজসাধ্য ছিল। কর্জ্জ দেওয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লগ্নি কারবার এবং বন্ধকি রাখাও প্রচলিত ছিল। আথেনিয় সমাজে জমি বন্ধক রাখার প্রথা সুবিদিত। জমিজমার স্বাধীনতা লাভ করার মতলবই এই। এক-পত্নী-পতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যেমন "হেতেরে" প্রথা এবং বেশ্যাবৃত্তি স্বাভাবিক রূপেই দেখা দিয়াছে সেইরূপ গোষ্ঠী হইতে এবং জমি হইতে স্বাধীন হইবামাত্রই ব্যক্তি জমি লইয়া ব্যবসা সুরু করিয়াছে। তাহারই এক লক্ষণ জমি বন্ধক।

নানা দিকে ধন বৃদ্ধি হইতে থাকিল। আর ধনবৃদ্ধির ফল গুলা আসিয়া মজুত হইতে লাগিল একটা ছোটখাটো দল বা শ্রেণীর হাতে। এই ছোট নতুন ধনীর দল সাবেক কালের গোষ্ঠী-কুলীনদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া ছাড়িল। কি আথেনিয়, কি রোমাণ, কি জার্ম্মাণ সকল সমাজেই পুরাণো অভিজাতদের ঠাঁইয়ে নবীন কুলীন উপস্থিত হইল।

অপর দিকে সমাজের অবশিষ্ট নরনারী শোষিত ও নির্য্যাতিত হইতে থাকিল। তাহাদের দারিদ্র্য ধাপে ধাপে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। গ্রীসে এই সঙ্গে গোলাম নির্য্যাতন দেখা দিল। গোলাম সংখ্যা বাড়িয়াও গিয়াছিল খুব বেশি। আথেন্সে ছিল ১৬৫,০০০ গোলাম, কোরিন্থের গোলাম সংখ্যা ৪৬০,০০০ এবং এজিনায় ৪৭০,০০০। প্রত্যেক কেন্দ্রেই তখন আসল স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ। এই গোলাম-তন্ত্রের উপর ভর করিয়া গ্রীক্ সমাজের তথাকথিত গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করিতে থাকে।

সমাজে নবশক্তি

এই অবস্থায় গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান কি আর টিকিয়া থাকিতে পারে? গোষ্ঠী ধর্ম্মের গোড়ার কথাই এই যে, সমরক্তশীল লোকেরা একই জনপদে যৌথভাবে বসবাস করিবে। তাহাদের "কোঠে" কোনো বিদেশীর পা মাড়ানো চলিবে না। সে ত আজ বহু কালের কথা।

দেশী, বিদেশী, গোলাম, মক্কেল, ব্যাপারী ইত্যাদি সকল প্রকার নরনারী "উৎকর্ষে"র যুগে একত্র বাস করিতেছিল। "বার্ব্বার" সভ্যতার মধ্যস্তরে লোকেরা গৃহস্থ হইতে শিখে। কিন্তু এখন ব্যবসাবাণিজ্যের হিড়িকে পড়িয়া মানুষেরা বাস্তুভিটা যেখানে যখন সুবিধাজনক তখন সেখানে কায়েম করিতে অভ্যস্ত হইতেছিল।

গোষ্ঠীর লোকেরা এই যুগে একত্র হইয়া গোষ্ঠীগত কাজকর্ম্ম সাম্‌লাইবার সুযোগই পাইত না। খাওয়াপরার ধান্ধায় সমরক্তের নরনারী ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন যাপন করিতে বাধ্য ছিল। বড় জোর ধর্ম্মকর্ম্ম ইত্যাদি নেহাৎ নগণ্য বিষয়ে বোধ হয় ইহারা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া উৎসবাদি চালাইতে সমর্থ হইত।

অধিকন্তু এখন মানুষের জীবনে নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। শিল্পগুলা সাবেককালের গোষ্ঠীতে জানা ছিল না। শহ্‌র নামক কেন্দ্র গোষ্ঠী ধর্ম্মে অবিদিত। এই সকল নতুন জীবন কেন্দ্র, এবং নতুন জীবন যাপনের প্রভাবে মানুষ আর গোষ্ঠীকে "আমল" দিবে কি করিয়া? অধিকন্তু প্রত্যেক নয়া

জীবন কেন্দ্রে এবং নয়া কর্ম্ম সাধনায় ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির লোক সখ্যসূত্রে অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আদানপ্রদান চালাইতে অভ্যস্ত ছিল। এই সকল নবজীবনের স্বার্থের জন্য নব নব শাসন কেন্দ্রের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। এইগুলার সঙ্গে পুরাণো গোষ্ঠীর সংস্রব না থাকাই স্বাভাবিক।

গোষ্ঠীর বাহিরে নবীন নবীন জীবন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠার অর্থ এই যে গোষ্ঠী-প্রথার শত্রুগুলা মানব-সমাজে দাঁড়াইয়া গেল। এই সকল কেন্দ্রে ধনীনির্ধনের সমস্যা মীমাংসা, উত্তমর্ণঅধমর্ণের সমস্যা মীমাংসা ইত্যাদি গোষ্ঠী ধরণের অজানা নতুন ধরণের সমস্যাগুলার মীমাংসা সম্ভবপর হইত। এই সকল কেন্দ্রেই "অজ্ঞাত কুলশীল" বিদেশীদের অধিকার এবং এক্তিয়ার ভোগের ক্ষেত্রও জুটিত।

গোষ্ঠী ছিল সাম্য ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। নরনারীর গণতন্ত্র এই প্রতিষ্ঠানের শাসন রক্ত। কিন্তু এখন সমাজে পয়সাওয়ালাদের প্রতাপ, বিদেশীদের প্রভাব ইত্যাদি নতুন লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাহার উপর গোলাম স্বাধীন প্রভেদ ত আছেই। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতরকার পরস্পর বিবাদ ও খাওয়াখাওয়ি নিবারণ করিতে পারে কে? এমন একটা শক্তি যাহা প্রত্যেক শ্রেণীর উপর থাকিয়া প্রত্যেকের প্রতিই নিরপেক্ষ বিচার চালাইতে সমর্থ। সেই শক্তির নামই সার্ব্বজনিক-দণ্ড-ক্ষমতাশীল-রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র কাহাকে বলে?

সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, গোষ্ঠীর চিতাভস্মের উপর রাষ্ট্রের জন্ম

হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই জন্মকথা কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছিল।

(১)

আথেনিয় সমাজে গোষ্ঠীর ভিতর শ্রেণী বিবাদ স্বরু হয়। সেই শ্রেণীগুলা হইতেই রাষ্ট্র মাথা তুলিয়াছিল।

রোমাণ-সমাজে বিদেশী "প্লেবস্" শ্রেণী গোষ্ঠীর ভিতর প্রবেশ করিবার এবং গোষ্ঠী ধর্ম্মের অধিকার ভোগ করিবার জন্য লড়াই স্বরু করে। এই দু'য়ের দেশী বিদেশীয়—সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় রাষ্ট্র যাহার আওতায় গোষ্ঠী-সমাজ এবং প্লেবস্-সমাজ দুইই কাবু হইতে থাকে।

জার্ম্মাণ-সমাজে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল বহুসংখ্যক স্ববিস্তৃত রোমাণ জনপদ দখল করিবার ফলে। গোষ্ঠী ধর্ম্মের দ্বারা বিজিত সমাজগুলা শাসন করা সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই একটা নতুন জীবনকেন্দ্রের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল! তবে এই অবস্থায় বিজেতা বিজিত দুই সমাজের আর্থিক জীবন প্রায় এক স্তরেরই প্রতিষ্ঠান ছিল। এই কারণে জার্ম্মাণ শাসিত রোমাণ প্রদেশে প্রদেশে সাবেক গোষ্ঠীর নিদর্শন অনেক কাল বাঁচিয়া গিয়াছিল। "মার্ক" বা পল্লী সমবায়ের আসরে সেই গোষ্ঠী ধর্ম্মের জীবনলীলা নিরীক্ষণ করিতে হইবে। অধিকন্তু অভিজাত কুলীন বা পাত্রিশিয়ান বংশে গোষ্ঠী-নীতির পুনর্জীবনও দেখা গিয়াছিল। এই পুনর্জীবনের চিহ্ন এমন কি কিষাণ সমাজেও দেখিতে পাই। "ডিয়মার্সিয়া" নামক প্রতিষ্ঠান কৃষাণ পরিবারে গোষ্ঠী জীবনের সাক্ষী।

(২)

এইবার তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান একটা অতি কিছু "হাতী ঘোড়া" নয়। জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল এই জীবনকেন্দ্রকে "নীতি বা ধর্ম্মের চরম পরিণতি" এবং "মানব জ্ঞান বা বুদ্ধি শক্তির সাথকতা লাভ ও প্রতিবিম্ব" ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনা দার্শনিক মহাশয়ের অতীন্দ্রিয়ামিজ আধ্যাত্মিকামির ফল মাত্র। অপর দিকে রাষ্ট্রকে বাহির হইতে মানুষের উপর চাপাইয়া দেওয়া একটা শক্তিরূপে বর্ণনা করাও চলে না।

মানুষ বিকাশ লাভ করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে, তখন এই রকম কেন্দ্র দেখা দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমাজে শ্রেণী ভেদ, আর্থিক বিবাদ, জাতিগত দলাদলি, এবং অন্যান্য খাওয়াখাওয়ি বাড়িবামাত্র সাবেক কালের জীবনকেন্দ্রের সাহায্যে এইগুলার কিনারা করা সম্ভবপর ছিল না। শান্তি শৃঙ্খলা এবং সামাজিক ঐক্য পুনরায় গড়িয়া তুলিবার জন্য "রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত" সমাজ নিরপেক্ষ এবং সমাজাতিরিক্ত বা "অতি"—সামাজিক একটা ক্ষমতা আবশ্যক হইয়াছিল। সমাজে শাসক এবং সমাজ হইতে স্বতন্ত্র অথচ সমাজ হইতেই উৎপন্ন যে নবশক্তি মানবের ইতিহাসে দেখা দিল তাহাকেই বলে রাষ্ট্র।

(৩)

গোষ্ঠী-কেন্দ্রে নরনারী বসবাস করিত রক্তের টান হিসাবে। রাষ্ট্রের বিধানে জনগণ বসবাস করে দেশ হিসাবে। স্থানই এই কেন্দ্রে সামাজিক ঐক্যের শৃঙ্খলা রক্ত সম্বন্ধ যেরূপই থাকুক

না কেন নরনারীরা নিজ নিজ বাস্তুভিটা অনুসারে দেশগত কেন্দ্রে সার্ব্বজনিক কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য হইল। দাবীদাওয়া যা কিছু সবই তখন হইতে স্থানীয় বা দেশিক। এই নিয়ম আজকালকার নরনারীর পক্ষে একটা মামুলি কথা। কিন্তু কি আথেন্সে, কি রোমে এই নিয়ম জারি হইতে মাথা ফাটাফাটির দরকার হইয়াছিল। রক্তের টানে সামাজিক কর্ত্তব্য অধিকারের স্বধর্ম্ম বড় সহজে পরাজয় স্বীকার করে নাই।

রাষ্ট্রের আর একটা বড় কথা এই যে, দণ্ডের ক্ষমতা একটা নতুন কেন্দ্রের অধীন। সে সাবেক কালের গোটা সমাজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। গোষ্ঠীর আমলে সকল নরনারীই ছিল দেশের শৃঙ্খলা বিধানে এবং দেশরক্ষায় অধিকারী। কিন্তু পরে গোলাম দেখা দেয়। আথেন্সের ৯০,০০০ স্বাধীন জীব ৩৬৫,০০০ গোলামের মনিব। এই অবস্থায় গোটা সমাজ শান্তি-রক্ষক বা পল্টন হইতেই পারে না। কাজেই একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া তোলা দরকার হইয়াছিল। তাহার দ্বারা গোলাম গুলাকে দাবিয়া রাখা চলিত। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন নরনারীর ভিতরই শৃঙ্খলা ও শান্তি কায়েম করা সম্ভব হইত। জেলখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এই স্বতন্ত্র দণ্ড ক্ষমতারই প্রতিমূর্ত্তি। গোষ্ঠীর আমলে এই সবের দরকার হইত না।

দণ্ডক্ষমতার কেন্দ্রকে কোথায়ও কথঞ্চিৎ ছোট আকারে দেখিতে পাই। কোথায়ও বা ইহার আকার প্রকার যারপরনাই বড়। যেখানে যেখানে শ্রেণী বিবাদ, ঘরোআ কামড়াকামড়ি এবং বিদেশী দুস্‌মনের আওতা কম,—যথা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো অঞ্চলে,—সেখানে রাষ্ট্রের দণ্ড-কেন্দ্র বিশেষ নগণ্য।

কিন্তু বর্ত্তমান ইয়োরোপে দেখিতে পাই বিপরীত অবস্থা। আন্তর্জ্জাতিক লড়াই এবং আভ্যন্তরীণ বিবাদ ইয়োরোপের প্রায় রাষ্ট্র-জীবনে এত বেশি যে এখানকার দেশগুলার পুলিশ পল্টনই রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় তথ্য। সমাজ এই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় দণ্ডক্ষমতার বশে জর্জ্জরিত।

(৪)

"সমাজে" ও "রাষ্ট্রে" যে সকল প্রভেদের কথা বলা হইতেছে গোষ্ঠী ধর্ম্মের আয়োজনে সে সব লক্ষ্য করা অসম্ভব। কেননা সে ব্যবস্থায় সমাজই সব। বস্তুতঃ রাষ্ট্র তখন জন্মেই নাই। আর একটা প্রভেদও অনিবার্য্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলাকে বজায় রাখিবার জন্য খরচপত্র আবশ্যক। এইগুলা তোলা হয় জনগণের নিকট হইতে ট্যাক্স্ বা খাজনা আকারে। "উৎকৃর্ষে"র যুগ যেমন যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে তেমন তেমন এই সব রাষ্ট্রীয় আদায়ের সীমানাও বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্রমে খাজনা মাত্রে আর সানায় নাই। ভবিষ্যৎ সমাজের উপর চাহিদা চালাইতেও বর্ত্তমান সমাজ শিখিয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র সরকারী ঋণ লইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কি ট্যাক্স, কি ঋণ এই সব গোষ্ঠী-ধর্ম্মের অবিদিত।

রাষ্ট্র সমাজ হইতে নানা উপায়ে এবং নানা দিকে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রে সমাজে পার্থক্যটা লোক চক্ষুর পক্ষে সহজ করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র একটা ফিকিরও ঢুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। গোষ্ঠীর আমলে ছিল সার্ব্বজনিক-জীবন-কেন্দ্রগুলা নরনারীর শ্রদ্ধার পাত্র। লোকে লোকে উনিশ বিশ করা দরকার হইত না। কিন্তু রাষ্ট্রের আমলে সরকারী কর্ম্মচারীরা

ব্যক্তিগত হিসাবে সমাজের নিকট বিশিষ্ট রূপে সম্মান পাইবার যোগ্য বিবেচিত হয়। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রে সভাপতিকে অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী হইতেও অতিমাত্রায় বেশি পদযোগ্যরূপে ইজ্জৎ দেওয়া হইয়াছে। এমন কি রাষ্ট্রীয় সভ্যতার বিধানে পুলিশ বিভাগের নিম্নতম পেয়াদা, দফাদার বা বরকন্দাজও গোষ্ঠী-সভ্যতার সকল শাসন কেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি এক্তিয়ারই ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মজার কথা এই যে, গোষ্ঠী-কেন্দ্রের নিম্নতম জননায়কও আজকালকার উচ্চতম সরকারী কর্ম্মচারী বা রাজরাজড়া অপেক্ষা সমাজের আন্তরিক ভক্তি বেশিই পাইত। গোষ্ঠীর কর্ম্মচারীরা ছিল "সমাজের" ভিতরকার, সমাজের "আপন" লোক। আর রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীরা সমাজের বাহিরকার সমাজের উপরকার পাহারাওয়ালা বিশেষ।

অসাম্য ও ধন-তন্ত্রের ইতিহাস

যাহাহউক, শ্রেণী-বিবাদ ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু যে সময়ে এই বিবাদ চলিতেছিল সেই সময়েই বিবাদের ভিতর হইতে ইহার জন্মে ঘটে। কাজেই রাষ্ট্রটা সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী আর্থিক শ্রেণীরই কর্ম্মকেন্দ্র। আর্থিক ক্ষমতার জোরে এই শ্রেণী রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল প্রভাব একচেটিয়া করিয়া বসে। কাজেই রাষ্ট্রকেন্দ্র ধনবানের যথেচ্ছ লীলার এবং নির্ধনের নির্য্যাতন ভোগের যন্ত্রমাত্র রূপে দেখা দেয়।

প্রাচীন ইয়োরোপের রাষ্ট্র ছিল গোলাম মালিকদের জীবন কেন্দ্র। গোলামগুলাকে স্ববশে রাখা ছিল এই কুলীনদের উদ্দেশ্য।

সেই রাষ্ট্রে গোলামদিগকে নিপীড়ন এবং শোষণ করিবার ফন্দিই মূর্ত্তি পাইয়াছিল।

মধ্য যুগের রাষ্ট্র ছিল জমিদার নামক কুলীনদের লীলাক্ষেত্র। ভূমি-গোলাম এবং অস্বাধীন ছোটখাটো কিষাণদের নিষ্পেষণ ছিল এই রাষ্ট্রের স্বধর্ম্ম।

বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্র অন্য এক শ্রেণীর কুলীনদের নবাবী সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে প্রতিনিধি-তন্ত্র বলে। আসল কথা এই জীবনকেন্দ্রে পুঁজিপতিরা শ্রমজীবীদিগকে শাসন-শোষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে মাত্র।

কোনো কোনো যুগে লড়াই-শীল শ্রেণীগুলা ক্ষমতায় প্রায় সমান সমান। সেই অবস্থায় রাষ্ট্র কেন্দ্র এই সকলের ভিতর মধ্যস্থতা করিতে গিয়া কোনো একদিকে ঢলিয়া পড়িতে বাধ্য হয় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অনেকটা নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইয়োরোপের সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দৃশ্য দেখা গিয়াছে। তখনকার দিনে জমিদার এবং নগর জীবনের মাতব্বর স্থানীয় লোকেরা প্রায় সমান সমান ছিল। এই দুই শ্রেণীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলাইয়া সে যুগের নরপতিরা নিজ এক্তিয়ার বাড়াইতে সমর্থ হইত। এ অবশ্য আবার "যথেচ্ছ" ডেস্পটিজম বা একচ্ছত্র রাজত্বের যুগ।

নেপোলিয়ানও এই নীতির মর্ম্ম বেশ বুঝিতেন। নগরের মাতব্বরদিগকে মজুরদের বিরুদ্ধে খেলাইতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। সেদিনকার তৃতীয় নেপোলিয়নও "বুর্জোআ" "প্রোলেটারিয়াট" এই দুই শ্রেণীর "ভদ্র" ইতরের "মেড়ার লড়াই" হইতে মুনাফা উঠাইতে সচেষ্ট ছিলেন।

আজকালকার জার্ম্মাণিতে সেই যথেচ্ছাচারশীল একচ্ছত্র রাজত্ব নীতিরই জের চলিতেছে। পুঁজিপতি এবং মজুর এই দুই শ্রেণীতে বিস্‌মার্কের রাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলাইয়া রাজশক্তিকে ফুলাইয়া তুলিতেছে। ফলতঃ দুই শ্রেণীকেই ঠকাইয়া প্রশিয়ার "যুঙ্কার" জমিদারগুলা নিজেদের গচ্ছিত ভুঁড়ি মোটা করিতে করিতে গোঁফে চাড়া মারিতে সমর্থ হইতেছে। এ এক অতি লজ্জাজনক দৃশ্য।

দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রেই ধনদৌলতের পরিমাণ হিসাবে জনগণের দাবীদাওয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা ধনহীনদিগের হিংসা ও আক্রমণ হইতে ধনবানদিগকে বাঁচাইবার জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম। আথেন্স এবং রোম উভয় রাষ্ট্রেই আয় হিসাবে জনগণকে শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত। মধ্য যুগের রাষ্ট্রেও জমিদারীর পরিমাণ যাহাদের বেশি তাহারাই কর্ত্তামি করিতে পারিত। বর্ত্তমান যুগের প্রতিনিধি-তন্ত্রেও পয়সার জোর যাহাদের তাহারাই ভোট দেয় এবং প্রতিনিধি হয়।

কিন্তু ধনদৌলতের অসাম্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে এরূপ কোনো কথা নাই। এই অসাম্য খোলাখুলি স্বীকার না করিলেও চলিতে পারে। বস্তুতঃ নেহাৎ শিশু বা অবনত বা উদীয়মান রাষ্ট্রেই এই আর্থিক তারতম্য শাসন ক্ষমতা ভাগাভাগির কারণ রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। উচ্চতম পরিণতিশীল রাষ্ট্রে আর্থিক অসাম্য সম্বন্ধে কোনো প্রকার আলোচনাই করা হয় না।

তথা-কথিত গণ-তন্ত্র

বর্ত্তমান যুগের গণ-তন্ত্রের আইনকানুনে প্রকাশ্য রূপে সম্পত্তি বিষয়ক ছোট বড় প্রভেদ স্বীকার করা হয় না। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধনী দরিদ্র সকলেই সমান। আইনের চোখে ধনদৌলতের প্রভাব অবজ্ঞেয় কিন্তু ভিতরকার কথা এই যে, এই ধরণের তথাকথিত সাম্যনীতির আওতায় চলিতেছে "ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ"। ধনদৌলতের দৌরাত্ম্য এই আওতায়ই অতি নির্ব্বিবাদে এবং প্রবলভাবে রাজত্ব করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র একটা নবীনতম সাম্যশীল গণ-তন্ত্রের চরম দৃষ্টান্ত। এখানে প্রায় সকলেই ভোট দিতে অধিকারী একথা স্বীকার করা চলে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মজুর নিগ্রো এবং দরিদ্র লোকেরা এই এক্তিয়ার ভোগ করিতে অসমর্থ। তাহা সত্ত্বেও "সার্ব্বজনীন বাছাই" নীতির আমল ইয়াঙ্কি মুল্লুকে চলিতেছে বলিতেই হইবে।

কিন্তু পয়সাওয়ালাদের প্রভাব এখানে কম কি? সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ঘুশ দিয়া করানো যায় না এমন কোনো কাজ এদেশে নাই। অধিকন্তু পয়সাওয়ালা লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যাঙ্ক হিসাবে গর্বমেণ্টকে উঠিতে বসিতে স্ববশে রাখে। গর্বমেণ্ট সরকারী কাজের জন্য টাকা কর্জ্জ লইতে বাধ্য। দেশের রেলপথগুলা এবং বড় বড় শিল্প কারখানা ও কৃষিক্ষেত্র সমূহও ধনপতিদের আড্ডা ব্যাঙ্কের শাসনে চলিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা "ষ্টক্ এক্‌সচেঞ্জ" নামক মাল ও টাকার বাজারে ফন্দ টিপিয়া গোটা দেশকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্মেণ্টকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়ে।

সরকারের উপর ব্যাঙ্কের অত্যাচার যুক্তরাষ্ট্রে যেমন, ফ্রান্সে তেমন, এমন কি নবীন দুনিয়ার সর্ব্ব প্রাচীন গণ-তন্ত্র সুইট্‌-জারল্যাণ্ডেও তেমন অর্থাৎ গবর্মেণ্টে আর ধনদৌলতওয়ালা শ্রেণীতে গলায় গলায় ভাব জগতের সকল "সাম্যনীতি" প্রবর্ত্তিত রিপাব্‌লিকে চলিতেছে। তাহা ছাড়া কি ইংল্যাণ্ড, কি জার্ম্মাণ সকল রাজতন্ত্র শাসিত দেশেও রাষ্ট্রের উপর ব্যাঙ্ক এবং ষ্টক্‌ একৃস্‌চেঞ্জের প্রভাব সুবিদিত। অর্থাৎ "সার্ব্বজনীন বাছাই" অর্থাৎ ধনদৌলতের কথা মুখে না আনিয়া রাষ্ট্র শাসনে অধিকার দেওয়ার নীতি এই পাঁচ দেশেই কম বেশি সমানভাবে প্রচলিত।

"সার্ব্বজনীন বাছাই" নীতির ফলে রাষ্ট্রে সাম্য আসিয়াছে কি? একদম না। ধনদৌলতওয়ালারাই রাষ্ট্রের উপর মোড়লি করিতেছে। নির্ধন মজুরেরা ধনপতিদের নেজুর রূপে কোনো মতে জীবন ধারণ করিয়া চলিতেছে। আর্থিক স্বাধীনতা যতদিন ইহাদের ভাগ্যে না জুটে ততদিন এই সকল নির্য্যাতিত লক্ষ লক্ষ নরনারী বর্ত্তমান অবস্থাকে সনাতন রূপেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু যেই ইহারা আর্থিক স্বরাজ লাভ করিবে তখনই ইহারা ধনপতিদের আওতা ছাড়াইয়া নিজেদের জন্য একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় দল কায়েম করিয়া বসিবে এই দলই মজুর-নায়কদিগকে রাষ্ট্রশাসনে নিজেদের প্রতিনিধি স্বরূপ মোতায়েন রাখিতে অভ্যস্ত হইবে।

আর্থিক স্বাধীনতার যুগ

"সার্ব্বজনীন বাছাই"এর ফলে একদিন সমাজ চরমে আসিয়া ঠেকিবে। আত্মবিশ্বাসশীল মজুর-নায়কেরা যেদিন পুঁজি-

পতিদের সামনাসামনি দাঁড়াইয়া তথাকথিত সাম্যনীতিকে কাজে পরিণত করাইতে অগ্রসর হইবে সেইদিন রাষ্ট্রীয় জীবনের তাপমান যন্ত্র জল ফুটাইবার মাত্রায় আসিয়া হাজির হইবে। তখন শ্রমজীবী এবং ধনজীবী উভয়েই নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠাওরাইতে পারিবে।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানটা মানবজাতির পক্ষে একটা অনাদি সনাতন বস্তু নয়। রাষ্ট্রহীন সমাজ দুনিয়ায় ছিল অনেক। সমাজে শ্রেণী ভেদ বা মাৎস্যন্যায় স্বরু হইবার ফলে ক্রমে এই শাসন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে দুনিয়ায় এক নবীন অবস্থা। আজকালকার দিনে শ্রেণী ভেদ থাকার কোনো প্রয়োজনই নাই। আর্থিক সুখস্বচ্ছন্দতার উপায় সৃষ্টি করিবার পক্ষে 'এক কথায় ধনোৎপাদনের পক্ষে আজকাল শ্রেণী-বিভাগ একটা অন্তরায় বিশেষ। কাজেই শ্রেণীগুলা একদিন উঠিয়া যাইবে। কাজেই শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে যে রাষ্ট্র কায়েম হইয়াছে তাহার আয়ুও ফুরাইয়া আসিবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র অনাদিও নয় অনন্তও নয়।

ধনোৎপাদনকারীরা আবার সমান ও স্বাধীনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকিবে। এই ধরণের ধন-সৃষ্টির যুগে রাষ্ট্র "পটল তুলিবে"। সুতা কাটার চর্‌খা এবং পিতলের কুড়াল যেমন আজকাল কেবলমাত্র মান্ধাতার আমলের সামগ্রীরূপে প্রত্ন-তত্ত্বের সংগ্রহালয়েই দেখিতে পাওয়া যায় রাষ্ট্রও সেইরূপ পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানকারীদের গবেষণার সামগ্রী মাত্র থাকিবে। রাষ্ট্রকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়া "উৎকর্ষ" বা সিভিলিজেশানের যুগও মানব-সমাজ হইতে বিদায় লইবে।

"উৎকর্ষে"র ধন-নীতি

"উৎকর্ষে"র যুগে মাল তৈয়ারী হইতে সুরু করিয়াছে ধনোৎপাদনকারীদের স্বভোগের জন্য নয়,—বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বাজারে অদলবদলের জন্য। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল যুগে ধন-স্রষ্টারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ তৈয়ারী মালের শেষভাগ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত। "উৎকর্ষে"র যুগ স্রষ্টায় ভোক্তায় ভেদ কায়েম করিয়াছে। শ্রমবিভাগ এবং বিনিময় এই আমলের প্রধান আর্থিক তথ্য।

কোথায় সেকালের যৌথ-সৃষ্টি এবং যৌথ-ভোগ আর কোথায় একালের মুদ্রা নিয়ন্ত্রিত মধ্যস্থরূপ-বণিক-নিয়ন্ত্রিত, আমদানি-রপ্তানি-প্রাণ, কেনাবেচা-ধর্ম্মী বিনিময়ের বাজার। আজকালকার স্রষ্টারা জানে না কেনই বা মাল তৈয়ারী হইতেছে, কোথায়ই বা মাল যাইতেছে। কেনই বা অমুক পরিমাণ মাল তৈয়ারী হইতেছে। ধনের উৎপাদন স্রষ্টাদের তরফ্ হইতে একদম অনিশ্চিত দৈবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকল দৈবকে বশে আনিতে শিক্ষা করা "উৎকর্ষে"র যুগের নরনারীর পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান জগৎ অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের "দৈব" বিষয়ক গতিবিধি আঁটিয়া উঠিতে পারিয়াছে। কিন্তু ধন-সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে দৈব চলিতেছে তাহার কিনারা করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। মাঝে মাঝে আর্থিক "দুর্য্যোগ" ঘটিয়া মানব সমাজকে দৈবশক্তিটা কাণে ধরিয়া দেখাইয়া দেয় মাত্র।

"উৎকর্ষে"র যুগে আর একটা বড় কথা মানুষ বিনিময়। বিনিময় প্রথার সাহায্যে মালে মালে অদলবদল প্রথম সুরু হয়। কিন্তু অল্পকালের ভিতরই মানুষের বদলে মানুষ অথবা ধন

সম্পত্তি অদলবদল হইতে থাকে। অর্থাৎ মানুষই মালের শ্রেণীতে পরিণত হয়। দাসত্ব বা গোলামী-প্রথায় মানুষ সেবক হিসাবে জানোআর বা যন্ত্রপাতি মাত্র।

দাসত্ব-প্রথা "উৎকর্ষে"র যুগে নির্য্যাতনকারী কুলীন এবং নির্য্যাতিত পেরিয়া এই দুই শ্রেণী সৃষ্টি করে। প্রাচীন ইয়োরোপে এই ধরণের শাসনশোষণ পূরা মাত্রায় দেখা গিয়াছে। সেই শ্রেণী-নির্য্যাতন মধ্যযুগে দেখা গিয়াছে জমিদার আর "সার্ফ" বা ভূমি-গোলামের সম্বন্ধে। বর্ত্তমান যুগে সেই গোলামীই চলিতেছে মজুরদের জীবনে। বর্ত্তমান জগতের গোলামীটা প্রকাশ্য নয়। কিন্তু গোটা "উৎকর্ষে"র যুগ ভরিয়াই নানারূপে বহু সংখ্যক মানুষ মালমাত্ররূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

মুদ্রা, বণিক, নিজস্ব এবং গোলামী এই চার তথ্য বিনিময় মূলক "উৎকর্ষ-সভ্যতা"র আর্থিক ভিত্তি। ইহার সামাজিক ভিত্তি হইতেছে এক-পত্নী-পতিত্ব এবং নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য। এইরূপ ধন-জন-কেন্দ্রের শাসন যন্ত্রকে বলে রাষ্ট্র। এই যন্ত্রে ধনহীন নরনারী ধনবানদের কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নগর জীবন মফঃস্বলকে ছাপাইয়া উঠে।

এই সকল কথার সঙ্গে "উৎকর্ষে"র আর একটা লক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। সে মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগবাটোআরা কিরূপ হইবে সেই বিষয়ে সম্পত্তিশালী ব্যক্তির উইল করিয়া যাইবার ক্ষমতা। গ্রীসে সোলোনের আমল পর্য্যন্ত এই ক্ষমতা দেখা যায় নাই। কিন্তু রোমের উইল করার প্রথা অতি প্রাচীন কালেই বিকশিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সমাজতত্ত্ববিৎ লাসাল

বলেন যে, রোমাণরা চিরকালই উইল প্রথা চালাইয়া আসিয়াছে। উইলহীন যুগ রোমাণ সমাজে কোনো দিনই ছিল না। কিন্তু লাসালের এই মত স্বীকার করিবার স্বপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি নাই। তিনি হেগেলপন্থী দার্শনিক! খাঁটি নিরেট তথ্যের উপর ভর না করিয়া লাসাল একমাত্র উইল প্রথার "দার্শনিক" ভিত্তি হইতে সুপ্রাচীন কালেও ইহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন। যাহা হউক উইল করার ক্ষমতা রোমে "উৎকর্ষে"র যুগের এক প্রধান ক্ষমতা।

জার্ম্মাণ সমাজে উইল করা সুরু হয় পুরোহিতদের প্ররোচনায়। ধর্ম্মভীরু জার্ম্মাণ যাহাতে নিজ নিজ সম্পত্তি "দেবোত্তর" রূপে গির্জ্জার হাতে দান করিয়া যাইতে পারে সেদিকে ধর্ম্মগুরুদের নজর বেশ তীক্ষ্ণই ছিল।

"উৎকর্ষে"র যুগ প্রথম হইতেই মানুষের অতি জঘন্য পাশবিক বৃত্তিকেই প্রশ্রয় দিয়াছে। মানুষের সুপ্রবৃত্তিগুলাকে দাবিয়া রাখিয়া ধনলিপ্সা, স্বার্থসিদ্ধি এবং নিজের পেট মোটা করার দিকে "উৎকর্ষ-সভ্যতা" নরনারীকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। এই যুগের মূলমন্ত্র প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত এক ঃ—ধনদৌলত ধনদৌলত ধনদৌলতই জীবনের একমাত্র সার। আবার এই ধনদৌলতও সমাজের, জাতির বা দেশের ধনদৌলত নয়, একমাত্র নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া অন্য কিছু "উৎকর্ষে"র যুগে লোকেরা চিন্তা করিতে পারে না।

আধুনিক সভ্যতার সু-কু

তাহা সত্ত্বেও জগতে বিজ্ঞান এবং শিল্পের বিকাশ যুগে যুগে

ঘটিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু তাহাব কারণ এই যে, ধনদৌলতওয়ালা স্বার্থান্ধ পিশাচেরা এইগুলা দিয়া নিজেদের পাশবিক ও গর্হিত চরিত্র ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ধনবানদের পক্ষে আত্মম্ভরিত্বেরই এক কৌশল বিশেষ।

ধনোৎপাদনের প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির প্রভাবে অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। "উৎকর্ষে"র যুগে এই অঘটনগুলা মানব বিকাশের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সব তথ্য মানবজীবনে উন্নতিরই সাক্ষী। কিন্তু এই সকল উন্নতির অপর পিঠে কি দেখিতে পাই? ধনহীন নির্য্যাতিত নরনারীর ক্রমিক অধোগতি। সম্পত্তিশালী লোকেরাই ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছে। তাহারা গুন্‌তিতে নগণ্য। কিন্তু ক্রোর ক্রোর নরনারীর ক্রন্দন এই উন্নতিশীল "উৎকর্ষে"র যুগে জগতের আকাশ ছাইয়া রাখিয়াছে।

ফলতঃ একশ্রেণীর লোকের যেখানে পৌষ মাস অপর শ্রেণীর লোকের পক্ষে সেখানে সর্ব্বনাশ। একের স্বাধীনতায় অপরের পরাধীনতা ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গেসঙ্গেই কোনো না কোনো কেন্দ্রে অবনতি ঘর করিয়া বসিতেছে। শিল্পকর্ম্মে যন্ত্রপাতি কায়েম হইবার ফলে জগতের ধনসম্পদ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। মানবজীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা বাড়াই-বার উপায় শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সমাজের অতি নগণ্য সংখ্যক লোকই সেই সকল সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছে। একথা কাহারও অজানা নাই।

"বার্ব্বার"-সভ্যতার আমলে কর্ত্তব্য ও অধিকার নামক দুইটা স্বতন্ত্র বাস্তব জ্ঞান নরনারী মহলে প্রচলিত ছিল না। "উৎকর্ষ"-

সভ্যতার বিধানে এই দুই বস্তু স্বতন্ত্ররূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তব্যগুলা জুটিয়াছে এক শ্রেণীর লোকের কপালে আর অধিকার ভোগ ঘটিতেছে আর এক শ্রেণীর ভাগ্যে! নেহাৎ আনাড়ি লোকও এই প্রভেদ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে।

কিন্তু এই সকল প্রভেদের কথা সাধারণ্যে স্বীকৃত হয় না। শাসক সম্প্রদায় ধনপতি-শ্রেণী জন-নায়কের দল বা "ভদ্র লোকের সমাজ" ইত্যাদির পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহাই গোটা দেশের পক্ষে বা জাতির পক্ষেও অমঙ্গলকর এই ধরণের মত প্রচার করা বাজারের দস্তুর। খাটি সত্য চোখ খুলিয়া দেখিবার সাহস প্রায় লোকেরই নাই।

"উৎকর্ষ"-সভ্যতা যেমন যেমন বাড়িতেছে মিথ্যা যুক্তি এবং কুসংস্কারগুলাও তেমন তেমন প্রসার লাভ করিতেছে। এ যুগের "কু" গুলা হয় কিছু কিছু দানখয়রাতির সাহায্যে ধামাচাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইতেছে। অথবা বর্ত্তমান জগতে কোনো প্রকার অত্যাচার দুর্নীতি, পরনিপীড়ন, গোলামনির্য্যাতন বা বা দরিদ্রনিপীড়ন চলিতেছেই না। এইরূপ বুঝিবার এবং বুঝাইবার লোকও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পরাধীন, গোলাম ও অন্যান্য নির্য্যাতিত নরনারীদিগের মঙ্গলের জন্যই শাসক সম্প্রদায়, শোষক সম্প্রদায়, পুঁজিপতি সম্প্রদায়, মনিব সম্প্রদায় তাহাদের শাসন শোষণ নীতি চালাইতেছে, এই মত পণ্ডিত মহলে এবং বাবু সমাজে এক প্রকার অ, আ, ক, খ স্বরূপ। এই অবস্থায় যদি পরাধীন, গোলাম এবং অন্যান্য নির্য্যাতিত জাতিরা বিদ্রোহী হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি রূপে গালি দেওয়া সকল ভদ্রলোক এবং শাসক নরনারীর স্বধর্ম্ম।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ

ফরাসী সমাজতত্ত্ববিৎ ফুরিয়ে "উৎকর্ষ"-সভ্যতার কু-গুলার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতগুলা মর্গ্যান এবং মার্ক্‌সের মতের সঙ্গে মিলাইয়া আলোচনা করিলে বর্ত্তমান গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলা আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে। তাঁহার কথায় "উৎকর্ষ"-সভ্যতায় নির্ধনের বিরুদ্ধে ধনীর লড়াই প্রধান তথ্য। এই যুগে এক-পত্নী-পতিত্বের পরিবার এমং জমিজমায় নিজস্ব প্রথা মানব-সমাজের বিশেষত্ব। পরিবারগুলাকে পরস্পর স্বাধীন এবং স্ব স্ব প্রধান করিয়া দিয়া মানব-সমাজ জগতে শ্রেণীবিবাদ, জনগণের মাৎস্যন্যায় ও খাওয়াখাওয়ি সৃষ্টি করিয়াছে। জীবন-কেন্দ্র রচনায় এরূপ অনর্থ ঘটানো যৌথ-সম্পত্তি-মূলক "বার্ব্বার" সভ্যতার ধাতের বিপরীত।

এইবার মর্গ্যানের কথায় গ্রন্থ শেষ করা যাউক। মর্গ্যান বলিতেছেন:—"উৎকর্ষে"র যুগ সুরু হওয়া অবধি সম্পত্তি বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছে। দিন দিন সম্পত্তির বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা বাড়িয়া গিয়াছে। ধনবানরা নিজেদের স্বার্থে ধনদৌলত সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করিবার পক্ষে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ফলতঃ জনসাধারণ এই ধন-শক্তির চাপে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। মানবজাতি তাহার নিজ সৃষ্টিরই সম্মুখে নিজেকে হতভম্ব দেখিতে বাধ্য হইতেছে।

"কিন্তু মানব চিত্তের উপর ধনদৌলতের প্রভাব চিরকাল এইরূপ থাকিবে না। মানুষ নিজ বুদ্ধি খাটাইয়া ধনদৌলতকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইবে। ধনদৌলতও উহাদিগকে রাষ্ট্র কি

কি উপায়ে কাবু করিবে, ধনদৌলতওয়ালারা সমাজের ...
কোন বিষয়ে জ্ঞানী এই সকল কথা আলোচনা করিয়া বাহির করা মানবজাতির পক্ষে সম্ভবপর হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সমাজগত স্বার্থ বড় এই কথা মনে রাখিয়া সমাজে ও ব্যক্তিত্বে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় মানব চিন্তা কার্য্যকরী হইবে।

"সম্পত্তি ভোগের জীবনলীলাই মানবজীবনের চরম কথা নয়। অতীতে মানব সমাজ যে সকল উন্নতি দেখাইয়াছে সেই সকল উন্নতিই যদি ভবিষ্যতেও বাড়াইয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে সম্পত্তি ভোগের অতিরিক্ত অনেক কিছু মানবজাতিকে দেখাইতেই হইবে। সেই যুগ আসিতেছে। "উৎকর্ষ-সভ্যতার" জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত মানব সমাজের যে কয় শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে তাহা মানবেতিহাসের প্রাচীন কালের তুলনায় অতি নগণ্য। ভবিষ্যতে যে সকল যুগ আসিবে তাহার তুলনায়ও এই শতাব্দীগুলা এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

"সম্পত্তি ভোগমূলক সভ্যতার স্তর সমাজকে ভাঙনের দিকে লইয়া যাইতেছে। মানবজীবন এক উন্নততর কোঠায় পা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সেই কোঠায় দেখা দিবে শাসনে স্বরাজ, সমাজে ভ্রাতৃত্ব, দাবীদাওয়ায় সমতা এবং শিক্ষায় সার্ব্বজনীন অধিকার। অভিজ্ঞতা, বিদ্যা বুদ্ধি এবং জ্ঞান বিজ্ঞান বিকাশের ফলে মানবজাতি এই যে এক যুগান্তর ঘটাইয়া তুলিতেছে সেই যুগান্তর প্রবর্ত্তিত সমাজে "বার্ব্বার"-সভ্যতার গোষ্ঠি-প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব এক উচ্চতর আকারে দেখিতে পাইব।"

শেষ

WORKS BY BENOY KUMAR SARKAR

The Futurism of Young Asia. (Markert und Petters, Leipzig, 1922.) *Pages x* + 399. Price 12 shillings.

American Political Science Review: "A collection of more or less miscellaneous papers, political, historical, literary, philological and scientific. * * * The wide range of subjects intelligently discussed reveals evidence of unusual versatility on the part of the author."

Central European Review (Vienna): "*The Futurism* is unreservedly recommended as a book to read for its inspiration and to keep for its wealth of reference. * * * The scope of the work is extraordinary and its power of inspiration profound and lasting. * * * If the careless reader miss the general relevance of the exquisite chapters on art, at least he can enjoy them for their own sake."

Bombay Chronicle: "The author has devoted about a hundred pages to the study of China, and of which precious little is known. The chapter on Anglo-Russian aggression in Persia is very illuminating. The studies in Hindu culture and currents in the literature of Young India are worth being chewed and digested. Altogether in its suggestiveness and the extent of its range the book under review is a remarkable production."

Sozialwissenschaftliches Literaturblatt (Berlin): "Das Buch ist mit viel Gelehrsamkeit, aber auch mit verhaltenem Temperament geschrieben. Daher ist eseine Fundgrube von Anregungen fur den Historiker und Phiosophen nicht nur, sendern auch fur den Politiker."

Manchester Guardiau: An introductory essay and five astonishing monographs. * * * a capital index."

Modern Review (Calcutta): "A forceful writer * * * sure to arrest your attention and provoke you to think. * * * Every sentence in it is like a knock down blow."

Freeman (New York): Covers an enormous field extending from very ancient times to the present day and from China to America. * * * American readers would do well to study this clear and forcible statment of an Asiatic view of Western civilisation and the future relations of East and West."

The Political Institutions and Theories of the Hindus. (Markert und Petters, Leipzig, 1922) *Pages xxiv + 242.* Price 12 *s.*

Journal of the Royal Asiatic Society (London): "This book is a study in comparative Hindu political constitutions and concepts. * * * He seeks to give a readable account, and this he has done with frequent allusions and much elegant writing."

Modern Review (Calcutta): "A scientific and philosophical treatment of the subject has been here attempted by a man equipped with modern political knowledge and the modern outlook."

International Review Of Missions (London): "A remarkably incisive and learned piece of scholarship."

United India and Indian States (Delhi): "This is the first attempt at a comprehensive study of the whole of the Hindu period of Indian history and the attempt has been highly successful."

L'Europe Nouvelle (Paris): "Un ouvrage d'un remarquable sociologue asiatique., * * * etudie chacun de ces domaines (politique, juridique, militaire et economique) en comparant les societes hindoues et europeennes au cours des siecles. Le paral'ele economique et militaire entre l'empire romain et celui d'Asoka-le-Grand est, a cet egard, surprenant."

Bund (Bern): "Eine sehr gelehrte und weitschichtige Arbeit."

Orientalische Literaturzeitung: (Leipzig): "Unzweifelhaft ein interessantes und anregendes Buch sowohl wegen der Reichhaltigkeit seines Inhalts, als auch wegen der unverkennbaren Tendenz, aus der heraus es verfasst

wurde. * * * Sein Wert liegt in der Art, wie der Verfasser den uberreichen Stoff erfasst und gestaltet und damit zweifellos weiteren Untersuchungen enger umgrenzter Gebiete die Wege bereitet hat."

La Renaissance (Paris): "Cette Inde mysterieuse s'offrait a nous sous un visage familier, sous les traits memes de toutes les civilisations que connut l'Europe jusqu'au debut du siecle dernier. * * * Le fameux abime qui separe l'Orient et l'Occident se reduirait a l'avance considerable prise par la race blanche dans l'evolution machiniste. * * * Voila une these qui va nous faire esperer la constitution prochaine des Etats-Unis du Monde!"

Weltkultur (Leer): "Tiefschurfend und doch auch interessant fur jedermann. * * * erhalt Sarkars Werk eine erhohte Bedeutung."

Soziale Revue (Munich): "Der Geschichtsschreiber ebenso wie der staatswissenschaftlich Interessierte werden Professor Sarkar dankbar sein fur die Fulle des dargebotenen Materials wie fur die reichen Literaturangaben."

The Folk-Element in Hindu Culture. *Pp.* xx + 312. (Longmans, 1917.) 15 *s net.*

Glasgow Herald "Valuable contribution to the anthropological literature of India. * * * A trained observer."

Literary Digest (New York): "A book for the specialist, and for him has unique value."

Scotsman: "Interesting and profoundly learned study * * * will be welcomed by all students who wish to be well informed as to what modern scholarship is doing for the reconstruction of Indian history. * * * An important contribution to the scientific study of Hindu sociology."

Indiaman (London): "Of substantial scientific value. * * * Much that he writes is suggestive and his point of view is generally interesting."

Hindu Achievements in Exact Science. *Pp. xiii + 82.* (Longmans, 1918.) 5 *s net.*

British Medical Journal: "The work is clearly arranged and pleasantly written and will be found both interesting and instructive."

American Anthropologist. "A valuable summary and worth reading."

International Journal of Ethics: "The importance of the information is both scientific and moral."

La Nature (Paris): "Petit livre ayant pour but de montrer les liaisons chronologiques et les affinites logis ques entre la science hindoue et les connaissances de Grecs, des Chinois et des Arabes L'auteur montre qu'il n'y a aucune tendance essentiellement differente entre les esprits orientaux et occidentaux. Les lecteurs europeens trouveront dans ce livre un bon resume de la science hindoue ancienne et medievale, trop peu connue ici."

Educational Review (edited by President Butler Columbia University): "It would be quite worth whi to those who underestimate the permanent contributions of the oriental nations to read with care this little volume. The reader will be startled to learn how far the orient saw into some problems which are considered purely modern and how much they contribute to man's knowledge of nature."

New York Tribune: "This little handbook of justice to the Hindu * * * has performed its task and purpose painstakingly and perhaps as interestingly as possible."

Journal of the American Chemical Society: "This record of achievements is so formidable that the reader cannot help but be impressed with the power, originality and subtlety of the Hindu mind.

American Journal of Sociology: "A suggestive little book for the occidental student."

Indian Education (London): "The author gives a large amount of information * * * citing authorities

and stating the case with a calmness and moderation that inspire respect. The statement is condensed and stimulating at the same time."

The Bliss of a Moment: A volume of verse containing seventy-five poems in five parts. (Luzac & Co., London, 1918.) 3 *s*. 6*d*.

Publicity Bulletin (New York): "Poems that electrity with the vitality of their message. * * They combine the energy and forward look of the Occident with the inward, upward-looking faith of the Orient There are poems addressed to Whitman, Browning, Virgil, Napoleon, Dante, Asoka and Goethe, which interpret with unusual skill the genius of each one."

Boston Transcript: "A sort of free verse, which is at once rhythmical and full of vigorous fancy. * * * Extremely interesting not only in its wealth of unusual imagery and thought, but also as one more indication that the world is rapidly becoming unified, so that Kipling's bold statement that East and West will never meet is found to be quite wrong."

Thd Call (New York): "75 poems * * * cover every phase of human experience. * * * A challenge to every accepted convention, to every recognized standard of culture and thought. of art, nationality patriotism. * * * It is a voice of revolt, materialism, defiance."

Bookman (New York): "Hindu poems whose derivation is frankly from Whitman ond Browning, whose gospel is not surrender but conquest, whose God is not love but energy."

Hindu Art: Its Humanism and Modernism: An introductory essay. (B. W. Huebsch, New York, 1920.) *Dollar* 0.75 *cents.*

L'Amour de l' Art (*Paris*): "Il etablit un parallele entre les grandes directives de l'art hindou et les principes esthetiques dont se reclament les occidentaux. Il insiste non sur l'identite mais sur l'universalite de

l'inspiration artistique et donne a l'appui de sa these des exemples convaincants."

L'Information (Paris): "M. Sarkar nie qu'il y ait une opposition spirituelle de l'art occidental et de l'art oriental. * * * La part de l'inspiration mystico-religieuse lui semble aussi importante dans l'art europeen du moyen-age que dans l'art hindou. * * * S. s'efforce d'etablir des points de contact entre les grands courants d'art qui traversent l'histoire du monde Ce savant hindou nous donne un splendid exemple de realisme et d'elevation intellectuelle."

Sukra-niti (Hindu Polities). Rendered into English from Sanskrit with introduction and Notes. (Panini Office, Allahabad, India, 1914,) *Pp.* *xxxvi* + 270. 6 *Rupees* (Luzac & Co, London.)

The Positive Background of Hindu Sociology. Book I. Non-Political. Panini Office, 1914.) *Pp.* *xxiii* + 366. *Rs.* 7. (Luzac & Co)

Isis (*Bruxelles*): "On s'efforce de soutenir que la pensee indienne n'a nullement ete absorbee, d'une facon exclusive, par les problemes transcendants de la vie religieuse; elle a fait, nous assure-t-on, des efforts deliberes vers une science de la nature et du relatif en tant que tel. Nous plaisons a reconnaitre dans le postulat de B. K. S, une maniere nouvelle, peut-etre feconde, d'envisager la culture indienne."

Sir Gilbert Murray, Regius Professor of Greek, Oxford University: "Not only full of learning but full of points that may throw light on the problems of my own studies."

Columbia University Institute Bulletin: "An authority in the interpretation of Hindu culture from the standpoint of world-thought and in the perspective of developments in Europe and America."

President Morett (Folklore Society of London): "It will be of the very greatest value to an anthropologist."

Alfrea Marshall, Professor of econmics (Cambridge): "An important contribution to our knowledge of India."

Book II. Political. (Allahabad, 1921.) Part. I. *Pp.* 126. *Rs.* 3.

Deutsche Rundschau (*Berlin*): "Die Darstellungen Benoy Kumar Sarkars durfen unser besonderes Interesse darum beanspruchen, weil der Verfasser nicht nur die alten und moderneu staatlichen Verhaltnisse in seinem Mutterlande grundlich studiert hat, sondern weil er daruber hinaus auch eine tiefe Kenntnis der Staatsorganisationen der abendlandischen Volker besitzt."

Chinese Religion Through Hindu Eyes. With an Introduction by Dr. Wu Tinglang, Late Chinese Minister of Washington, D. C. *Pp.* *xxxii* + 331. (Maruzen Co., Tokyo. 1916.] 7 *s* 6 *d* (Luzac).

Quarterly Journal (The Indo Japanese Association, Tokyo): "The book is not only a volume on comparative religion, but may be useful to those who want to get the oriental interpretation of oriental history,"

Love in Hindu Literature. (Maruzen Co, Tokyo. 1916.) *Pp.* *v* + 89. 2 *s* 6 *d* (Luzac).

Current Opinion (*New York*): "The attempt to take the divine poetry of Radha-Krishna literature which has always been regarded as an allegory of the mystical union between God and the soul and to secularize it is the task of Prof, B. K. Sarkar."

The Science of History and the Hope of Mankind. (Longmans, Green & Co., London, 1912.) *Pp.* *viii* + 76. 2 *s* 6 *d*, *net.*

Open Court (*Chicaga*): "An unusually broad conception of history. * * * The main tendency is to show the paramount importance of world-forces for the development of every single nation."

Introduction to the Science of Education. (Longmans, 1913.) *Pp.* *xxxii* + 141. 3 *s.* 6 *d*, *net.*

Pioneer (Allahabad): "Admirable aim * * * written in the style of Herbert Spencer or Benjamin Kidd. * * * an idealist, a fervent seeker after truth."

Die Lebensanschauung des Inders (Markert und Petters, Leipzig, 1923.) 83 Seiten. Preis *Ek.* 280.

Frankfurter Zeitung: "Sie legt dar, dass man sich in Deutschland unter dem Einflusse der Romantik eine falsche Vorstellung von den Indern zurecht gemacht habe. * * * Der Zweck de Schrift its, die Ueberheblich keit, die das Abendland dem Morgenlande gegenuber hat, zuruckzuweisen"

Rundschau fur Literatur und Kunst (Berlin): Sarkar tut dar, dass auch Indien kapitalistisches, militaristisches, materialistisches Konnen immer schon hatte und noch hat."

Der Kaufmann im Auslande (Hamburg)· "Das Buch ist dringend notwendig. Es zerstort die falsche Vorstellung, dass Indien das Land der Mystik sei * * * Dass das Buch zum Schluss die in Deutschland viel verbreiteten Vorurteile an einem ganz bestimmten Beispiel aufzeigt, ist sein besonderes Verdienst."

The Political Institutions and Theories of the Hindus

A Study in Comparative Politics

By Benoy Kumar Sarkar

Special Features:

The only book in the field

that deals with

1. the institutions as well as the theories, dividing the one set sharply from the other,

2. the Hindu theory of "sovereignty" in its philosophical bearings, distinguishing it from the theory of the "constitution" which is treated separately,

3. Hindu republics and democratic institutions, *critically examining their real worth* in the light of Western developments,

4. the entire administrative system (legislative, executive, judicial, military and financial, as well as municipal and rural) not only of Northern but of Southern India as well,

5. Hindu achievements in political speculation and practice from the standpoint of political science, juris prudence, public finance, economic history and international law,

6. the relevant, solid and significant archaeological data exclusively,—avoiding lengthy quotations and translations from ancient or modern sources,

7. exhaustive bibliography on comparative history and politics (including the writings of Indian authors), the values of which are carefully weighed with an eye to promoting further research among scholars and critical spirit among publicists.

266 pages (equivalent to over 400 pages of ordinary books in the number of words).

Price 12 shillings.

Markert und Petters, Leipzig, Seeburgstrafk Nr. 53.

For **BENGALI WORKS** by the **SAME AUTHOR** apply to

GYANMANDAL, BENARES CITY, or

PANINI OFFICE, ALLAHABAD

Or **Ray & Raychowdhury**

College Street Market, Calcutta.

POLITICS OF BOUNDARIES

BY

Benoy Kumar Sarkar

(Ray & Raychowdhury, College Street Market, Calcutta. Rs. 2-8 as.)

It is the latest publication of Prof. Sarkar. It deals with the latest political problems of the world.—The making and remaking of the frontiers which is the greatest single item that has been pushing the world's history on monumental scale since mankind began to like in groups.

ALL ABOUT KHILAFAT

BY

A. H. ABBAS.

(Ray & Raychowdhury College Street Market, Calcutta. and Luzac & Co. London.)

CONTENTS

PART I

Difference between Khilafat and Papacy—Purpose of Khilafat—Submission to Khalifa—Jazirat-ul Arab—British Government and the Khilafat—Europe and the Turks—

PART II

Interview with Mr. Mohammed Ali—Khilafat Delegation at the India office—Interview with Mr. Lloyd George—Delegation in Paris—Khilafat Delegation at Essex Hall, Message to America etc. etc.

PART III

Turkish Peace Treaty—Viceroy's Message—Muslim Representation.

PART IV

Mahatma Gandhi. Jagad Guru Sankaracharya on Khilafat.

Some Press Opinions

"*Bombay Chronicle*" (*Bombay*) :—

The **Khilafat**, like all other great things, has been misunderstood and misrepresented. The author has done well to publish the book at a time when the vital question about the Khilafat, namely, the removal of Non-Muslim control and influence from the Jazirat-ul Arab is prominantly before the public. The map and the appendix containing the full list of the Khalifas are useful.

"*Amrita Bazar Patrika*" (*Calcutta*) :—

Many especially amongst the Non-Moslems, often talk of "Khalif" and "Khilafat" without understanding the meaning of the terms, their significance and their position in Mahomedan polity, These things have been dealt with chiefly in the Arabic language. The author has done a service to those who cannot read Arabic and yet are willing to know some thing about the Khilafat. ......By adding the full details of the Indian Khilafat Delegation in Europe headed by Mawlana Mohammed Ali the value of the book has been much enhanced.

"*Janmabhmi*" (*Madras*) :—

The book contains whatever is worth knowing on the one problem which has been appropriately described by Mahatma Gandhi, in the following words "Khilafat is our Kamdhenu". We recommend this book to every political library big and small in India and would like to see it read by every students of Politics.

The Moslem World (New York) :—

The interesting volume gives a resume of the whole question of the Caliphate (Khilafat).

"*Modern Review*" (*Calcutta*) :—

The book is of value as a concise and authentic epitome and as a general introduction to the study of Khilafat movement.

Price Rs. 2-4as.

REVOLUTIONARY BIOGRAPHIES BY POSTAGE ... ... Rs. 2-8as.

We have got a large stock of books on Nationalism, General literature and Novels.

Orders promptly executed.

RAY & RAYCHOWDHURY
Booksellers & Publishers.
2-3 (first floor) College Street Market
CALCUTTA.